কেদার রাজা

এক

দুপুর বেলায় নীলমণি চাটুজ্যে বাড়ি ফেরবার পথে গ্রামের মুদির দোকানে জিজ্ঞেস করলেন, হ্যাঁ গো ছিবাস, কেদার রাজাকে দেখেছিলে আজ সারাদিন ?

ছিবাস আলকাতরার পিপে থেকে আলকাতরা বার করতে করতে জিজ্ঞেস করলে, কেন চাটুজ্যে মশায়, তেনার খবরে কি দরকার ?

নীলমণি বললেন, আরে, খাজনার অংশ নিয়ে গোলমাল বেধেছে বড্ড। বাঁটুল নাপিতের দরুন আমার অংশে আমি চার আনা করে বছরশাল খাজনা পাই, তা গাঁয়ের শুদ্দুর ভদ্দর কে না জানে ?এ বছরের খাজনা কেদার রাজা দিব্যি আদায় করে নিয়ে বসে আছে। দ্যাখো তো কি উৎপাত !

ছিবাস মুদির মন তখন ছিল আলকাতরার পিপের মুখের ফাঁদলের দিকে। সে আপনমনে কি বললে, ভালো বোঝা গেল না। নীলমণি ছিবাসের সহানুভূতি না পেয়ে বোকার মতো মুখখানা করে বাঁড়ুজ্যে পাড়ার দিকে অগ্রসর হলেন—উদ্দেশ্য, বৃদ্ধ বিশ্বেশ্বর বাঁড়ুজ্যের বাড়ির সান্ধ্য পাশার আড্ডায় গিয়ে একবার খোঁজ নেওয়া।

পথেই একজন মধ্যবয়স্ক লোকের সঙ্গে দেখা।

নীলমণি চাটুজ্যে বললেন, আরে এই যে কেদার খুড়ো, তোমাকেই খুঁজছি।

লোকটি বললে, কেন বলো তো হে ?

নীলমণি যতটা জোরের সঙ্গে ছিবাসের দোকানে কথা বলেছিলেন, এখানে কিন্তু তাঁর গলা দিয়ে অত জোরের সুর বের হল না।

—সেই বাঁটুল নাপিতের ভিটের খাজনা বাবদ কয়েক আনা পয়সা—

—সে পয়সা তুমি কোত্থেকে পাবে খুড়ো ?

নীলমণি ভ্রূ কুঁচকে বললেন, কেন পাব না ?

—ও তোমার নীলাম-খরিদা জমি নয়।

নীলমণি রাগের সুরে বললেন, নেই বললে সাপের বিষ থাকে না তো জমি কোন্ ছার ! তবে সেটেলমেন্টের কাগজপত্রে তাই বলে বটে।

ভুল বলে নীলমণি বুড়ো।

—সেটেলমেন্টের পড়চা ভুল বলে ?

নীলমণির বড় ছেলে হাজুকে এই সময় সাইকেলে চড়ে সতেজে যেতে দেখা গেল।

নীলমণি হেঁকে বললেন, ও অজিত—ও অজিত—

ছেলেটি সাইকেল থেকে নেমে বললে, বাবা, তুমি এখানে ?

দরকার আছে, তুই একবার তোর দাদুর সঙ্গে যা দিকি ওর বাড়ি। খুড়ো, আমাদের অংশের খাজনা ক'আনা পয়সা অজিতের সঙ্গে দিয়ে দাও গিয়ে—

—কোথা থেকে দেব এখন ?আজ পাঠিয়ো না, যদি কাগজ-পত্র দেখে মনে হয় তোমার জমি ওর মধ্যে আছে—

নীলমণি বাধা দিয়ে বললেন, আলবাৎ আছে, হাজার বার আছে, ওর বাবা আছে—

লোকটা বললে, চটো কেন নীলু খুড়ো, থাকে পাবে। তবে এখন হাতে টানাটানি—

টানাটানি তা আমার কি ? আমার তো না হলে চলে না। ওসব শুনলে আমার কাছারির খাজনা মাপ করবে কি জমিদারে ?

গ্রামের পথ। চেঁচামেচি শুনে দু-চারজন লোক জড়ো হয়ে পড়ল।

—কি, কি, খুড়ো কি ?

—এই দ্যাখো না ক্যাদার খুড়োর কাণ্ডটা—নিজের অংশ আমার অংশ গিলে খেয়ে বসে আছে, এখন উপুড়হাত করবার নামটি নেই।

লোকে কিন্তু এ ঝগড়ায় উৎসাহের সঙ্গে যোগ দিলে না, দু-একবার ঘাড় নেড়ে সরে পড়ল অনেকে। যারা দাঁড়িয়ে রইল, তারাও নীলমণি চাটুজ্যের পক্ষে কথা না বলে বরং এমন সব মতামত প্রকাশ করলে, যা কি না তাঁর বিরুদ্ধেই যায়।

নীলমণি অগত্যা অন্য দিকে চলে গেলেন। দু-একজন লোকে বললে, পথের মধ্যে এ রকম চেঁচামেচি কি ভালো?ছিঃ—সামান্য কয়েক আনা পয়সার জন্যে—আর ওঁর সঙ্গে ?কেউ সহানুভূতির সঙ্গে বলেন, ক্যাদার জ্যাঠা আপনি বাড়ি যান চলে—

তিনিও চলে গেলেন।

নবাগত দু-একজন লোক জিজ্ঞেস করলে জনতাকে—কি হয়েছে, কি ?

—ওই নীলু খুড়ো ক্যাদার রাজাকে পথের মধ্যে ধরেছে, আমার খাজনা শোধ করো, ভারি তো খাজনা, ক'আনা পয়সা—হুঁ—

ক্যাদার রাজা কি বললে ?

—বলবে আর কি, সবাই জানে ওর অবস্থা কি। দিতে পারে যে দেবে এখুনি ?পয়সা ট্যাঁকে করে এনেছে নাকি ?

—কেদার রাজা এসব গোলমালের ভেতর থাকতে চান না, কখনো পছন্দ করেন না। নির্বিবাদী লোক। নীলু খুড়োর যা লোভ।

জনতা ক্রমে ভেঙে গেল।

যাঁর নাম কেদার রাজা, তিনি নিজের বাড়ি ঢুকলেন যখন, তখন বেলা প্রায় একটা। কেদারের স্ত্রী লক্ষ্মীমণি ছিলেন অপূর্ব সুন্দরী, ইদানীং তাঁর সে চোখ-ধাঁধানো রূপের সামান্য কিছু অবশেষ যা ছিল তাতেও অপরিচিত চোখ তাঁর দিকে অবাক হয়ে চেয়ে থাকত। তাঁর মৃত্যু হয়েছে আজ এইবছর দুই।

বাড়িতে আছে শুধু মেয়ে শরৎসুন্দরী। মেয়ে মায়ের অতটা রূপ পায়নি বটে, তবুও এ গ্রামের মধ্যে তার মতো সুন্দরী মেয়ে আর নেই।

—এত বেলা অবধি কোথা ছিলে ?...তোমায় নিয়ে আর পারিনে—তেল মাখো, নেয়ে এসো।

কেদার রাজা একটু অপ্রতিভ মুখে ঘরে ঢুকলেন। মেয়ে ভাত রেঁধে বসে আছে, তিনি আগে খেয়ে না নিলে সে-ও খেতে পারে না—হয়তো তার কষ্টই হচ্ছে। মুখ ফুটে তো কিছু বলতে পারে না। না, বড় অন্যায় হয়ে গিয়েছে।

শরৎ বাবাকে তেল দিয়ে গেল। বললে, এত বেলায় আর নদীতে যেয়ো না। জল তুলে দিচ্ছি, বাড়িতেই নাও।

এই কষ্টের ওপর আবার শরৎকে জল তুলতে হবে কুয়ো থেকে ?কেদার প্রতিবাদ করে বললেন, না, আমি নদীতেই যাই। ডুব দিয়ে না নাইলে কি আর নাওয়া হল; চললাম, দে গামছাখানা—

শরৎ পাথরের খোরায় বাবার ভাত বাড়তে গেল। কাঁসার জিনিসপত্র ছিল বড় সিন্দুক বোঝাই—সব গিয়েছে একে একে—অভাবের তাড়নায় বিক্রি হয়ে, নয়তো বাঁধা দিয়ে। আর উদ্ধার করা যায়নি।

শরৎ বাবার খাবার জায়গা করে অপেক্ষা করতে লাগল। কেউ নেই কেদার রাজার সংসারে—এই বিধবা মেয়ে শরৎ ছাড়া। মানে, এখন এই গ্রামের বাড়িতে নেই। কেদার রাজার একমাত্র পুত্র বহুদিন যাবৎ নিরুদ্দেশ। কোনো সন্ধানই তার পাওয়া যায়নি গত দশ বৎসরের মধ্যে।

কেদার স্নান সেরে এসে খেতে বসলেন। পাথরের খোরায় বুক্‌ড়ি কালো আউশ চালের ভাত ও ডাঁটাচচ্চড়ি। খোরার পাশে একটা ছোট কাঁসার বাটিতে কাঁচা কলাইয়ের ডাল। কেদার নাকসিঁটকে বললেন, কি ছাই-রাই-ই রাঁধিস রোজ, তোর রান্না নিত্যি খাওয়া এক ঝক্‌মারি।

শরৎ চুপ করে রইল।

নীরবে কয়েক গ্রাস উদরস্থ করে ক্ষুধার প্রথম দিকের জ্বালার খানিকটা মিটিয়ে কেদার মেয়ের দিকে তিরস্কারসূচক দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বললেন, আহা, কি ডাল রাঁধবার ছববা ! আর এই একঘেয়ে ডাঁটাচচ্চড়ি, এ রোজ রোজ তুই পাস কোথায় বাপু !

—আমার কি দোষ, আমি কি বাজারে যাই নাকি ?যা পাই হাতের কাছে তাই রাঁধি। কে এনে দিচ্ছে বল না—

কেদার মেয়ের দিকে চেয়ে বললেন, তার মানে ?

তার মানে কি শরৎ বাবাকে ভালো ভাবেই বুঝিয়ে বলতে পারত, ঝগড়ায় সে-ও কম যায় না—কিন্তু বাবার মেজাজ সে উত্তমরূপে জানে, এখুনি রাগ করে ভাতের থালা ফেলে উঠে যাবেন এখন। সুতরাং চুপ করেই গেল সে।

কেদার পাতের চারিদিকে ডাল-মাখা ভাত ফেলে ছড়িয়ে ছেলেমানুষের মতো অগোছালোভাবে আহার সম্পন্ন করে অপ্রসন্ন মুখে উঠে যাবার উদ্যোগ করতে শরৎ বললে— বসো বাবা, উঠো না, কিছু তো খেলে না, একটু তেঁতুল দিয়ে খেয়ে নাও—

কেদার রেগে বললেন, তোর মুণ্ডু দিয়ে খাব অকর্মার ঢেঁকি কোথাকার—অমন ছাই না রাঁধলেই না—

শরৎও প্রত্যুত্তরে বললে, তাই খাও, আমার মুণ্ডু খাও না—আমার হাড় জুড়ুক, আর সহ্যি হয় না—

মাঝে মাঝে পিতাপুত্রীতে এমন দ্বন্দ্ব বাধা এদের সংসারে সাধারণ ব্যাপারের মধ্যে দাঁড়িয়ে গিয়েছে। কেদার খারাপ জিনিস খেতে পারেন না, অথচ এদিকে সংসারের সচ্ছলতার যে রূপ, তাতে আউশ চালের ভাত জোটানোই দুষ্কর। এক পোয়া সর্ষের তেল কলুবাড়ি থেকে ধারে আসে, মাথায় মাখা সমেত সেই তেলে তিন দিন চালাতে হয়—সুতরাং তরকারিতে জল-আছড়া দিয়ে রান্না ছাড়া অন্য উপায় নেই। তরকারি মুখরোচক হয় কোথা থেকে ?

অথচ শরৎ বাবাকে সে কথা বলতে পারে না। বড়ই রূঢ় শোনায় সেটা। বাবার অর্থ উপার্জনের অক্ষমতার প্রতি ইঙ্গিত করা হয় তাতে। এক যদি তিনি নিজে বুঝতেন, তবে সব মিটেই যেত। কিন্তু বাবা ছেলেমানুষের মতো অবুঝ, তিনি দেখেও কিছু দেখেন না, বুঝেও বোঝেন না—প্রৌঢ় পিতার এই বালস্বভাবের প্রতি স্নেহ ও করুণাবশতই কিছু বলতে পারে না তাঁকে।

তার পর সে বাবার পাতেই খেতে বসে গেল।

দিবানিদ্রায় কেদার রাজার অভ্যাস নেই, দুপুরে খাওয়ার পর তিনি আটদশগাছা ছিপ নানা আকারের, পুঁটি মাছ থেকে রুই কাতলা ধরা পর্যন্ত, সুতো—বঁড়শি বাঁধা, মাছধরা ভাঁড়, চারকাঠি, মশলা প্রভৃতি মাছ ধরবার সরঞ্জাম নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। নিষ্কর্মার কর্ম।

ওপাড়ার গণেশ মুচি একাজে তার সহকর্মী ও বন্ধু। গণেশ এসে বললে, বাবাঠাকুর, তৈরি ?

—সব ঠিক আছে, কোথায় যাবি, গড়ের পুকুরে না নদীতে ?

—চারকাঠি বেঁধেছ কোথায় ?

কেদার রাজা চোখে-মুখে স্বীয় কর্মদক্ষতা ও বুদ্ধিমত্তার আত্মপ্রসাদসূচক একখানি হাস্য বিস্তার করে বললেন, ওরে বেটা, আজ ত্রিশ বছর বর্শেলগিরি করছি এটুকু আর বুঝিনে ?ঘোলার শেষের গাঙ, সেখানে চারকাঠি না বেঁধে বাঁধব কিনা পুকুরে ?...হ্যা-হ্যা হ্যা—

গণেশ কেদার রাজার ছিপ ও সরঞ্জাম বয়ে নিয়ে চলল নিজের ছিপগুলোর সঙ্গে।

গড়ের পুকুরের ধারে বেতস ও কণ্টকগুল্মের দুর্ভেদ্য জঙ্গল। গত বর্ষার জলে সে জঙ্গল বেড়ে মধ্যেকার অন্ধকার সুঁড়িপথটাকে প্রায় ঢেকে দিয়েছে—তার মধ্যে দিয়ে দুজনে সন্তর্পণে চলল, পায়ের পাতায় কাঁটা না মাড়িয়ে ফেলে।

পাড়ের ওপারে যেখানে জঙ্গলটা একটু পাতলা হয়ে এসেচে, সেখানে পৌঁছে গণেশ বললে, আমার কিন্তু বাবাঠাকুর জোড়া দেউলের নীচে চারকাঠি পোঁতা, দেখে যাব না একবারটি ?

কেদার বললেন, উঃ, ব্যাটা বড় চালাক তো ! ওখানে পুঁতেছিস্ তা আমাকে বলিসনি মোটেই ?চল দেখি—

গড়ের দীঘির বাঁ পাড়ে জঙ্গলের মধ্যে থেকে সেকালের ভাঙা প্রকাণ্ড দেউলের চূড়া যেখানে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে, তারই নীচে দীঘির জলে গণেশ গিয়ে নামল।

দীঘিটা এত বড় যে এপার থেকে ওপারের গাছপালা যেন মনে হয় ছোট। অনেকগুলো দেউল এখানে আছে গড়ের দীঘির গভীর জঙ্গলের মধ্যে—কোনো কোনো মন্দিরের গায়ে কালো স্লেট পাথরের ওপর মন্দির-নির্মাতার নাম ও সন তারিখ লেখা। একটার ওপর সন লেখা আছে ১০২৪। এ থেকে দেউলগুলির প্রাচীনত্ব অনুমান করা কঠিন হবে না।

গণেশ বললে, ভালো মাছ লেগেছে বাবাঠাকুর, এখানেই বসবা এসো—

—আরে না না, চল গাঙে—এখেনে আবার মাছ।

—আপনি নেমে দ্যাখোই না—আমি কি মশকরা করছি তোমার সঙ্গে ?

দুজনে পুকুরের ধারেই মাছ ধরতে বসে গেল। কেদার রাজা যা হুকুম করেন, গণেশ মুচি তখনই তা তামিল করে, যদিও কার্যত সে কেদার রাজার ইয়ার।

—তামাক সাজ গণ্‌শা, আর পাতা ভেঙে নিয়ে বসবার জায়গা করে দে দিকি !

গণেশ পাড়ের ওপরকার জঙ্গল থেকে বন-ডুমুরের বড় বড় কচি পাতা ভেঙে এনে বিছিয়ে দিলে। গণেশ নিজে কিন্তু সেখানে বসল না—বললে, আমি এই বাঁধাঘাটের সানে গিয়ে বসি বাবাঠাকুর—

একটু দূরে প্রাচীন দিনের প্রকাণ্ড বাঁধাঘাট যেখানে ছিল, এখন সেখানে পুকুরপাড়ে সোপানশ্রেণীর চিহ্ন দেখা যায় মাত্র। ঘাট ব্যবহার করা চলে না, তবে ভাঙা চাতালে বসে মাছ ধরা চলতে পারে এই পর্যন্ত।

দীঘির চারধারে বড় বড় বট, শিমুল, ছাতিম গাছের বহুকালের বন। ঘাটের ওপরকার বৃদ্ধ বট গাছটা দীঘির ঘাটের বাঁধা সোপানশ্রেণীর ফাটলে ফাটলে শিকড় চালিয়ে যদি তার কয়েকটা ধাপকে না ধরে রাখত, তবে

প্রাচীন দিনের ঘাটের একখানা ইটও আজ খুঁজে পাওয়া যেত কি না সন্দেহ। এর প্রধান কারণ এই সব ধ্বংসস্তূপের পোড়ো ইট দিয়ে এ গ্রামের বহু গৃহস্থের বাড়ি তৈরি হয়ে আসছে আজ একশো বছর ধরে।

ঘণ্টা-দুই পরে নিবিড় ছায়া নামল দীঘিটার চার পাশ ঘিরে। চারধারেই বন, বেলা তিনটে বাজতে না বাজতে সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে আসবে এ বিচিত্র কথা কিছু নয়। কেদার হেঁকে বললেন, ওরে গণ্শা শীত শীত করছে, একটু ভালো করে তামাক সাজ্, ইদিকে আয় তো—

গণেশের ছিপের ফাতনা বড় মাছে দু-দুবার নিতলি করে নিয়ে গেছে সবেমাত্র, তার এখন ছিপ ছেড়ে যাওয়ার ইচ্ছে না থাকলেও কেদারের আদেশ সে অমান্য করতে পারল না। বিরক্ত মুখে উঠে এসে বললে—কিছু হচ্ছে-টচ্ছে বাবাঠাকুর ?

—তোর কি হল ?

—অই অমনি—তেমন কিছু নয়।

বড় মাছের ঘাই মারার কথা গণেশ বললে না, কোনো বর্শেলই বলে না, যদি বাবাঠাকুর এখান থেকে উঠে গিয়ে ওখানে বসে !

সন্ধ্যার কিছু পূর্বে কেদারের ছিপে দৈবক্রমে একটা বড় রুই মাছ টোপ গিলে ফাতনা ডুবিয়ে একেবারে নিতলি হয়ে গেল। বহু ধস্তাধস্তি করে সুতো লম্বা করে ছেড়ে মাছটাকে অনেক খেলিয়ে কেদার সেটা ডাঙায় তুললেন।

গণেশ ছুটে এসেছিল তাঁকে সাহায্য করতে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত গণেশের সাহায্যে তাঁর দরকার হল না। কেদার হাঁপিয়ে পড়েছিলেন মাছটার সঙ্গে মল্ল যুদ্ধ করে, তিনি বললেন—তোল্ রে গণ্শা, ক'সের বলে মনে হয় দ্যাখতো ?

গণেশ কানকো ধরে মাছটাকে তুলে বার-দুই ঝাঁকুনি দিয়ে বললে, তা তিনসের চোদ্দপোয়া হবে বাবাঠাকুর, আপনাদের বরাত—আমার ছিপে ঘাই মেরেই পুকুরের মাছ নিউদ্দিশ হয়ে গেল—

নিরুদ্দেশ হওয়ার তুলনাটি কেদারের ভালো লাগল না, হঠাৎ মনে পড়ে গেল তাঁর পুত্রের কথা। আজ দশ বৎসর...হ্যাঁ, প্রায় দশ বৎসর যাবৎ সে-ও নিরুদ্দেশ।...কোথায় আছে, আদৌ বেঁচে আছে কি না, কে বলবে ?সচ্ছল অবস্থার লোক যারা, তারা এ অবস্থায় খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেয়, কত খোঁজখবর করে। দরিদ্র কেদারের সে সব করবার সঙ্গতি কই ?—নীরবে ও নিশ্চেষ্ট ভাবে সব সয়ে থাকতে হয়েছে।

কি করবেন উপায় নেই।

কেদার নিজের অলক্ষিতে একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন, নিয়ে চল্ রে গণেশ, পৌঁছে দে মাছটা বাড়িতে। একেবারে কেটে দিয়ে তুইও কিছু নিয়ে যা—চল্।

সন্ধ্যার অন্ধকার গড়ের পুকুরের বনে দিব্যি ঘনিয়েছে—হেমন্তের প্রথম, ছাতিম ফুলের উগ্র গন্ধে ভরা অন্ধকার বনপথ বেয়ে দুজনে বাড়ির দিকে ফিরলে।

দুই

শরৎ বাবার সন্ধ্যা-আহ্নিকের জায়গা করে বসে ছিল, কিন্তু কেদার এখনো ফেরেননি। বাইরের দোরের কাছে খুটখাট শব্দ শুনে শরৎ ডেকে বললে, কে ?বাবা নাকি ?

শব্দ বন্ধ হয়ে গেল। শরৎ চেঁচিয়ে বললে, দেখে আসি আবার কে, বাবার এখনো দেখা নেই—কোথায় গিয়ে বসে আছে তার ঠিক কি ?হাড় ভাজাভাজা হয়ে গেল আমার—

দরজার কাছে কেউ কোথাও নেই। শরৎ মুখ বাড়িয়ে এদিক ওদিক চেয়ে দেখে দরজা বন্ধ করে দিয়ে বাড়ির বোয়াকে এসে বসল।

খানিকটা পরে আবার বাইরের দরজায় খুট্‌খুট্‌ শব্দ। এবার যেন বেশ একটু জোরে জোরে। শরৎ এবার পা টিপে টিপে উঠে গিয়ে বাইরের দরজার খিলটা খুলে ফেলল। বাইরে বেশ অন্ধকার, কিন্তু কোথায় কে ?

শরতের ভয়-ভয় করতে লাগল। তবুও সে খুব সাহসী মেয়ে—এই জঙ্গলের মধ্যে পোড়ো বাড়ির ধ্বংসস্তূপ চারিদিকে, কত কাণ্ড সেখানে ঘটে—একা শরৎ কত রাত্রি পর্যন্ত বাবার ভাত নিয়ে বসে থাকে। ভয় করলে চলে না তার। মাঝে মাঝে দু-একটা ঘটনাও ঘটে।

ঘটনা অন্য বেশি কিছু নয়, খুট্‌খাট্‌ শব্দ, একা রান্নাঘরে যখন শরৎ রাঁধছে—বিশেষ করে সন্ধ্যাবেলা, তখন কে কোথায় ফিস্‌ফিস্‌ করে কি যেন বলে ওঠে—বেশ কি একটা কথা বললে সেটা বোঝা যায়, কিন্তু কথাটা কি, তা বোঝা যায় না।

এ-সব গা-সওয়া হয়ে গিয়েছে শরতের।

শরৎ বাপের বাড়িতেই আছে আজীবন, মধ্যে বিয়ের পর বছর-তিনেক শ্বশুরবাড়ি ছিল। শিবনিবাসে ওর শ্বশুরবাড়ি, রাণাঘাটের কাছে। স্বামী মারা যাওয়ার পর আর সেখানে যায়নি, তার কারণ মায়ের মৃত্যুর পর পিতার সংসারে লোক নেই, কে এই বয়সে তাঁকে দুটি রেঁধে দেয়, কে একটু জল দেয়—এই ভাবনা শরতের সবচেয়ে বড় ভাবনা। শরতের শ্বশুরবাড়ির অবস্থা নিতান্ত খারাপ নয়, অন্তত এখানকার চেয়ে অনেক ভালো—কিন্তু দরিদ্র পিতাকে একা ফেলে রেখে সে সেখানে গিয়ে থাকতে পারে কি করে ?

তার শ্বশুর বলে পাঠিয়েছিলেন, এখানে যদি না আস বউমা, তা হলে ভবিষ্যতে তোমার প্রাপ্য অংশ সম্বন্ধে আমি দায়ী থাকব না।

শরৎ তার উত্তরে বলে দেয়—আপনার সম্পত্তি আপনি যা খুশি করবেন, আমার কি বলার আছে সে সম্বন্ধে ?বাবাকে ফেলে আমার স্বর্গে গিয়েও সুখ হবে না।

আজ বছর দুই আগে মা মারা যান, এই দু-বছরের মধ্যে শ্বশুর সাতবার লোক পাঠিয়েছিলেন।

শরৎ জানে, বাবার অবর্তমানে এ-গাঁয়ে তার চলা-চলতির মহা অসুবিধে। বাবা সামান্য কিছু খাজনা আদায় করেন, দু-তিন বিঘে ধান করেন,—কষ্টেসৃষ্টে এরকম চলে। কিন্তু সে একা থাকলে এ দুটি আয়ের পথও বন্ধ। গ্রামে লোক নেই, থাকলেও সবাই নিজেরটা নিয়ে ব্যস্ত, শরতের মুখের দিকে চেয়ে কেউ নিজের কাজের ক্ষতি করে শরতের কাজ করে দেবে—তেমন প্রকৃতির লোক এগাঁয়ে নেই।

সব জেনেশুনেও শরৎ এখানেই রয়ে গিয়েছে। তার অদৃষ্টে যা ঘটে ঘটুক।

সন্ধ্যার পর দেড় ঘণ্টা উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েছে।

কেদারের সঙ্কোচমিশ্রিত কাশির আওয়াজ এই সময় বাইরের উঠানে পাওয়া গেল।

শরৎ বললে, কে ?বাবা ?

—হ্যাঁ—ইয়ে—এই যে আমি—

শরৎ ঝাঁঝালো গলায় বলে উঠল—হ্যাঁ, তুমি যে তা তো বেশ বুঝলাম। এত রাত পর্যন্ত এই জঙ্গলের মধ্যে একা মেয়েমানুষ বসে আছি, তা তোমার কি একটু কাণ্ডজ্ঞান নেই—জিজ্ঞেস করি ?

কেদার কৈফিয়তের সুরে বলতে গেলেন, তাঁর নিজের কোনো দোষ নেই—তিনি এক ঘণ্টা আগেই আসতেন। ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট পঞ্চানন বিশ্বাস তাঁকে ডেকে নিয়ে গিয়েছিল একটাগুরুতর বিষয়ের পরামর্শের জন্যে—সেখানেই দেরি হয়ে গেল।

শরৎ বললে—তোমার সঙ্গে কিসের পরামর্শ ?ভারি পরামর্শদাতা তুমি কিনা ?তোমার সঙ্গে পরামর্শ না করলে তাদের কাজ আটকে গিয়েছে ভারি—

কেদার নীরবে হাত পা ধুয়ে ঘরে উঠলেন, মেয়ের সঙ্গে বেশি তর্কাতর্কি করে ঝগড়া বাধাতে তিনি এখন ইচ্ছুক নন—নির্বিরোধী লোক কেদার।

মেয়ে আহ্নিকের জায়গা করে বসে আছে দেখে কেদার একটু বিপদে পড়লেন—সেদিকে চেয়ে বললেন—সন্ধে উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েছে এখন আবার—

—তোমার যত সব ছুতো—সন্ধে উতরে গেলে বুঝি আহ্নিক করে না ?তিন কাল গিয়ে এক কালে ঠেকেছে, পরকালের কাজটা এখন থেকে করো একটু—

কেদার অপ্রসন্ন মুখে আহ্নিক করতে বসলেন।

বাইরে থেকে কে ডাকল—ও শরৎদি—আলো ধরো, উঠোনে যে জঙ্গল করে রেখেছ—

হাসতে হাসতে একটি ষোল-সতেরো বছরের শ্যামবর্ণ মেয়ে ঘরে ঢুকল। কেদারকে দেখে সঙ্কোচের সঙ্গে গলার সুর নীচু করে শরৎকেই বললে, জ্যাঠামশায় ফিরেছেন কখন ?আমি ভাবলাম বুঝি একা—

—বাবার কথা আর বলিস্ নে ভাই—তিনটের সময় বেরিয়েছিলেন, আর এই এখন এসে আহ্নিক করতে বসলেন—

নবাগত মেয়েটি হাসি হাসি মুখে চুপ করে রইল।

কেদার দায়সারাগোছের অবস্থায় সন্ধ্যাহ্নিক সাঙ্গ করে বললেন, আছে নাকি কিছু ?

—হ্যাঁ, বোসো। বাতাবী লেবু খাবে ?মিষ্টি লেবু, ফকিরচাঁদের মা দিয়ে গেল আজ ওবেলা। আর এই নারকোলের নাড়ু দুটোও দিয়ে গেল, জল খেয়ে নাও—

জলযোগান্তে কেদার একটু ইতস্তত করে বললেন, তা হলে রাজলক্ষ্মী তো আছিস মা, আমি ততক্ষণ একটুখানি— বরং—ওই হরি বাঁড়ুজ্যের ওখান থেকে—

—না, যেতে হবে না বাবা। বোসো। রাজলক্ষ্মী দুপুর রাত পর্যন্ত আমায় আগলে বসে থাকবার জন্যে এসেছে নাকি ?ও এখুনি চলে যাবে—

—আমি যাব আর আসব মা—এই আধ ঘণ্টার মধ্যে—

—না, তোমার আধ ঘণ্টা আমি খুব ভালো জানি—যেতে হবে না, বোসো তুমি। তার চেয়ে বসে একটা গল্প করো—

রাজলক্ষ্মীও আবদারের সুরে বললে, হ্যাঁ জ্যাঠামশাই, বলুন না একটা গল্প। আপনার মুখে কতকাল গল্প শুনিনি। সেই আগে আগে বলতেন—

অগত্যা কেদারকে বসতে হল। খাপছাড়া ভাবে একটা গল্পের খানিকটা বলে তিনি কেমন উশখুশ করতে লাগলেন। মন ঠিক গল্পে নেই তাঁর, এটা বেশ বোঝা যায়।

শরৎ বললে—কোথায় যাবে বাবা ?বিশ্বেসকাকার ওখানে কি বড্ড বেশি দরকার তোমার ?

কেদার উৎসাহের সঙ্গে বলে উঠলেন, বিশেষ জরুরি, দুবার লোক পাঠিয়েছে—জমিজমা নিয়ে একটা গোলমাল বেধেছে, তাই আমার সঙ্গে পরামর্শ করতে চায় কিনা, তাই—

শরৎ মুখে কিছু বললে না। পঞ্চানন বিশ্বাস ঘুণ বিষয়ী ব্যক্তি, সে লোক তার বাবার মতো ঘোর অবৈষয়িক লোকের সঙ্গে পরামর্শ করবার আগ্রহে দু-দুবার লোক পাঠিয়েছিল, একথা বিশ্বাস করা শক্ত। তা নয়, আসলে বাবা বারুইপাড়ার কৃষ্ণযাত্রার দলের আখড়ায় গিয়ে এখন বেহালা বাজাবেন, এই তাঁর বৈষয়িক কাজ। যদি কেউ লোক পাঠিয়ে থাকে, সেখান থেকেই পাঠানো সম্ভব।

রাজলক্ষ্মী বললে, দিদি, উনি যান তো একটু ঘুরে আসুন—

শরৎ বললে, হ্যাঁ, উনি গেলে রাত এগারোটার কম ফিরবেন না, আমি একা কি করে এখানে বসে থাকি বল্ তো ?থাকবি তুই আমার সঙ্গে—বাবা না আসা পর্যন্ত ?বলছিস্ তো খুব যেতে—

কেদার বিব্রত ভাবে বলে উঠলেন, আরে না না, ওর থাকার দরকার হবে না, আমি যাব আর আসব, এই ধর গিয়ে ঘণ্টাখানেক, দেরি কিসের ?যাই তা হলে—

শরৎ বললে, নটার মধ্যে যদি না ফিরে আস, তবে আমি কি রকম রাগ করি দেখো এখন আজ—রাজলক্ষ্মী এখন রইল, তুমি এলে তবে যাবে—

রাজলক্ষ্মী হাসিমুখে বললে, বেশ ভালোই তো জ্যাঠামশাই, যান আপনি—আমি ততক্ষণ দিদির কাছে থাকি। আসবেন তো শিগ্‌গিরই—

কেদার আর দ্বিরুক্তি না করে বেরিয়ে গেলেন। শরৎ ঠিক বুঝতে পারেনি, কৃষ্ণযাত্রার দলে বেহালা বাজাতে তিনি যাচ্ছিলেন না।

কেদারের বাড়িটার ধারে ধারে অনেক দূর পর্যন্ত ভাঙা ও পুরোনো বাড়ি, সবগুলো ভাঙা নয়, তবে পরিত্যক্ত এবং সাপখোপের বাস হয়ে আছে বর্তমানে। চার-পাঁচ রশি কি তা ছাড়িয়েও একটা পুরোনো আমলের উঁচু সদর দেউড়ির ভগ্নাবশেষ আজও বর্তমান। এটা পার হয়ে দুধারে সেকালের আমলের নীচু লম্বা কুঠুরির সারি, কোনো কালে এর নাম ছিল কাছারিবাড়ি, এখনো সেই নাম চলে আসছে। এর অর্ধেকখানি এখন মাটির ভেতর বসে গিয়েছে, দেওয়াল সেকালে হয়তো চুনকাম করা ছিল, এখন শ্যাওলা ছাতা ধরে সবুজ রং দাঁড়িয়েছে। কোনো একটা ঘরেও ছাদ নেই—মেজেতে বনজঙ্গল, শালকাঠের বড় বড় কড়ি আর ভাঙা ইটের স্তূপের ওপর বড় গাছ—এমন কি দেউড়ির ঠিক পাশেই এক কাছারিবাড়ির একটা অংশে প্রকাণ্ড এক তিন-পুরুষের বটগাছ—যার বয়স কোনোক্রমেই একশ বছরের কম হবে না, বেশিও হতে পারে।

কাছারিবাড়ি পার হয়ে আর একটা দেউড়ি—এর নাম নহবতখানা—বর্তমানে কিছুই অবশিষ্ট নেই—দুটি মাত্র উঁচু থাম ও তাদের মাথায় একটা ফাটা খিলান ছাড়া। থামের এক-পাশে এক সারি সিঁড়ির খানিকটা ভেঙে পড়ে গিয়েছে—বিচুটি গাছের জঙ্গলে থাম আর সিঁড়ির ধাপগুলো ঢেকে রেখেছে। হঠাৎ কোনো নবাগত লোক এসব জায়গায় সন্ধ্যার পর এলে তার দস্তুরমতো ভয় হওয়ার কথা, কিন্তু কেদার নির্বিকার ভাবে এসব পার হয়ে গিয়ে বড় একটা খালের মধ্যে নামলেন।

এই খালটাকে এখানে গড়ের খাল বলে, কিন্তু এতে জল নেই, খানিকটা খুব নাবাল জমি মাত্র, পশ্চিম কোণের এক জায়গায়—সদর দেউড়ি থেকে প্রায় এক মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে—এই খালের খানিকটায় জল আছে—কচুরি পানায় ভর্তি।

পূর্বদিকের বাহু ধরে এলে গড়ের খালের সঙ্গে সমান্তরাল ভাবে অবস্থিত বিরাট ধ্বংসস্তূপ সম্পূর্ণরূপে জঙ্গলাবৃত, দিনমানে বাঘ লুকিয়ে থাকতে পারে এমন ঘন কাঁটা আর বেত বন, বন্যশূকরের ভয়ে সেদিকে বড় কেউ একটা যায় না।

গড়ের এই দিকটায় বিস্তর বড় বড় ছাতিম গাছ—মানুষের হাতে পোঁতা গাছ নয়, বন্যবৃক্ষের বীজের বিস্তারে উৎপন্ন।

যেখানে এখনো একটু জল আছে, সেখানকার উঁচু পাড়ে বসে দেখলে এই অংশের দৃশ্য মনে কেমন এক ধরনের ভয়-মিশ্রিত সৌন্দর্যের সৃষ্টি করে। কেদার অবিশ্যি এসবের দিকে নজর না দিয়েই খালের নাবাল জমি পেরিয়ে ওধারে গিয়ে উঠলেন এবং আরো খানিকটা হেঁটে ছিবাস মুদির দোকানে উপস্থিত হলেন।

ছিবাস মুদির চালাঘরে ঝাঁপ পড়ে গিয়েছে, কারণ এমন গাঁয়ে এই রাতে খরিদ্দার কেউ আসবে না—কিন্তু ঘরের ভেতরে চার-পাঁচজন লোক বসে। ছিবাস বললে, আসুন বাবাঠাকুর, আপনার জন্য সব বসে—বলি বলে গেলেন আসছেন, তা দেরি হচ্চে কেন—আসুন বসুন—

এখানে এখন গান-বাজনা হবে—শরৎসুন্দরী ঠিকই আন্দাজ করেছিল, তবে বারুইপাড়ার কৃষ্ণযাত্রার দলে নয়, এই যাতফাত। সবাই সরে বসে কেদারকে বসবার জায়গা করে দিলে। কেদার মহানন্দে বেহালা ধরলেন, তাঁর বেহালা বাজানোর নাম আছে এ গ্রামে। অনেকক্ষণ ধরে গান-বাজনা চলল, আরো দু-তিনজন লোক এসে গান-বাজনায় যোগ দিলে—তবে গ্রামের ভদ্রলোক কেউ আসেনি।

কেদার বেহালায় কসরত দেখালেন প্রায় আধ ঘণ্টা ধরে, তার পর আবার গান শুরু হল। রাত আন্দাজ এগারোটার সময় কি তারও বেশি যখন, গানের আড্ডা তখন ভাঙল।

একজন বললে, বাবাঠাকুর, আলো এনেছেন কি, না হয় চলুন আলো ধরে দিয়ে আসি খাল পার করে—

কেদারের হুঁশ হল এতক্ষণ পরে, বাইরে এসে বললেন, তাই তো, চাঁদ অস্ত গেল কখন ?বড় অন্ধকার দেখছি যে—

পঞ্চমীর চাঁদের অবিশ্যি যতক্ষণ থাকা সাধ্য ততক্ষণ সে বেচারি আকাশে ছিল, তার কোনো কসুর নেই। কেদার রাজার জন্যে দুপুররাত পর্যন্ত অপেক্ষা করা তার সাধ্যাতীত।

দাসু কুমোর বললে—আমার সঙ্গে যদি কেউ আসে আমি বাবাঠাকুরকে খাল পার করে দিয়ে আসি—

দু-তিনজন যেতে রাজী হল—একা রাত্রে কেউ ওদিকে যেতে রাজী হয় না, গড়ের মধ্যে আছে অনেক রকম গোলমাল। এ অঞ্চলে সবাই তা জানে। কেদার কিন্তু নির্ভীক লোক, তিনি কোনো লোক সঙ্গে নিয়ে যেতে রাজী নন—দরকার নেই কিছু, তিনি এমনিই বেশ যাবেন।

তবুও জনচারেক লোক পাঁকাটির মশাল জ্বালিয়ে তাঁকে গড়ের খাল পার করে দিয়ে এল। এত রাত হয়েছে কেদার সেটা পূর্বে বুঝতে পারেননি, তা হলে এত দেরি করতেন না, ছিঃ, কাজ বড় খারাপ হয়ে গিয়েছে।

কেদার বাড়ি ঢুকে দেখলেন মেয়ে খিল বন্ধ করে ঘরের মধ্যে শুয়ে। মেয়েকে একা এত রাত পর্যন্ত এই বনে ঘেরা নির্জন বাড়িতে ফেলে বাইরে ছিলেন বলে মনে লজ্জিত ও অনুতপ্ত হলেন, তবে কিনা এ অনুতাপ তাঁর নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপারের মধ্যে দাঁড়িয়ে গিয়েছে। আর মজা এই যে, প্রতিরাত্রে ফিরবার সময়েই এই অনুতাপ মনের মধ্যে হঠাৎ আবির্ভূত হয়, এর আসা আর যাওয়া দুই-ই অদ্ভুত ধরনের আকস্মিক, ন্যায়শাস্ত্রের 'বেগবেগা' জাতীয় পদার্থ, আসবার সময় যত বেগে আসে, ঠিক তত বেগেই নিষ্ক্রান্ত হয়ে যায়—মনে এতটুকু চিহ্নও রেখে যায় না।

শরৎ উঠে বাবাকে দোর খুলে দিলে, ভাত বেড়ে খেতে দিলে। তার মনে রাগ অভিমান কিছুই নেই—সে জানে এতে কোনো ফলও নেই—বাবা যা করবেন তা ঠিকই করবেন। ওঁর ঘাড়ে ভূত আছে, সে-ই ওঁকে চরিয়ে নিয়ে বেড়ায়, উনি কি করবেন ?

কিন্তু কেদারের ঘাড়ে সত্যিই ভূত চেপে আছে বটে। খাওয়াদাওয়ার পরে অত গভীর রাত্রেও বাবাকে বেহালার লাল খেরোর খোল খুলতে দেখে সে আর কথা না বলে থাকতে পারলে না। বাবা এখন আবার বেহালা বাজাতে বসলেই হয়েছে।

কেদার ব্যাপারটাকে সহজ করবার চেষ্টা করলেন। বেহালা যে তিনি ঠিক বাজাতে চাইছেন এখন তা নয়, তবে একটা সুর মাথার মধ্যে বড় ঘুরছে—সেইটে একবারটি সামান্য একটু ভেঁজে নিতে চান।

শরৎ বললে, না বাবা, তোমার ঘুম না আসতে পারে, তোমার খিদে নেই, তেষ্টা নেই, শরীরের ক্লান্তি নেই, ঘুম নেই—সব জয় করে বসে না হয় আছ, কিন্তু আমি এই সারাদিন খাটছি, তুমি এখন রাতদুপুরে বেহালা নিয়ে কোঁকর কোঁকর জুড়ে দিলে কানের কাছে আমার চোখে ঘুম আসবে ?

কেদার বললেন, আমি—তা—না হয় দেউড়িতে গিয়ে বসি মা—তুই ঘুমো—

—না, তা হবে না। আমি মাথা কুটে মরব, এই এত রাত্রে অন্ধকারে সাপখোপের মধ্যে তুমি এখন জঙ্গলের মধ্যে দেউড়িতে বসে বেহালা বাজাবে ?রাখ ওসব—

কেদার অগত্যা বেহালা রেখে দিলেন। মেয়েমানুষদের নিয়ে মহা মুশকিল। এরা না বোঝে সঙ্গীতের কদর, না বোঝে কিছু। তাঁর মাথায় সত্যিই একটা চমৎকার সুর খেলছিল, এই দুপুর নিস্তব্ধ নির্জন রাত্রি, সুরটা বেহাগ—রক্তমাংসের শরীরে এ সময় তারের ওপর ছড় চালানোর প্রবল লোভ সামলানো যায় ?

মেয়েমানুষ কি বুঝবে ?

কেদার বিকেলবেলা গেঁয়োখালির হাটে যাবার পথে সাধু স্যাকরার দোকানে একবারটি ঢুকলেন, উদ্দেশ্য তামাক খাওয়াও বটে, অন্য একটি উদ্দেশ্যও ছিল না যে এমন নয়। সাধু স্যাকরার বয়েস হয়েছে, নিজে সে একটি হরিনামের ঝুলি নিয়ে একটা জলচৌকিতে বসে মালাজপ করে, তার বড় ছেলে নন্দ দোকান চালায়। ব্রাহ্মণসজ্জনে সাধুর বড় ভক্তি—কেদারকে দেখে সে হাত জোড় করে বললে—আসুন ঠাকুরমশায়, প্রণাম হই—ওরে টুলটা বার করে দে—ব্রাহ্মণের হুঁকোতে জল ফেরা—

কেদার বললেন—তার পর, ভালো আছ সাধু ?তোমার কাছে এসেছিলাম একটা কাজে—আমার কিছু টাকার দরকার—তোমার এ বছরের খাজনাটা এই সময়—

সাধুর অবস্থা ভালোই, কিন্তু মুখ মিষ্ট হলেও পয়সাকড়ি সম্বন্ধে সে বেজায় হুঁশিয়ার। কেদারকে যা হয় কিছু বুঝিয়ে দেওয়া কঠিন নয় তা সে বিলক্ষণ জানে—সে বিনীত ভাবে হাত জোড় করে বললে, বড় কষ্ট যাচ্ছে ঠাকুরমশায়, ব্যবসার অবস্থা যে কি যাচ্ছে, সোনার দর এই উঠচে এই নামচে, সোনার দর না জোয়ারের জল ! আর চলে না ঠাকুরমশাই—এই সময়টা একটু রয়ে বসে নিতে হচ্ছে—আপনি রাজা লোক, আপনার খেয়েই মানুষ—

কেদার চক্ষুলজ্জায় পড়ে আর খাজনা চাইতে পারলেন না। হাটে ঢুকে আরো দু-একজনের কাছে প্রাপ্য খাজনা চাইলেন—সকলেই তাদের দুঃখের এমন বিস্তারিত ফর্দ দাখিল করলে যে কেদার তাদের কাছেও জোর করে কিছু বলতেই পারলেন না।

হাটের জিনিসপত্রও সুতরাং বেশি কিছু কেনা হল না—হাতে পয়সাকড়ি বিশেষ নেই।

সতীশ কলুর দোকানে ধারে তেল নিয়েছিলেন ওমাসে—এখনো একটি পয়সা শোধ দিতে পারেননি, অথচ সর্ষের তেল না নিয়ে গেলে রান্না হবার উপায় নেই, মেয়ে বলে দিয়েছে।

সতীশ বললে, আসুন দাদাঠাকুর, তেল দেব নাকি ?

সতীশের দোকানে কোণের দিকে যে ঘাপটি মেরে বৃদ্ধ জগন্নাথ চাটুজ্যে বসেছিলেন, তা প্রথমটা কেদার দেখতে পাননি, এখন মুশকিল জগন্নাথ চাটুজ্যে লোক ভালো নয়, গাঁয়ের গেজেট, তার সামনে সতীশকে ধারের

কথা বলতে কেদারের বাধল—অথচ না বললেও নয় ! জগন্নাথ উঠলে না হয় বলবেন এখন। জগন্নাথ চাটুজ্যে হেঁকে বললেন, ওহে কেদার রাজা, এসো এসো, এদিকে এসো ভায়া—তামাক খাও—

কেদার বললেন, জগন্নাথ দাদা যে ! ভালো সব ?

ভালো আর কই, আবার শুনেছ তো ওপাড়ার নীলমণি গোসাঁইয়ের বাড়ির ব্যাপার ?শোননি ?তা শুনবে আর কোথা থেকে—শুধু মাছ ধরা নিয়ে আছ বই তো নয়—সরে এস ইদিকে বলি—ঘোর কলি হে ভায়া ঘোর কলি, জাতপাত আর রইল না গাঁয়ের বামুনের—

জগন্নাথ চাটুজ্যের কথা শোনবার কোনো আগ্রহ ছিল না কেদারের—পরের বাড়ির কুৎসা ছাড়া তিনি থাকেন না। কিন্তু এঁকে এখান থেকে সরাবার উপায় না দেখলে তো তেল নেওয়া হয় না।কেদার অগত্যা জগন্নাথের কাছে গেলেন। জগন্নাথ গলার সুর নীচু করে বললেন, কাল রাত্তিরে নীলু গোঁসাইয়ের মেয়েটা আফিম খেয়েছিল, জানো না ?

কথাটা প্রথম থেকেই কেদারের ভালো লাগল না। তবুও তিনি বললেন, আফিম ?কেন ?

জগন্নাথ চোখ মুখ ঘুরিয়ে হাসি-হাসি মুখে বললেন, আরে, এর আবার কেন কি কেদার রাজা ! বিধবা মেয়ে, সোমত্ত মেয়ে, বাপের বাড়ি পড়ে থাকে—কোনো ঘটনা-টটনা ঘটে থাকবে। কথায় বলে—

কেদারের নিজের বাড়িতেও ওই বয়সের বিধবা মেয়ে, গল্প শুনবেন কি, জগন্নাথ চাটুজ্যের কথার গূঢ় ইঙ্গিত, শ্লেষ ও ব্যঞ্জনা শুনে কেদার ভেতরে ভেতরে ভয়ে ও সঙ্কোচে আড়ষ্ট হয়ে উঠতে শুরু করলেন। তেল কিনতে এসে এমন বিপদে পড়বেন জানলে তিনি না হয় আজ তৈলবিহীন রান্নাই খেতেন !

জগন্নাথ চাটুজ্যে বললেন, আমি শুনলাম কি করে বলি শোনো তবে। কাল আমি ক্ষেত্র ডাক্তারের বাড়িতে ডাক্তারের স্ত্রীর ব্রত উদ্‌যাপনে নেমন্তন্ন খেতে যাই, তাদের পরিবেশনের লোক হয় না, আমি আমার খাওয়ার পরে নিজে পরিবেশন করতে লাগলুম। রাত প্রায় বারোটা হয়ে গেল। তখন ক্ষেত্র ডাক্তার বললে, এখানেই আমার বাইরের ঘরে বিছানা পেতে দিক, এখানেই শুয়ে থাকুন—এত রাত্তিরে আর বাড়ি যায় না—

শুয়ে আছি, রাত প্রায় তিনটের সময় নীলু গোসাঁইয়ের বড় ছেলে ধীরেন এসে ডাক্তারকে ডাকলে। আমি জেগে আছি, সব শুনছি শুয়ে শুয়ে। ধীরেন কাঁদকাঁদ হয়ে বললে, শিগগির যেতে হবে ক্ষেত্রবাবু, মীনা আফিম খেয়েছে—

ডাক্তার বললে, কতক্ষণ খেয়েছে ?

ধীরেন বললে, কখন যে খেয়েছিল তা তো জানা যায় না। নিজের ঘরে খিল দিয়ে শুয়েছিল, এখন গোঙানি ও কাতরানির শব্দ শুনে সবাই গিয়ে দেখে, এই ব্যাপার।

সেই রাত্রে ক্ষেত্র ডাক্তার ছুটে যায়। কত করে তখন বাঁচায়। তা ওরা ভাবে যে কাক-পক্ষীতে বুঝি টের পেলে না, কিন্তু আমি যে ক্ষেত্র ডাক্তারের বাইরের ঘরে শুয়ে তা তো কেউ জানে না। সোমত্ত বিধবা মেয়ে মীনা, কি জানি ভেতরের ব্যাপারটা কি—কাল পড়েছে খারাপ কিনা—বলে আগুন আর ঘি—আরে উঠলে যে, বোসো !

বারে বারে বিধবা মেয়ের উল্লেখ কেদারের ভালো লাগছিল না—তা ছাড়া জগন্নাথ চাটুজ্যে কি ভেবে কি কথা বলছে তা কেউ বলতে পারে না। লোক সুবিধের নয় আদৌ। সর্ষের তেলের মায়া ছেড়ে দিয়েই কেদার উঠে পড়লেন, জগন্নাথ চাটুজ্যের সামনে তিনি ধারের কথা বলতে পারবেন না সতীশকে।

জগন্নাথ চাটুজ্যে বললেন, তা হলে নিতান্তই উঠলে কেদার রাজা, বাড়ি থাকো কখন হে—একবার তোমাদের বাড়িতে যাব যে—ভাবি যাব, কিন্তু গড়ের খাল পার হতে ভয় হয়, আর যে বনজঙ্গল গড়ের দিকটাতে। তা ছাড়া আবার সেই তিনি আছেন—

জগন্নাথ চাটুজ্যে হাত জোড় করে কার উদ্দেশে দু-তিনবার প্রণাম করলেন।

কেদার বলে উঠলেন, আরে ও কখনো কেউ দেখেনি, এই তো শরৎ রোজ সন্ধের সময় উত্তর দেউলে পিদ্দিম দিতে যায়—একাই তো যায়—কিছু তো কখনো কই—

ঝোঁকের মাথায় কথাটা বলে ফেলেই কেদার বুঝলেন কথাটা বলা তাঁর উচিত হয়নি। জগন্নাথ চাটুজ্যের পেটে কোনো কথা থাকে না—এর কথা ওর কাছে বলে বেড়ানোই তাঁর স্বভাব—এ অবস্থায় মেয়ের কথা তোলাই এখানে ভুল হয়েছে—

কিন্তু জগন্নাথ অন্য দিক দিয়ে গেলেন পাশ কাটিয়ে। বললেন, তুমি বলছ কেদার রাজা কিছু নেই, আমরা বাপ-দাদাদের মুখ থেকে শুনে আসছি চিরকাল—নেই বলে উড়িয়ে দিলেই—অবিশ্যি তোমার মেয়ে ওই নিবান্দা পুরীর মধ্যে একা থাকে, সাহস বলিহারি যাই—আমাদের বাড়ির এরা হলে দিনমানেই থাকতে পারত না—

এদের কথাবার্তার এই অংশটা সতীশ কলুর কানে গিয়েছিল, সে খদ্দেরকে তেল মেপে দিতে দিতে বললে, এখন অবেলায় ও কথাডা বন্ধ করুন বাবাঠাকুর, দরকার কি ওসব কথায় ?চেরকাল শুনে আসছি, বাপ-পিতেমো পজ্জন্ত বলে গিয়েছে—গড়ের বাড়িই পড়ে আছে কতকাল অমনি হয়ে তার ঠিক-ঠিকানা নেই—আমার বয়েস এই তিন কুড়ি চার যাচ্ছে, আমি তো ছেলেবেলা থেকে দেখে আসছি ঠিক অমনি ধারা—কেদার দাদাঠাকুরের বয়েস আমার চেয়ে কত কম—আমি ওনাকে এটুকখানি দেখেছি—

জগন্নাথ চাটুজ্যে বললেন, আরে তোমার তো মোটে চৌষট্টি সতীশ, আমার ঠাকুরদা মারা গিয়েছিলেন আমার ছেলেবেলায়, তিনি বলতেন তাঁর ছেলেবেলায় তিনিও গড়বাড়ি অমনিধারা জঙ্গল আর ইটের ঢিবি দেখে আসছেন, তাঁর মুখেও আমি উত্তর দেউলের কথা শুনেছি—কেদার রাজা কি জানে ?ও কত ছোট আমাদের চেয়ে !

কেদার বলে উঠলেন, ছোট বড় নই দাদা, এই তিপ্পান্ন যাচ্ছে—

জগন্নাথ বললেন,—আর আমার এই খাঁটি ষাট কি একষট্টি—তা হলে হিসেব করে দেখো কতদিন হল, আমার যখন পনেরো তখন ঠাকুরদা মারা যান, তখন তাঁর বয়েস নব্বইয়ের কাছাকাছি—এখন হিসেব করে দেখ ঠাকুরদাদার ছেলেবেলা, সে কত দিনের কথা—কতদিনের হিসেব পেলে দেখো—

কেদার তেলের আশা ত্যাগ করে উঠে পড়লেন—কোনো উপায় নেই, কারো সামনে তিনি ধারের কথা বলতে পারবেন না—বিশেষ করে জগন্নাথ চাটুজ্যের সামনে।

সন্ধ্যার অন্ধকার ঘন হয়েছে। গেঁয়োখালির হাট থেকে ফিরবার পথে গড়ের সদর দেউড়ির দিকে গেলে ঘুর হয় বলে পূর্বদিক দিয়েই ঢুকলেন কেদার—যে দিকটাতে খালে এখনো জল আছে। এদিকটাতেই বড় বড় ছাতিম গাছ আর ঘন বন। এক জায়গায় মাত্র হাঁটুজল খালে, কার্তিক মাসে কচুরিপানার নীলাভ ফুল ফুটে সমস্ত খালটা ছেয়ে ফেলেছে—এতটুকু ফাঁক নেই কোথাও—অন্ধকার সন্ধ্যাতেও শোভা যেন আরো খুলেছে।

খাল পেরিয়ে উঠে গড়ের মধ্যে ঢুকেই ছাতিম বনের ওপারে ডান দিকে এক জায়গায় ধ্বংসস্তূপের থেকে একটু দূরে গোলাকৃতি গম্বুজের মতো ছাদওয়ালা ছোটগোছের মন্দির—এরই নাম এ গাঁয়ে উত্তর দেউল। কেন এ নাম তা কেউ জানে না, সবাই শুনে আসছে চিরকাল, তাই বলে।

উত্তর দেউলের পাশ দিয়ে ছোট্ট পায়ে-চলার পথ বাদুড়নখী কাঁটার ঝোপের মধ্যে দিয়ে গিয়েছে। ছাতিম ফুলের গন্ধের সঙ্গে মিশেছে বাদুড়নখী ও জংলী বনমরচে ফুলের ঘন সুবাস। বনবাঁ-ধারে বেশ ঘন আর অন্ধকার। গড়ের এখানকার দৃশ্যটি সত্যিই ভারি সুন্দর।

কেদার একবার গম্বুজাকৃতি মন্দিরটার দিকে চাইলেন। আজ কেন যেন তাঁর গা ছমছম করতে লাগল। অন্ধকার ঘরটার মধ্যে সামান্য মৃদু প্রদীপের আলো—শরৎ এই সন্ধ্যার সময় প্রতিদিনের মতো সন্ধ্যাদীপ

জ্বালিয়ে দিয়ে গিয়েছে—এটা কেদার রাজার বংশের নিয়ম, আজন্ম দেখে আসছেন তিনি, উত্তর দেউলে বাতি দিয়ে এসেছেন চিরকাল কেদারের মা, ঠাকুরমা এবং সম্ভবত প্রপিতামহী। কেদারের আমলেও দেওয়া হয়।

তিন

শরৎ বাবাকে বললে, তুমি আজও তো কোথাও খাজনা আদায় করতে বেরুলে না—কি করে কি হবে আমি জানিনে। ঘরে কাল থেকে চাল বাড়ন্ত, কোনো কাজের কথা বললে, সে তোমার কানে যায় না, আমি বলে-বলে হার মেনে গিয়েছি—

কেদার বললেন, তা যাব তো ভাবছি। তুই না বললেও কি আর আমি বাড়ি বসে থাকতাম ?একটু বেলা হোক—

শরৎ গৃহকর্মে মন দিলে। কেদার মোটা চাদরখানা গায়ে দিয়ে কিছুক্ষণ পরে বেরুবার উদ্যোগ করতেই শরৎ বললে, না খেয়ে বেরিয়ো না বাবা—আহ্নিক করে একটু জল মুখে দিয়ে যাও—

কিছু খেতে অবিশ্যি কেদারের অনিচ্ছা ছিল না, কিন্তু তৎপূর্বে যে আনুষঙ্গিক অনুষ্ঠানটির কথা শরৎ উল্লেখ করলে, তাঁর যত আপত্তি সেখানে। এত সকালে তিনি আর ও হাঙ্গামার মধ্যে যেতে রাজী নন। সুতরাং তিনি বললেন, আমি এখন আর খাব না, এসে বরং—সবাই বেরিয়ে যাবে কিনা এর পরে—

তাঁদের গ্রামের পাশে রাজীবপুর চাষাদের গাঁ। এখানে কেদারের তিন-চারটি প্রজা আছে। আজ কয়েক মাস যাবৎ কেদার তাদের কাছে খাজনার তাগাদা করে আসছেন, কিন্তু জোর করে কাউকে কিছু বলতে পারেন না বলে একটি পয়সাও আদায় হয়নি।

প্রথমেই কেদার গেলেন একঘর মুসলমান প্রজার বাড়ি। দুখানি মাত্র খড়ের ঘর, উঠোনে ধানের মরাই আছে বটে, কিন্তু বর্তমানে তাতে ধান নেই। আরো দিন পনেরো পরে মাঠ থেকে ধান আসবে। মুরগি চরছে ধানের মরাইয়ের তলায়।

বছর দুই আগে এই বাড়ির মালিকের মৃত্যু হয়েছিল। ছেলে আর ছেলের বউ ছিল—গত চৈত্র মাসে ছেলেটির সর্পাঘাতে মৃত্যু ঘটে—এখন শুধু আছে বিধবা পুত্রবধূ আর একটি মাত্র শিশু পৌত্র। সামান্য জমার জমির ধান আর রবিশস্য থেকে কোনো রকমে সংসার চলে এদের।

কেদার উঠোনে গিয়ে দাঁড়িয়ে হেঁকে বললেন, বলি ও আবদুলের মা, কোথায় গেলে ?

বাড়িতে কেউ ছিল না সম্ভবত। দু-একবার ডেকে কারো সাড়া না পেয়ে কেদার ধানের মরাইয়ের ছায়ায় একখানা কাঠ পেতে বসে পড়লেন। একটু পরে একটি অল্পবয়সি বউ কলসিকক্ষে উঠান পা দিতেই কেদারকে দেখে জিব কেটে একহাতে ঘোমটা টেনে ক্ষিপ্রপদে উঠোন পার হয়ে ঘরে উঠল।

একটু পরে বউটি একখানা পিঁড়ি নিয়ে এসে কেদারের বসবার জায়গা থেকে হাত দশেক দূরে মাটির ওপর রেখে চলে গেল। কেদার সেখানা টেনে এনে তাতে বসলেন।

মেয়েটি আরো প্রায় কুড়ি মিনিট পরে ঘোমটা দিয়ে ঘরের বার হয়ে ছাঁচতলায় নেমে দাঁড়াল। কোনো কথা বললে না।

কেদার বললেন, আর বছরের দরুন এক টাকা পাঁচ আনা আর এ বছরের সমস্ত খাজনা—মোট সাড়ে চার টাকা তোমার কাছে বাকি, টাকাটা আজ দিয়ে দাও—বুঝলে ?

মেয়েটি নম্রসুরে বললে, বাপজী—

কেদার চমকে উঠলেন। কখনো বউটি তাঁর সঙ্গে কথা বলেনি—তা ছাড়া ওর মুখের ডাকটি তাঁর বড় ভালো লাগল। শরতের চেয়েও বউটির বয়েস কম।

কেদার বললে—কি ?

—টাকা তো জোগাড় করতে পারিনি আজও, কলাই বিক্রি না করে টাকা দিতে পারব না।

কেদার দ্বিরুক্তি না করে সেখান থেকে উঠলেন। ওর মুখের 'বাপজী' ডাকের পর আর কখনো তাকে কড়া তাগাদা করা চলে ?

আর এক বাড়ি গিয়ে দেখলেন, তাদের বাড়িসুদ্ধ সব ম্যালেরিয়া জ্বরে পড়ে। শুধু রোগের সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে সেখান থেকে তিনি বিদায় নিলেন।

পথে বেলা বেশি হয়েছে। এক দিনের পক্ষে যথেষ্ট বিষয়কর্ম করা হল—বেশি খাটতে তিনি রাজী নন—বাড়ির দিকে ফিরবার জন্যে সড়কে উঠেছেন, এমন সময় একজন বৃদ্ধের সঙ্গে দেখা হল।

বৃদ্ধ লোকটির পরনে আধময়লা থান, গায়ে চাদর, হাতে একটা বড় ক্যাম্বিসের ব্যাগ। তাঁকে দেখে লোকটি জিজ্ঞেস করলে, হ্যাঁ মশাই, গড়শিবপুর যাব কি এই পথে ?

—গড়শিবপুরে কোথায় যাবেন ?

—ওখানকার রাজবাড়ির অতিথিশালা আছে—শুনলাম, সকলে বললে। অনেক দূর থেকে আসছি, অতিথিশালায় গিয়ে আজ আর কাল থাকব ?

—গড়শিবপুরের রাজবাড়ি ?কে বলে দিয়েছে ?আচ্ছা, চলুন নিয়ে যাই, আমার সঙ্গে চলুন—

কেদারের বাড়ির অতিথিশালা পূর্বপুরুষদের আমল থেকেই আছে—সেই নামডাকেই এখনো গ্রামে অপরিচিত বিদেশী লোক এলে কেদারের বাড়ি অতিথি হতে আসে। নিজে খেতে না পেলেও পূর্ব-আভিজাত্যের গৌরব স্মরণ করে কেদার তাদের থাকবার খাবার বন্দোবস্ত করে দিয়ে আসছেন বরাবর। কখনো তাদের ফিরিয়ে দেননি এ-পর্যন্ত। থাকবার জায়গার অসুবিধা বলে কেদার কাছারিবাড়ির উঠানে অতিথির জন্যে একখানা ছোট্ট দো-চালা খড়ের ঘর তৈরি করে দিয়েছেন অনেক দিন থেকে। খড় পুরানো হয়ে জল পড়তে শুরু করলে কেদার নিজেই চালে উঠে নতুন খড়ের খুঁচি দেন। এই ঘরখানার নামই অতিথিশালা। কেদারকে বিপন্ন হয়ে পড়তে হয় যখন হঠাৎ অতিথি এসে জোটে অতিথিশালায়, হয়তো নিজের ঘরেই সেদিন চাল বাড়ন্ত—কিন্তু অতিথিকে যোগান দিতেই হবে। অনেক সময় গ্রামের লোক দুষ্টুমি করেও কেদারের অতিথিশালায় অতিথি পাঠিয়ে দেয়, সকলেই জানে কেদারের অবস্থা—মজা দেখবার লোভ সামলানো যায় না সব সময়।

সাধারণ অতিথিকে দিতে হয় এক বোঝা কাঠ ও এক সের চাল, সামান্য কিছু নুন আর তেল। তরকারি হিসাবে দু-একটা বেগুন। এর বেশি কিছু দেবার নিয়ম নেই পূর্বকাল থেকেই— কেদারও তাই দিয়ে আসছেন।

তবে ভদ্র-অতিথি এলে অন্যরকম ব্যবস্থা। নিয়ম আছে দুধ, ঘি, সৈন্ধব লবণ, মিছরিভোগ, আতপ চাল, মুগের ডাল ইত্যাদি তাকে যোগাতে হবে। কেদারের বর্তমান অবস্থায় সে-সব কোথায় পাওয়া যাবে—কাজেই নিজের ঘরে রেঁধে তাদের খাওয়াতে হয়—যতই অসুবিধা হোক, উপায় নেই। মাসের ভিতর পাঁচদিনও শরৎকে অতিথিসেবা করতেই হয়। আজ কেদার একটু অসুবিধায় পড়লেন।

ঘরে এমন কিছু নেই যা অতিথিশালায় পাঠাতে পারেন। লোকটি কি শ্রেণীর তা এখনো তিনি বুঝতে পারেননি, সাধারণ শ্রেণীর বলেই মনে হচ্ছে। অন্তত আধসের চালও তো দিতে হয়, কি করা যাবে সে-সম্বন্ধে পথ হাঁটতে হাঁটতে কেদার সেই কথাই ভাবতে লাগলেন।

বৃদ্ধ বললে, কতদূর মশাই গড়শিবপুর ?

—এই বেশি নয়, ক্রোশখানেক হবে। আপনাদের বাড়ি কোথায় ?

—বাড়ি অনেকদূর, মেহেরপুরের কাছে, নদে জেলায়।

—কোথায় যাবেন ?

—দেশ বেড়িয়ে বেড়াচ্ছি। যেদিকে যখন ইচ্ছে, তখন সেদিকেই যাব—

—আপনারা ?

—ব্রাহ্মণ, কাশ্যপ গোত্র, অভিনন্দ ঠাকুরের সন্তান, খড়দ মেল—আমার নাম শ্রীগোপেশ্বর চট্টোপাধ্যায়।

কেদারের বয়স হয়েছে, সুতরাং তিনি জানেন ব্রাহ্মণদের পরিচয় দেবার এই প্রথাই ছিল আগের কালে। তাঁর ছেলেবেলায় তিনি দেখে এসেছেন বটে। এমন লোককে অতিথিশালায় পাঠিয়ে দেওয়া যায় না, নিজের ঘরে রেঁধে খাওয়াতে হয়।

গ্রামের মধ্যে ঢুকে ব্রাহ্মণ বললে, রাজবাড়ি দেখিয়ে দিয়ে আপনি চলে যান, আমার সঙ্গে অনেকদূর তো এলেন—আর কষ্ট করতে হবে না আপনার—

—চলুন, আমিও সেই বাড়ি যাব, সেই বাড়ির লোক—

—আপনি রাজবাড়ির লোক বুঝি ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ—আমি—ইয়ে—

গড়ের খাল পেরিয়ে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বিস্ময়ের চোখে দু-ধারের জঙ্গলে ভরা ধ্বংসস্তূপগুলির দিকে চেয়ে চেয়ে দেখে বললে—রাজবাড়ি কতদূর ?

কেদার কৌতুকের সঙ্গে বললেন, দেখতেই পাবেন, চলুন না—

দেউড়ির ধ্বংসস্তূপ পার হয়ে নিজের চালাঘরের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে কেদার বললেন, এই রাজবাড়ি—আসুন—

বৃদ্ধ কেদারের মুখের দিকে ফ্যালফ্যাল করে চাইলে।

কেদার হাসিমুখে বললেন, আমিই রাজবাড়ির রাজা—আমারই নাম কেদার রাজা—

ইতিমধ্যে শরৎ বার হয়ে বাবাকে কি বলতে এল, সকালে উঠে সে স্নান সেরে নিয়েছে, ভিজে চুলের রাশি পিঠময় ছড়ানো, গায়ের রঙের সুগৌর দীপ্তি রোদে দশগুণ বেড়েছে, বৃদ্ধ ব্রাহ্মণঅবাক হয়ে এই সুন্দরী মেয়েটির দিয়ে চেয়ে রইল।

কেদার বললেন, আমার মেয়ে, ওর নাম শরৎসুন্দরী। প্রণাম করো মা, ব্রাহ্মণ অতিথি—

শরৎসুন্দরী বাবাকে আড়ালে ডেকে জিজ্ঞেস করলে, তার পর, নিয়ে তো এলে, এখন উপায় ?ঘরে তো এক দানা চাল নেই। বেলাও হয়েছে, কি করি বলো ?

কেদার বললেন, যা হয় করো মা তুমি। আমি কিছু জানি নে—ওবেলা আমি বরং—

শরৎসুন্দরী রাগ করে নিজের গালে চড় মারতে লাগল। ফর্সা গাল রাঙা হয়ে গেল। মেয়ে এরকম প্রায়ই করে থাকে বেশি রাগ হলে—কেদার অপ্রতিভ মুখে বললেন, ও কি করো মা ছেলেমানুষি ! না—ছিঃ—অমন করতে নেই।

শরৎ জলভরা চোখে রাগের ও ক্ষোভের সুরে বললে, আমার ইচ্ছে করে গলায় দড়ি দিয়ে কি মাথায় ইট ভেঙে মরি, আমার এ যন্ত্রণা আর সহ্যি হয় না বাবা। বেলা দুপুরের সময় তুমি এখন নিয়ে এলে ভদ্রলোক অতিথি, নিজেদের নেই খাবার জোগাড়—কি করব—বলো বুঝিয়ে আমায়। নিত্যি তোমার এই কাণ্ড—কত বার না তোমায় বলেছি—

কেদার চুপ করে রইলেন, বোবার শত্রু নেই। শরৎ তাঁর সামনে থেকে চলে গেলে তিনি অতিথির সঙ্গে এসে বসে গল্প করতে লাগলেন, কারণ শরৎ যে একটা যা হয় কিছু ব্যবস্থা করে ফেলবেই এ বিষয়ে তাঁর কোনো সন্দেহ ছিল না। শরৎ রাগী তেজী মেয়ে বটে, কিন্তু সব কাজে ওর ওপর বড় নির্ভর করা চলে অনায়াসে। খুব স্থিরবুদ্ধি মেয়ে।

শরৎ কোথা থেকে কি করলে তিনি জানেন না, আহারের সময় অতিথির সঙ্গে খেতে বসে দেখলেন, ব্যবস্থা নিতান্ত মন্দ হয়নি। এত বেলায় মাছও জোগাড় করে ফেলেছে মেয়ে।

আহারাদির পর কেদার বললেন, আচ্ছা গোপেশ্বরবাবু, চলুন একটু বিশ্রাম করবেন—

তারপর তিনি অতিথিকে সঙ্গে নিয়ে অতিথিশালার দো-চালা ঘরখানাতে এলেন। এখানে একখানা কাঁঠাল কাঠের সেকেলে ভারি তক্তপোশ পাতা আছে অতিথির জন্যে। পাতার জন্যে একখানা পুরানো মাদুর ছাড়া অন্য কিছু নেই চৌকিখানার ওপর—দেবার সঙ্গতিও নেই তাঁর।

বৃদ্ধ বললেন, বসুন আপনিও। একটু গল্পগুজব করি আপনার সঙ্গে।

—আপনার গান-বাজনা আসে ?

—সামান্য এক-আধটু। সে কিছুই নয়—

কেদার উৎসাহে উঠে পড়লেন চৌকি ছেড়ে। গানবাজনা জানে এ ধরনের লোকের সঙ্গ তাঁর অত্যন্ত প্রিয়। এরকম লোকের সঙ্গে দেখা হওয়া ভাগ্যের কথা।

বললেন, কি বাজনা আসে আপনার ?

—কিছু না, তবলা বাজাতে পারি এক-আধটু—

—তা হলে আজ ওবেলা আপনাকে যেতে দেব না গোপেশ্বরবাবু—আমাদের আড্ডায় আজ সন্ধ্যাবেলা আপনাকে নিয়ে একটু আমোদ করা যাবে—

—তা আপনি যখন বলছেন, আমায় থাকতে হবে রাজামশায়। আপনার অবস্থা এখন যাই হোক, আপনি গড়শিবপুরের রাজবংশের বড় ছেলে, এখানকার রাজা। আমি সব শুনেছি আসবার পথে। আপনার অনুরোধ না রেখে উপায় কি বলুন ! আর আমার কোনো তাড়া নেই, দেশ দেখতেই তো বেরিয়েছি—

—পায়ে হেঁটে ?

—পয়সাকড়ি কোথায় পাব বলুন ! পায়ে হেঁটে যত দূর হয় দেখছি। কখনো দূর দেশে যাইনি, কিছু দেখিনি ছেলেবেলা থেকে, অথচ বেড়াবার শখ ছিল। ভাবলুম বয়েস ভাঁটিয়ে গেল, এইবার বেরুনো যাক, হেঁটেই দেশ দেখব। পয়সা কোনো দিনই হবে না আমাদের হাতে। তা ধরুন ইতিমধ্যে নদীয়া জেলা সেরে ফেলেছি, এবার আপনাদের জেলায়—

—আপনার বয়েস হয়েছে, এরকম হেঁটে পারেন এখনো ?

বয়েস হলেও মনটা তো এখনো কাঁচা। কখনো কিছু দেখিনি বলেই যা দেখছি তাই ভালো লাগে। ভালো লাগলে হাঁটতে কষ্ট বোধ হয় না। কিন্তু আপনাকে দেখে আজ এত অবাক হয়ে গিয়েছি আমি, আর আপনাকে এত ভালো লেগেছে যে কি বলব ! সত্যিকার রাজদর্শন ভাগ্যি ছাড়া হয় না, আমার তাই হল আজ। আমিও আমুদে লোক রাজামশায়, আমোদ ভালোবাসি বলেই বেরিয়েছি এই বয়সে।

—বেশ তো, এখানে দু'চারদিন থেকে যান। আমোদ করা যাবে এখন। আপনার মতো লোক পেলে—

—কি জানেন, অল্প বয়সে বিয়ে হয়ে কাচ্চাবাচ্চা নিয়ে নেন্‌জার হয়ে পড়লুম রাজামশাই। দেশ ভ্রমণের শখ ছিল এস্তক লাগাৎ। কিন্তু যেতে পারিনে কোথাও—মনটা মাঝে মাঝে এমন হাঁপাত ! এই আমার বাষট্টি-তেষট্টি বছর বয়েস হয়েছে—আর বছর মেয়ে দুটিকে পাত্রস্থ করার পরে সংসারের ঝঞ্ঝাট অনেকটা মিটল। তাই বলি কখনো কোথাও যাইনি—বেড়িয়ে আসি একবার। এক বছর পথে পথে থাকব—

—লাগছে ভালো এরকম হেঁটে বেড়ানো ?

—আহা, বড্ড ভালো লাগছে রাজামশায়। নদীর ধার, বটগাছের তলা, মাঠে যবের ক্ষেত, মেয়েদের ক্ষার-কাচা পিঁড়ির ওপরে, হয়তো কোনো পুকুরের পাড়—যা দেখি তাতেই অবাক হয়ে থাকি। বড় ভালো লেগেছে আমার। যেখানে নদে জেলা শেষ হল সেখানে একটা বড় শিমুল গাছ আছে রাস্তার ধারে। জেলার শেষ কখনো দেখিনি—হাঁ করে জায়গাটাতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলুম কতক্ষণ। বেশ রদ্দুর তখন মাঠে, আকাশে বড় বড় চিল উড়ছে, কেউ কোনোদিকে নেই। আমার এক বন্ধু ছিল, মারা গিয়েছে অনেক কাল, নাম ছিল কেশব—সে-ও দেশ দেখতে ভালোবাসত বড়। তার কথা মনে পড়ল—

কেদার বিস্ময়ে ও কৌতূহলের সঙ্গে বৃদ্ধের গল্প শুনছিলেন। তিনিও বেশিদূর কোথাও যাননি, অবস্থার জন্যেও বটে—তাছাড়া সংসার ফেলে নড়তে পারেন না। তাঁর বড় ইচ্ছে হল মনে, নদে জেলা যেখানে শেষ হয়েছে, সেই শিমুল গাছের তলাটাতে গিয়ে একবার দাঁড়ান। কখনো তিনি দেখেননি জেলা কি করে শেষ হয়। বৃদ্ধের বর্ণনা শুনে মনে মনে অনেক দূরের সেই অদেখা শিমুল গাছের তলায় চলে গিয়েছে তাঁর মন।

জিজ্ঞেস করলেন, আচ্ছা গোপেশ্বরবাবু, সেই যেখানে শিমুল গাছ, তার এপারে ওপারে তো দুই জেলা ?একহাত তফাতেই নদীয়া, এধারে আবার যশোর। ধরুন আমার যদি একখানা বেগুনের ক্ষেত থাকে সেখানে, একটা বেগুন গাছ থাকবে নদে জেলায়, আর দু হাত তফাতের বেগুন গাছটা হবে যশোর জেলায়। ভারি মজা তো। সেখানে এমন জমি আছে ?

বৃদ্ধ হেসে বললে, কেন থাকবে না ?ওদিকের জমি হবে কেষ্টনগর সদরের তৌজিভুক্ত, আর এদিকের জমি হবে যশোর বনগাঁ মহকুমায়—

—বাঃ বাঃ চমৎকার !

কেদারের মুখচোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল বিস্ময়ে ও কৌতূহলে। তার ইচ্ছে হল জায়গাটা এখান থেকে কতদূর হবে জিজ্ঞেস করে নেন। কিন্তু পরক্ষণে মনে পড়ল বাড়ি ছেড়ে কোথাও যাবার জো নেই তাঁর, শরৎকে একা এই বনের মধ্যে রেখে একদিনও তাঁর নড়বার উপায় আছে কোথাও ?ছেলেমানুষ শরৎ...

জেলার সীমা দেখা তাঁর ভাগ্যে নেই।...

সন্ধ্যার সময় বৃদ্ধকে নিয়ে কেদার ছিবাস মুদির দোকানে গিয়ে হাজির হলেন। রাত দশটা পর্যন্ত সেখানে পুরোদমে গান-বাজনা চলল। সকলেই বৃদ্ধের হাতে তবলা বাজানোর প্রশংসা করলে। খুব দ্রুত এবং খুব মিঠে হাত। সেই আড্ডাতেই আবার এসে জুটল জগন্নাথ চাটুজ্যে। কোনো দিন আসে না, আজ কি ভেবে এসে পড়েছে কে জানে !

জগন্নাথ চাটুজ্যে মন দিয়ে খানিকক্ষণ গোপেশ্বরের বাজনা শুনে কেদারের কানে কানে বললে, ওহে কেদার রাজা, এ ভদ্রলোকটি বেশ গুণী দেখছি। এঁকে জোটালে কোথা থেকে হে ?

কেদার পরিচয় দিলেন। জগন্নাথ শুনে খুব খুশি। তাঁর ইচ্ছে কেদারের বাড়িতে এসে লোকটির সঙ্গে কাল সকালে আরো আলাপ জমান। কেদার বললেন, তা বেশ তো দাদা, আসুন না সকালে—

বাড়ি ফিরতে রাত এগারোটা হয়ে গেল। রাত্রের আহারের ব্যবস্থা শরৎ ভালোই করেছে। মেয়ের ওপর ভর দিয়ে কেদার নিশ্চিন্ত থাকেন কি সাধে ?কোথা থেকে সে কি করে, কেদার কোনোদিন খবর রাখেননি। সে রাগ করুক, সংসারের কাজকর্ম সব ঠিকমতো করে যাবে, সে বিষয়ে তার ত্রুটি ধরবার উপায় নেই। ঠিক ওর মায়ের মতো।

কেদার বোধ হয় একটু দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন কি ভেবে।

গোপেশ্বর চাটুজ্যে কেদারের সঙ্গে বাড়ির চারদিক বেড়িয়ে বেড়িয়ে দেখলেন। গড়ের এপারে ওপারে যে সব প্রাচীন ধ্বংসস্তূপ বনের আড়ালে আত্মগোপন করে রয়েছে, তার সবগুলির ইতিহাস কেদারেরও জানা নেই।

একটা পাথরের হাত-পা-ভাঙা মূর্তির চারিদিকে নিবিড় বেতবন।

গোপেশ্বর বললেন, এ কি মূর্তি ?

কেদার বলতে পারলেন না। বিভিন্ন মূর্তি চিনবার বিদ্যা নেই তাঁর। বাপ-পিতামহের আমল থেকে শুনে আসছেন এখানে যে মূর্তি আছে, অনেক দিন আগে মুসলমানদের আক্রমণে তার হাত পা নষ্ট হয়—কেউ বলে কালাপাহাড়ের আক্রমণে,—এ সব কিছু নয়, আসল কথা কেউ কিছু জানে না।বিস্মৃত অতীত কোনো ইতিহাস লিখে রেখে যায়নি গ্রামের মাটির বুকে—সময় যে কি সুদূরপ্রসারী অতীত ও ভবিষ্যৎ রচনা করে মানুষের স্মৃতিতে, সে গহন রহস্য এসব গ্রামের লোকের কল্পনাহীন মনে কখনো তার উদার ছায়াপাত করেনি, পঞ্চাশ বছর আগে কি ঘটেছিল গ্রামে, তাও তারা যখন জানে না—তখন ঐতিহাসিক অতীতের কাহিনী তাদের কাছে শুনবার আশা করা যায় কি করে ?

গড়ের বাইরে এসে কেদার একটা প্রাচীন বটগাছ দেখালেন। কেদারের বাড়ি থেকে জায়গাটা অনেক দূর। গাছটার তলায় প্রাচীন আমলের বড় বড় শিবলিঙ্গ, গৌরীপট্ট, মকরমুখ পয়োনালা ইত্যাদি এখানে ওখানে পড়ে আছে স্মরণাতীত কাল থেকে—গ্রামের কেউ বলতে পারে না সে-সব কোথা থেকে এল। বৃদ্ধ গোপেশ্বর চাটুজ্যে এসব দেখে সেই ধরনের আনন্দ পেল, অধিকতর সচ্ছলঅবস্থার ভ্রমণকারী দিল্লি আগ্রার মুঘলের কীর্তি দেখে যে আনন্দ পায়।

কেদারকে বললে, রাজা মশায়, যা দেখলাম আপনার এখানে, জীবনে কখনো দেখিনি। দেখবার আশাও করিনি—এসব জিনিস কতকালের, যুধিষ্ঠির ভীম অর্জুনের সময়কার বোধ হয়। পাণ্ডবদের রাজ্য ছিল এখানে—না ?

সেই রাত্রে বৃদ্ধের জ্বর হল। পরদিন সকালে কেদার অতিথিশালায় এসে দেখলেন বিছানা থেকে উঠবার ক্ষমতা নেই বৃদ্ধের। সারাদিন জ্বর ছাড়ল না—সন্ধ্যার পরে তার ওপর আবার ভীষণ কম্প দিয়ে জ্বর এল। কেদার পড়ে গেলেন মুশকিলে। তাঁর বাইরে যাওয়া একেবারে বন্ধ হয়েগেল। সর্বদা রোগীর কাছে থাকতে হয়, কখনো তিনি কখনো শরৎ।

সাতদিন এভাবে কাটল। কেদার পাশের গ্রাম থেকে সাতকড়ি ডাক্তারকে এনে দেখালেন, বৃদ্ধের জ্ঞান নেই—তার বাড়ির ঠিকানাটা জেনে নিয়ে একখানা চিঠি দেবেন তার আত্মীয়স্বজনকে, তার সুযোগ পেলেন না কেদার। শরৎ যথেষ্ট সেবা করলে এই বিদেশী অতিথির। ঠিক সময়ে দুটি বেলা বৃদ্ধের পথ্য প্রস্তুত করে নিজের হাতে তাকে খাইয়ে আসা, বাপের স্নানাহারের সুযোগ দেবার জন্যে নিজে রোগীর পাশে বসে থাকা, নিজের বাবার অসুখ হলেও শরৎ বোধ হয় এর চেয়ে বেশি করতে পারত না।

ন'দিনের পর বৃদ্ধের জ্বর ছেড়ে গেল। পথ্য পেয়ে আরো এক সপ্তাহ বৃদ্ধ রয়ে গেল অতিথিশালায়—কেদার কিছুতেই ছাড়লেন না, এ অবস্থায় তিনি অতিথিকে পথে নামতে দিতে পারেন না। বাড়িতে চিঠি দিতে চাইলে বৃদ্ধ ঘোর আপত্তি তুললে। বললে, কেন মিছে ব্যস্ত করা তাদের ?স্ত্রী নেই, মেয়ে নেই—থাকবার মধ্যে আছে ছেলে দুটি আর ছেলের বউয়েরা—তাদের অবস্থা ভালো নয়, তাদের বিব্রত করতে চাই নে।

পরের সপ্তাহে বৃদ্ধ বিদায় নিয়ে চলে গেল। শরৎ পায়ের ধূলো নিয়ে প্রণাম করতে বৃদ্ধের চোখে জল দেখা দিল। শরতের মাথায় হাত দিয়ে বললে, এমন সেবা আমার আপনার লোক কখনো করেনি। আমার পয়সা নেই, পয়সা থাকলে হয়তো তারা করত। তুমি যে বড় বংশের মেয়ে তা তোমার অন্তর দেখেই বোঝা যায়। তুমি আমার যা করলে, কখনো তা পাইনি কারো কাছ থেকে। তোমায় আর কি বলে আশীর্বাদ করব মা, ভগবান যেন তোমায় দেখেন।

কেদার বললেন, আপনি কি এখন বাড়ি যাবেন ?

—না রাজামশায়—বেরিয়ে পড়েছি যখন, তখন ভালো করে সব দেখে নিই। অনেক কিছু দেখলাম, আরো অনেক কিছু দেখব। আপনাকে আর মাকে যা দেখলাম এই তো আমার কাছে একেবারে নতুন।

বাড়ি থেকে না বেরুলে কি আপনাদের মতো মানুষের দর্শন পেতাম ?ফেরবার পথে আপনাদের সঙ্গে দেখা না করে যাবো না।

অনেক দিন পরে বাড়ি থেকে বেরুবার অবকাশ পেলেন। বৃদ্ধের অসুখ সেরে গেলেও রুগ্ণ অতিথিকে একা ফেলে কেদার কোথাও যেতে পারতেন না বড় একটা। সর্বদা কাছে বসে কথাবার্তা বলতেন। আজ একটা বড় দায়িত্বের বোঝা যেন ঘাড় থেকে নেমে গেল।

ছিবাস মুদির দোকানের আড্ডায় জগন্নাথ চাটুজ্যে বললে—আরে এই যে কেদার রাজা, এসো এসো—কি হল, অতিথি চলে গেল ?যাক, বাঁচা গিয়েছে—আচ্ছা অতিথি জুটিয়েছিলে বটে। বাপরে, একেবারে একটি মাসের মতো জুড়ে বসল—যাবার নামটি করে না !

কেদার হেসে বললেন, কি করে যায় বলো—বেচারি এসেই পড়ে গেল অসুখে। লোক বড় ভালো, তার কোনো ত্রুটি নেই। তার পর জগন্নাথ খুড়ো—এখানে কি মনে করে ?তোমাকে তো দেখিনে এখানে আসতে ?

জগন্নাথ বললে, মাঝে মাঝে আসি আজকাল। একা বাড়ি বসে থাকি আর ওই একটু সতীশের দোকান নয় তো পঞ্চানন বিশ্বেসের বাড়ি—কোথায় যাই বলো আর ?একটু বেহালা ধরো দিকি হে বাবাজী—তোমার বাজনা শুনিনি অনেক দিন।...

শরৎ সন্ধ্যাবেলায় উত্তর দেউলে প্রতিদিনের মতো প্রদীপ দিতে গেল। দীঘির পশ্চিম পাড়ঘুরে সেই বড় বড় ছাতিম গাছতলা দিয়ে প্রায় তিন রশি পথ যেতে হয়—বড় বন এখানটাতে। বাদুড়নখীর জঙ্গলে শুকনো বাদুড়নখী ফল আঁকড়ে ধরে রোজ শরতের পরনের কাপড়। রোজ ছাড়াতে হয়।

যে গম্বুজাকৃতি মন্দিরটার নাম 'উত্তর দেউল', সেটা একেবারে এই পায়ে চলা সরু পথের পাশেই, গড়ের খালের ধারের ধ্বংসস্তূপ থেকে একটু দূরে, স্বতন্ত্রভাবে দণ্ডায়মান। বাদুড়নখীর কাঁটাজাল ভেঙে পথটা এসে একেবারে মন্দিরের ভাঙা পৈঠায় উঠেছে। মাটি থেকে খুব উঁচু রোয়াক, তার ওপর গোল গম্বুজাকৃতি মন্দির—দুটি কুঠুরি পাশাপাশি। কি উঁচু ছাদ—শরতের মনে হয় মন্দিরের মধ্যে ঢুকতেই। চামচিকের বাসা—দোর খুলতেই খোলা দরজা দিয়ে একপাল চামচিকে উড়ে পালাল। ভেতরের কুঠুরিতে বেশ অন্ধকার। গা ছমছম করে সাহসিকার, তবুও তো ওর হাতে মাটির প্রদীপ মিটমিট জ্বলছে, আঁচল দিয়ে আড়াল করে আনতে হয়েছে পাছে বাতাসে নেবে। আলো হাতে ভয় কিসের ?

হঠাৎ যেন পাশের কুঠুরিতে কার পায়ের শব্দ শোনা গেল অন্ধকারে। শরতের বুকের মধ্যে ঢিপ ঢিপ করে উঠল—তবুও সে সাহসে ভর করে কড়া-সুরে হেঁকে বললে—কে ওখানে ?

ওর হাত কাঁপছে।...

কোনো সাড়া না পেয়ে শরৎ সাহসে ভর করে আর একবার ডেকে বলল—কে পাশের ঘরে ?সামনে এসো না দেখি ?

ওর কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কে যেন পাশের কুঠুরির ওদিকের কবাটবিহীন দোর দিয়ে দ্রুতপদে বেরিয়ে গেল—বাইরের চাতালে তার পায়ের শব্দ বেশ স্পষ্ট শোনা গেল।

শরৎ মন্দিরের মেঝেতে মাটির পিলসুজে বসানো প্রদীপটা জ্বালাতে জ্বালাতে আপনমনে বকতে লাগল—দোগেছের শ্মশান তোমাদের ভুলে রয়েছে ?মুখপোড়া বাঁদরের দল—বাড়িতে মা-বোন নেই ?

ওর আগের ভয়টা একেবারে সম্পূর্ণ কেটেছে। ব্যাপারটা অপ্রাকৃতের শ্রেণী থেকে সম্পূর্ণ বাস্তবের গণ্ডির মধ্যে এসে পৌঁচেছে। দু-পাঁচ মাস অন্তর, কখনো বা উপরি উপরি দু-তিন মাস ধরে—এক-একদিন এরকম কাণ্ড উত্তর দেউলে সন্ধ্যাবেলা আলো দিতে এসে ঘটেই থাকে। গ্রামের বদমাইশ কোনো ছেলে-ছোকরার কাণ্ড। এমন কি কার কাণ্ড শরৎ খানিকটা মনে মনে সন্দেহও করতে পারে—তবে সেটা অবিশ্যি সন্দেহমাত্রই।

শরৎ এসবে ভয় খায় না, ভয় খেতে গেলে তার চলেও না। দরিদ্রের ঘরে সুন্দরী হয়ে যখন জন্মেছে, তখন এ রকম অনেক উপদ্রব সহ্য করতে হবে, সে জানে। বাবার তো সে-সব জ্ঞান নেই, সেই যে বেরিয়েছেন কখন তিনি ফিরবেন তার ঠিকানা আছে ?একাই এই নিবান্দা পুরীর মধ্যে যখন থাকা, তখন ভয় করে কি হবে ?আসুক না কার কত সাহস, বঁটি নেই ঘরে ?বঁটি দিয়ে নাক যদি কেটে দুখানা না করে দিই তবে আমি গড়শিবপুরের রাজবংশের মেয়ে নই ! পাজি, বদমাইশ সব কোথাকার !

প্রদীপ দেখিয়ে যখন সে মন্দিরের বাইরে এসে দাঁড়ালে—তখন সন্ধ্যার অন্ধকার বেশ ভালো করে নেমেছে। ওই দীঘির পাড়ের ছাতিমবনটা বড় অন্ধকার হয়ে পড়ে এ সময়—ওখানটাতে ভয় যে না করে এমন নয়। শরৎ যে-প্রদীপটা হাতে করে এনেছিল, সেই প্রদীপটা প্রাণপণে আঁচল দিয়ে বাঁচিয়ে বাদুড়নখীর কাঁটাজঙ্গলের পথ বেয়ে চলে গেল—শুকনো ফলের থোলো নাড়া পেয়ে ঝমঝম করছে—দু-একবার ওর কাপড় পেছন থেকে টেনেও ধরলে বাদুড়নখী ফলের বাঁকা ঠোঁট—দু-একবার ও ছাড়িয়েও নিলে।

বাড়ি পৌঁছে যদি রাজলক্ষ্মীকে দেখতে পেত, খুব খুশি হত সে, কিন্তু সে পোড়ারমুখী আসেনি। শরৎ রান্নাঘরে ঢুকে উনুন জ্বেলে রান্না চড়িয়ে দিলে।

গোপেশ্বর চাটুজ্যে ছিল এতদিন, শরতের বেশ লাগত। বাপের বয়সি বৃদ্ধকে সেবা করেআনন্দ পেত সে—কেদার সেরকম নন, তিনি সেবা তেমন কখনো চান না। তাছাড়া নির্জন পুরীতে দু-একজন মানুষের মুখ যদি দেখা যায়, সে ভালোই।

শরৎ সেবা করতে ভালোবাসে, পছন্দ করে। জীবনে যেটা সে চেয়েছিল, তাই তার হল না। স্বামীর কথা তার ভালো মনে হয় না, সেদিক থেকে তার মন শূন্য—সে মন্দিরের সোপান-বেদিতে কোনো দেবতা নেই—তাদের গড়ের উত্তর দেউলের মতোই।

সেজন্যে শরৎ স্বাধীন আছে এখনো—সম্পূর্ণ স্বাধীন। মনের দিগন্তে এতটুকু মেঘ নেই কোনোদিকে।

বেশি রাত এখনো হয়নি, শরৎ ডাল সবে নামিয়েছে—এমন সময় কেদার বাড়ি এলেন।

শরৎ হাসিমুখে বললে, এত সকাল যে বাড়ি ফিরলে, আবার যাবে বুঝি ?

কেদার শান্তভাবে বললেন, না, আর যাব না—তবে—

—না বাবা, আজ আর যেয়ো না—

কেদার একটু অবাক হয়ে মেয়ের মুখের দিকে চাইলেন। ওর গলার সুরের মধ্যে বোধ হয় কি পেলেন।

—কেন বলো তো মা ?

—এমনি বলছি—থাকো না বাড়িতে। সকাল সকাল খেয়ে নাও।—রান্না হয়ে গেল, একটু চা করে দেব নাকি ?

কেদার চা খেতে তেমন অভ্যস্ত নন, মেয়েও এত আদর করে তাকে চা খেতে বলে না কোনোদিন। ইতস্তত করে বললেন, তা কর না হয়—খাওয়া যাক। তুইও খা একটু—

—আজ একটা গল্প করো না বসে আমার কাছে ?করবে ?ভালো কথা, সন্ধে-আহ্নিকটা সেরে নাও দিকি ?জায়গা করে দিই।

মেয়ে মুশকিলে ফেললে দেখা যাচ্ছে। কেদার একটু বিব্রত হয়ে পড়লেন। তিনি আসলে এসেছিলেন খানিকটা রজন সংগ্রহ করতে বেহালার ছড়ে দেবার জন্যে। ছিবাস মুদির আড্ডায় রজন ছিল, ফুরিয়ে গিয়েছে, কিংবা হারিয়ে গিয়েছে। এত রাত্রে এ গ্রামের আর কোথাও ও-জিনিস পাওয়া গেলে কেদার কখনই বিপদের মুখে পা দিতেন না। করাই বা যায় কি ?অগত্যা কেদার সন্ধ্যা-আহ্নিকে বসলেন। পাঁচ মিনিটের মধ্যে সাঙ্গও

করে ফেললেন। তার পর তিনি ভাবছেন এখন কি ভাবে বাইরে যাওয়া যায়, শরৎ আবার আবদারের সুরে বললে—বাবা, বল একটা গল্প—আজ তোমাকে যেতে দেব না—

কেদারের বুকের ভিতরটা কেমন করে উঠল। আজ শরৎ যেন ছেলেমানুষের মতো হয়েছে। কতদিন শরতের গলায় এমন আবদারের সুর তিনি শোনেননি। এমনি অন্ধকার রাত্রে তাঁর স্ত্রী লক্ষ্মীমণি বাপের বাড়ি থেকে ফিরে এসেছিল গরুর গাড়ি করে। শরৎ তখন ছ-মাসের শিশু। কেদার চিরদিনই এক রকম বাইরে বাইরে ফেরেন—বাড়িতে কেদারের আপন বৃদ্ধা জ্যাঠাইমা ছিলেন—তিনি কানে অত্যন্ত কম শুনতেন। লক্ষ্মীমণি ও তার বাপের বাড়ির গাড়োয়ান অনেক ডাকাডাকি করেও বৃদ্ধার ঘুম ভাঙাতে পারেনি। অগত্যা তাঁর ঘরের দাওয়াতেই বসে ছিল কেদারের আগমনের অপেক্ষায়।

রাত এগারোটার সময় কেদার গানবাজনার আড্ডা থেকে বাড়ি ফিরে দেখেন এই কাণ্ড। কেদারের মনে আছে, লক্ষ্মীমণি অন্ধকারের মধ্যে তাঁর কোলে ছ-মাসেরমেয়েকে তুলে দিয়েই কৌতুকে আমোদে খিলখিল করে হেসে উঠেছিল।

—কেমন, বড্ড যে মেয়েকে ঘেন্না করতে।...মেয়ে যেন হয় না, হলে গড়ের পুকুরে ডুবিয়ে মারব !...ইস, মার না দেখি ডুবিয়ে !

সেই নবযৌবনা রূপবতী স্ত্রীর মুখের হাসি আজও মাঝে মাঝে যেন কানে বাজে...তখন পৃথিবী ছিল তরুণ, তিনি ছিলেন তরুণ, লক্ষ্মীমণি ছিল তরুণী। আর একজন এসেছিল তারপর...কিন্তু থাক, তার কথা কেদার এখন ভাববেন না।

সেই মেয়ে শরৎ—সেই ছোট্ট শিশু। কি সুখে তাকে রেখেছেন কেদার ?

শরৎ চা করে এনে দিলে।

—শুধু চা খেয়ো না, দাঁড়াও কি আছে দেখি।

—দুটো বড়ি ভেজে কেন দ্যাও না, সে বেশ লাগে আমার—

শরৎ একটু আচারনিষ্ঠ মেয়ে, ভাতের শক্‌ড়ি কড়াতে সে বড়ি ভেজে এখন চায়ের সঙ্গে দিতে রাজী নয় বাবাকে। বাবা নিতান্ত নাস্তিক, তাঁর না আছে ধর্ম—না আছে কর্ম—বাবার ওসব ম্লেচ্ছাচার শরৎ পছন্দ করে না আদৌ।

—বড়ি আবার এখন কি খাবে, হেঁসেলের জিনিস—দুটি মুড়ি মেখে দিই তার চেয়ে।

কেদার অগত্যা মুড়ির বাটি নিয়ে বসলেন।

না,আজ আর আড্ডায় যাওয়া গেল না। শরৎ তাঁর মনকে বড় অন্যমনস্ক করে দিয়েছে। ভালো রজন নিতে এসেছিলেন তিনি।

—আচ্ছা বাবা, উত্তর দেউলের কথা যে লোকে বলে—তুমি কিছু জানো ?

—বলে, শুনে আসছি এই পর্যন্ত, নিজে কিছু দেখিওনি, কিছু শুনিওনি। তবে বাবার মুখেও শুনেছি, ঠাকুরদাদাও বলতেন—আমাদের বংশেও প্রবাদ চলে আসছে চিরদিন থেকে—

—বলো না বাবা, কি কথা—

—তুমি তো জানো, সবই তো শুনে আসছ আজন্ম। থাক ও কথা এখন এই রাত্তির বেলা। কেন বলো তো মা, উত্তর দেউলের কথা উঠল কেন মনে হঠাৎ ?

—কিছু না, এমনি বলছি—

—আজ পিদিম দিয়ে এসেছ তো ?

—ওমা, তা আবার দেব না ! কবে না দিই ?এমনি মনে হল তাই বলছি—

আজকার সন্ধ্যার ব্যাপারটা বাবার কাছে বলা উচিত কি না শরৎ অনেকবার ভেবেছে। শেষ পর্যন্ত সে ঠিক করে ফেলেছে বাবাকে কিছু বলবে না। বাবা ওই এক ধরনের লোক, বালকের মতো আমোদপ্রিয়, সরল লোক—সংসারের কোনো কিছু গায়ে মাখেন না—মাখা অভ্যেসও নেই। তিনি শুনবেন, শুনে ভয় পাবেন, উদ্বিগ্ন হবেন—কিন্তু কোনো প্রতিকার করতে পারবেন না। দুদিন পরে আবার সব ভুলে যাবেন। তাঁকে বলে কোনো লাভ নেই।

তা ছাড়া একথা প্রকাশ হলেও এসব পাড়াগাঁয়ে অনেক ক্ষতি আছে। কে কি ভাবে নেবে তার ঠিক কি ?এ থেকে কত কথা হয়তো ওঠাবে লোকে। বাবা পেটে কথা রাখতে পারেন না, এখুনি গিয়ে ছিবাস কাকার দোকানে গল্প করবেন এখন। দরকার কি সেসব গোলমালে ?

কেদার অবশেষে একটা গল্প বললেন—মেয়ের আবদার রাখার জন্যেই। এ গল্প এদেশে অনেকে জানে। তার নিজের বংশের ইতিহাসেরই হয়তো—কেদার কিছু খোঁজ রাখেন না। কোনো পাঁজি-পুথিতে কিছু লেখা নেই।

গড়ের বড় দীঘিটার নাম কালো পায়রার দীঘি। এ বাদে আরো দুটো দীঘি আছে ছাতিমবনের ওপারে—একটার নাম রানীদীঘি—একটার নাম চালধোয়া পুকুর। ও দুটো পুকুরেই অনেক পদ্মবন আছে—কালো পায়রার দীঘি অর্থাৎ যেটাতে কেদার প্রায়ই গণেশ মুচির সঙ্গে মাছ ধরে থাকেন— সেটাতে কোনো ফুল নেই পাটা-শ্যাওলার দাম ছাড়া।

বহুকাল আগে—কতকাল আগে কেদারের কোনো ধারণাই নেই—তাঁর কোনো পূর্বপুরুষের সঙ্গে মুসলমান ফৌজদারের দ্বন্দ্ব বাধে। চাকদহের নিকট যশড়া ও হাট জগদলের যে যুদ্ধের প্রবাদ আজও ছড়ার আকারে এই সব গ্রাম-অঞ্চলে প্রচলিত, কেদার শুনেছেন সে ছড়ার মধ্যে উল্লিখিত রাজা দেব রায় ও ভূমিপাল রায় তাঁরই বংশের পূর্বপুরুষ।

হাট জগদলে পানি প্যালাম না

তীর খেয়ে ভিরমি নেগেচে—

দেবরায়ের সেপাই যে ভাই যমদূতের চ্যালা

ভূঁইপালের তীরন্দাজে দেয় বড় ঠ্যালা—

(ও ভাই) হাট জগদলে পানি প্যালাম না।

তীর খেয়ে ভিরমি নেগেচে—

বিপদে পড়ে রাজা দেব রায় গৌড়ে যান দরবার করতে, বাড়িতে বলে গিয়েছিলেন যদি মঙ্গলের সংবাদ থাকে তবে সঙ্গের শ্বেত পারাবত উড়িয়ে দেবেন, কিন্তু যদি অশুভ কিছু ঘটে, তবে কৃষ্ণ পারাবত উড়ে আসবে। সংবাদ শুভ হলেও কার ভুলক্রমে কৃষ্ণ পারাবত উড়িয়ে দেওয়া হয়। মহারানী অন্তঃপুরিকাদের নিয়ে গড়ের মধ্যের বড় দীঘির জলে আত্মবিসর্জন করে বংশের সম্মান রক্ষা করেন।

রাজা জয়ী হয়ে ফিরে এসে যখন দেখলেন তাঁর অসতর্কতার পরিণাম—তিনি আর রাজকর্ম পরিচালনা করেননি, ভাইয়ের হাতে রাজ্যভার তুলে দিয়ে তিনি নাকি উত্তর দেউলে বারাহী দেবীর বেদিমূলে বসে প্রায়োপবেশনে দেহত্যাগ করেন।

এ অঞ্চলে প্রবাদ, উত্তর দেউলে এক বিশালকান্তি পুরুষকে কখনো কখনো নাকি দেখা গিয়েছে—হাতে তাঁর বেত্রদণ্ড, মুখে তর্জনী স্থাপন করে তিনি চিত্রার্পিতের মতো উত্তর দেউলের দ্বারদেশে দাঁড়িয়ে।

কিন্তু এসব শোনা-কথা মাত্র। কেউ এমন কথা বলতে পারে না যে, সে নিজের চোখে কিছু দেখেছে।

অথচ গ্রাম্য লোক ভয় পায়, সন্ধ্যার পর উত্তর দেউলের ওদিকে কেউ বড় একটা যাতায়াত করে না।

কেদারও কিছু জানেন না, অপর পাঁচজনে যা জানে, তিনি তার বেশি কিছু জানেন না, জানবার কোনো চেষ্টাও করেননি। আর কে-ই বা বলবে ?

শরৎ বললে, বাবা, এসব কত দিনের কথা ?

—তা কি করে বলব রে পাগলী ?আমি কি দেখেছি ?

—রানীর নাম কি ছিল বাবা ?

—কি করে বলব মা ?...ইয়ে তা হলে আমি এখন—

—আচ্ছা বাবা, তিনি আমার সম্পর্কে কেউ নিশ্চয় হতেন—আমাদেরই বংশের তো—

কেদার একটু ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন—এখনো যদি ছিবাস মুদির দোকানে গিয়ে পৌঁছুতে পারেন—রাত বেশি হয়নি এখনো।

তিনি অধীর ভাবে বললেন, হ্যাঁ হ্যাঁ, তাই হবেন বৈকি—তোমার ঠাকুরমা-টাকুরমা হতেন আর কি—

শরৎ হেসে বললে, ঠাকুরমা কি বাবা, সে হল কোন্ যুগের কথা—তোমার মা-ই তো আমার ঠাকুরমা হতেন।

কেদারের মন এখন অত কুলজী-নির্ণয়ের দিকে নেই। তিনি তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন— আচ্ছা, তুমি ততক্ষণ রান্নটা নামিয়ে রাখো—আমি আসছি চট্ করে—

—এত রাত্তিরে তোমায় বাবা আর যেতে হবে না। না, থাকো আজ—

—কেন, তোর ভয় করছে নাকি মা ?

—হ্যাঁ তাই। থাকো আজকে—

কেদার একটু আশ্চর্য হলেন, শরৎ কোনোদিন এমন করে বাধা দেয় না। গল্প-টল্প শুনে ভয় পেয়েছে ছেলেমানুষ। থাক, আজ আর তিনি যাবেন না। রজন আনতে বাড়ি এসে যে ভুল তিনি করে ফেলেছেন, তার আর চারা নেই।

শরৎ বললে, বাবা, সেই কলসিটার কথা মনে আছে ?

—হ্যাঁ খুব আছে। কলসিটা কোথায় রে ?

—রাজলক্ষ্মীদের বাড়িতে চেয়ে নিয়েছিল দেখবার জন্যে। সেখানেই আছে।

—নিয়ে এসে রেখে দিয়ো, নিজের জিনিস বাড়িতে রাখাই ভালো।

আজ বছর ছ'সাত আগে একটা মাটির কলসি গড়ের খাতের মধ্যে এক জায়গায় পাওয়া যায়—কলসিটার ওপরে নানারকম ছক কাটা, নকশা আঁকা—কেদারই কলসিটা প্রথমে দেখতে পান, টাকাকড়ি পোঁতা আছে হয়তো পূর্বপুরুষের—প্রথমটা ভেবেছিলেন। কিন্তু শেষে কলসিটা খুঁড়ে বের করে আধ খুঁচিটাক কড়ি পান তার মধ্যে।

গ্রামের হীরা ও সাধন কুমোর দেখে বলেছিল—এ পোড়ের কলসি আজকাল আর হয় না, এমন ধরনের আঁকাজোকা কলসির গায়ে—এসব বাবাঠাকুর অনেক কাল আগের জিনিস। এ পোড়ই আলাদা—খুব ওস্তাদ কুমোর না হলে এমন পোড় হবে না বাবাঠাকুর।

গড়ের খালের খুব নিচের দিকে, যেখানে জল প্রায় মজে এসেছে, সেখানে একদিন মাছ ধরতে বসে কেদার কলসিটা দেখতে পেয়েছিলেন। ওঃ, টাকার কলসি পেয়ে গিয়েছেন বলে কি খুশি কেদারের ! শরতের মা লক্ষ্মীমণি তখনো বেঁচে।

লক্ষ্মী ছুটে এল—কি গা কলসিটাতে ?

এর আগে কেদার বলে গিয়েছিলেন যে একটা কলসির কানা বেরিয়েছে গড়ের খালের পাড়ে। অনেক নিচের দিকে পাড়ের।

কেদার হাসতে হাসতে বললেন, এক হাঁড়ি মোহর—নেবে এসো—

লক্ষ্মীর বয়স তখন পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশের কম নয়, কিন্তু দেখাত পঁচিশ বছরের যুবতীর মতো। গায়ের রঙের জলুস এই দু-বছর আগেও মরণের দিনটি পর্যন্ত ছিল অম্লান। এই মেয়ে হয়েছে ওর মায়ের মতো অবিকল—কিন্তু লক্ষ্মীর মতো অত জলুস নেই গায়ের রঙের—তার কারণ কেদার নিজে তত ফর্সা নন—শ্যামবর্ণ।

লক্ষ্মী এসে হাসিমুখে কড়িগুলো নিয়ে গেল। বললে, জানো না, লক্ষ্মীর কড়ি, পয়মন্ত কড়ি—আমাদের বংশের কেউ হয়তো পুঁতে রেখে থাকবে কতকাল আগে—যত্ন করে তুলে রেখে দিই—

কেদার জিজ্ঞেস করলেন মেয়েকে—ভালো কথা, কলসির সেই কড়িগুলো কোথায় আছে ?

—লক্ষ্মীর হাঁড়ির মধ্যে মা-ই তো রেখে গিয়েছিল, সেখানেই আছে।

কেদারের মনটা আজ হঠাৎ কেমন আর্দ্র হয়ে উঠেছে, আশ্চর্যের ব্যাপার বটে ! তিনি একটু ব্যস্ত হয়ে বললেন, দেখে এসো না মা, আছে তো ঠিক—যাও না—

অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে শরৎ মুখের হাসি গোপন করলে, আহা, হাসিও পায়, দুঃখও হয় বাবার জন্যে। মা মারা যাবার পরে বাবা মায়ের কোনো জিনিস ফেলতে পারেন না, মায়ের ভাঙা চিরুনিখানা পর্যন্ত। তবে সব সময় তো খেয়াল থাকে না, ভোলা মহেশ্বরের মতো বাইরে বাইরে ঘোরেন কিন্তু মাঝে মাঝে হয়তো মনে পড়ে যায়। শরতের বয়স হল পঁচিশ-ছাব্বিশ—সে সব বোঝে।

বাবাকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্যেই বিশেষ করে শরৎ উঠে গেল লক্ষ্মীর হাঁড়ি দেখতে—সে ভালোরকমই জানে—কড়িগুলো আছে ওর মধ্যে। কিন্তু বাবার ছেলেমানুষের মতো স্বভাব, যখন যা ধরবেন তাই।

সে দেখে ফিরে এসে দাঁড়াতে না দাঁড়াতে কেদার জিজ্ঞেস করলেন, রয়েছে দেখলি ?

শরৎ আশ্বাস দেওয়ার সুরে বললে, হ্যাঁ বাবা, রয়েছে।

—আর সেই কলসিটা কালই নিয়ে আয় ওদের বাড়ি থেকে। সেখানে এত দিন ফেলে রাখে ?তোর জিনিসপত্রের যত্ন নেই।

—তুমি ভেব না বাবা, কালই আনব।

আজ বাবার হঠাৎ খেয়াল চেপেছে তাই, নইলে আজ পাঁচ-ছ বছরের মধ্যে কোনো দিনকলসিটার কথা বাবা তো এক দিনও বলেননি ! আজও তো সে-ই আগে তুলেছিল ওকথা, তাই এখন বাবার বড্ড দরদ কলসির ওপর, কড়ির ওপর। কেদার নিশ্চিন্ত হয়ে এক ছিলিম তামাক ধরালেন। কলসির কথা ওঠাতে তাঁর মনে পড়ল, বনে-জঙ্গলে ঘোরেন তিনি এই বিশাল গড়ের হাতার মধ্যে, খালের এপারে বা ওপারে জলের মধ্যে আরো দু-একটা জিনিস দেখেছেন, যার অর্থ তিনি করতে পারেননি।

যেমন একবার, আজ দশ-পনেরো বছর আগে, গড়ের বাইরে যে বড় মজা দীঘির নাম চালধোয়া পুকুর, তার ধারে কি করতে গিয়ে কেদার একটা বাঁধা-ঘাটের চিহ্ন দেখতে পান। কত কাল আগের বাঁধাঘাট কে বলবে ?কয়েকটা মাত্র ধাপ তার অবশিষ্ট আছে—বাকিটা হয়তো মাটির মধ্যে পোঁতা।

একবার তিনি কিছু পুরোনো ইট বিক্রি করেন, গড়ের খালের এপারের একটা বড় পাঁচিলের ইট। বহুকাল থেকে স্তূপাকার হয়ে পড়ে ছিল—তার ওপরে গজিয়েছিল বনগাছের জঙ্গল। ইটের টিবি খুঁড়তে খুঁড়তে যখন সব ইটের স্তূপ শেষ হয়ে গেল—তখন সমতল মাটির আরো হাত-তিনেক নিচে আর কতকগুলো ইটের সন্ধান

পাওয়া গেল। সে জায়গাটা খুঁড়ে দেখা গেল মাটির নিচে একটা মন্দিরের খানিকটা অংশ যেন চাপা পড়ে আছে।

তখন সে ইটগুলোও খুঁড়ে তোলবার জন্যে বন্দোবস্ত করা হল। আরো হাত-দুই খুঁড়ে খুব বড় একটা পাথরের মাথা বেরিয়ে পড়ল। আর খোঁড়া হয়নি—এখন সে-সব আবার বনে ঢেকে গিয়েছে। কেদারের মনে হয়েছিল, ওখানে একটা মন্দির ছিল বহুকাল আগে—কতকাল আগে তাঅবিশ্যি তিনি আন্দাজ করতে পারেননি। অনেকগুলো নকশাকাটা ইট বেরিয়েছিল ওখান থেকে। কিসের মন্দির তাও কেউ জানে না।

ওই বাড়ির চারিপাশে তাঁদের পূর্বপুরুষদের কত দীঘি, দেউল, ঘরবাড়ি, ভেঙেচুরে আত্মগোপন করে আছে আজ কত কাল কত যুগ ধরে, দুর্ভেদ্য বেতবনের আড়ালে, জগডুম্বুর গাছের আঁকাবাঁকা শেকড়ের নিচে; দুশো বছরের সঞ্চিত চামচিকের নাদির মধ্যে থেকে বিরাট শিবলিঙ্গ কোথাও মাথাটি মাত্র জাগিয়ে আছেন—হস্তপদভগ্ন বারাহী দেবীর পাষাণ মূর্তি ছাতিমবনের নিবিড় ছায়ায় অনাদৃত অবস্থায় পড়ে আছে কতকাল।

শরৎ এসব জানে। নিজের চোখেও দেখে আসছে আবাল্য, রাজলক্ষ্মীর ঠাকুরদাদা বৃদ্ধ শ্রীনাথ চাটুজ্যের মুখে সে অনেক কথা শুনেছে, যা তার বাবাও কোনোদিন বলেননি। শ্রীনাথ চাটুজ্যে অনেক খবর রাখতেন।

—ভাত দিই বাবা, রাত হয়ে গিয়েছে অনেক—

—কেমন গল্প শুনলি, হল তো ?

—উত্তর দেউলের কথা ভুলে গিয়েছ দিব্যি।

—ভুলব কেন, ওই যে বললাম—

—দেবীমূর্তির কথা বললে না যে—

—সে-ও তো শোনা কথা। কালাপাহাড় না কে...দেবীর মূর্তি ভেঙেচুরে মন্দির থেকে ফেলে দেয় টান মেরে—
।

—ভাদ্র মাসের অমাবস্যেতে দেবীমূর্তি নাকি—

—কে দেখতে গিয়েছে মা ?চোখে কেউ দেখেছে ?ওসব গুজব। পাষাণের অতবড় মূর্তিটা অমনি জাগ্রত হয়ে ঠেলে উঠে চলতে শুরু করে—হ্যাঁ:—

শরৎ সাহসিকা মেয়ে, তবুও বাবার কথায় যে ছবি তার মনে জাগল—তাতে সে শিউরে উঠল, কারণ সে শুনে এসেছে সে-সময় যে সঞ্চরণশীল জাগ্রত পাষাণ মূর্তির সামনে পড়ে, তার সেদিন বড়ই দুর্দিন।

না, ওসব কথায় তার ভয় হয়; তাড়াতাড়ি সে বাবাকে বললে, থাক থাক বাবা, ওসব কথায়আর দরকার নেই। তোমার কি, রাতদুপুর পর্যন্ত ফেলে রেখে যাবে, মরতে আমিই মরি আর কি।

মশা বিনবিন করছে জঙ্গলের মধ্যে। খালিগায়ে ঘরের মধ্যে বসা কষ্ট। কলাবাদুড় ঝুলছে তালকাঠের আড়া থেকে। বাইরের বাতাসে কি বনফুলের সুগন্ধ।

কেদার আহারে বসে অভ্যাসমতো এ-তরকারি ও-তরকারির দোষ খুঁত বার করতে করতে খেতে লাগলেন। কাঁচকলা রান্না বড় শক্ত কথা, বেগুনের তরকারিতে অত ঝাল দেওয়া সে কোথা থেকে শিখেছে ইত্যাদি। খেয়ে উঠে তামাক সাজতে গিয়ে কেদার দেখলেন তামাক একদম ফুরিয়ে গিয়েছে। মেয়ে আজকাল অত্যন্ত অমনোযোগী, কাজকর্মে আর আগের মতো মন নেই—যদি থাকত তবে তামাক ফুরিয়ে যাওয়ার একদিন আগে লক্ষ করেনি কেন ?এখন তিনি তামাক কোথায় পান এত রাত্রে ?

শরৎ বললে, আচ্ছা বাবা, তোমার তামাক খেতে পেলেই তো হল ! কলকেটা দাও—

—কোথায় পাবি তামাক ?

—তোমার সে খোঁজে দরকার কি ?দেখি কলকেটা—

অসময়ের জন্যে সে প্রতিদিনের তামাক থেকে একটু একটু নিয়ে একটা ঘুলঘুলির মধ্যে লুকিয়ে রাখে। বাবার কাণ্ড তার জানতে বাকি নেই, এই রকম রাতদুপুরে তামাক ফুরিয়ে যাবে হঠাৎ। বকুনি খেতে হবে সে সময় তাকেই। বকুনির চেয়েও তার দুঃখ হয় যখন বাবার কোনো জিনিসের অভাব ঘটে—কোনো কিছুর জন্যে তিনি কষ্ট পান।

শরৎ তামাক সেজে এনে দিলে। কেদার তামাক পেয়েই সন্তুষ্ট, মেয়েকে আর বিশেষ জেরা করলেন না এ নিয়ে। রাত অনেক হয়েছে—আর এখন শয্যা আশ্রয় করলেই তিনি বাঁচেন। শরৎ সারাদিন খাটে, রাত্রে বিছানায় একবার শুয়ে পড়লে তার জ্ঞান থাকে না। আর এক ছিলিম তামাক চেয়ে রাখলে হত ওর কাছ থেকে, কিন্তু কেদার ভরসা পেলেন না।

গভীর রাত্রে ঘুমের ঘোরে শরতের মনে হয়, আর সে ভাঙাচোরা গড় নেই, কি সুন্দর রাজবাড়ি, পদ্মদীঘিতে শ্বেতপদ্ম ফুটে জল আলো করেছে—দেউড়িতে দেউড়িতে পাহারা পড়েছে, ছাদে লাল সাদা নিশান উড়ছে—গড়ের এপারে ওপারে কত বাড়ি, কত অতিথিশালা, কত হাতি-ঘোড়ার আস্তাবল...উত্তর দেউলে প্রকাণ্ড বারাহী মূর্তির পুজো হচ্ছে, ধূপ-ধুনো-গুগ্‌গুলের সুবাসে চারিদিক আমোদ করছে, কাড়া-নাকাড়ার বাদ্যিতে কান পাতা যায় না।

যেন এক রানী এসে তার শিয়রে দাঁড়িয়েছেন, ওঁর সুন্দর মুখে প্রসন্ন হাসি, কপালে চওড়া করে সিঁদুর পরা, রূপের দীপ্তিতে ঘর আলো হয়ে উঠেছে...তিনি সস্নেহ সুরে যেন বলছেন—খুকি, আমার বংশের মেয়ে তুই, বংশের মান বাঁচাবার জন্যে আমি দীঘির জলে ডুবে মরেছিলাম, তুইও বংশের মর্যাদা বজায় রাখিস্‌, পবিত্র রাখিস নিজেকে।

ঘুমের মধ্যেও শরতের সর্বাঙ্গ যেন শিউরে ওঠে।

কেদার পাশের গ্রাম থেকে খাজনা আদায় করে ফিরছেন, এমন সময় ছিবাস মুদি রাস্তায় তাঁকে ডাকলে—চলুন আমার দোকানে দাদাঠাকুর, একটু তামাক খেয়ে যাবেন—

রাস্তার ধুলোতে কিসের দাগ দেখে কেদার বললে, এ কিসের দাগ হে ছিবাস ?

—এ মটোর গাড়ির চাকার দাগ—প্রভাস বাড়ি এসেছে যে মটোরে চড়ে—

—বেশ, বেশ। তা গাড়ি তো দেখতে হয় ছিবাস—

—কখনো দেখেননি বুঝি দাদাঠাকুর ?আমি সেবার যোগে গঙ্গাচানে গিয়ে নবদ্বীপে দেখে এইচি—

—দুর, মটোর গাড়ি দেখব না কেন, সেদিনও তো কেষ্টনগরে সদর খাজনা দাখিল করতে গিয়ে চার-পাঁচখানা দেখে এলাম। বড়লোকেরা কেনে, কেষ্টনগরে বড়লোকের অভাব আছে নাকি ?তবে আমাদের গাঁয়ে মটোর গাড়ি নতুন কথা কিনা—

—তা হবে না কেন দাদাঠাকুর ! আজকাল প্রভাসের বাবার অবস্থা কি ?কলকাতায় দুখানা বাড়ি, কারবার চলছে তোড়ে—রমারম টাকা আসছে। বলে লক্ষ্মী যখন যারে দ্যান, ছপ্পড় ফুঁড়ে টাকা আসে—ওদেরই তো এখন দিন—এ কি আর আপনি আমি ?

—তা ভালোই তো। গাঁয়ে সবাই গরিব, দু-একজন যদি বড় হয়, অন্তত গাঁয়ের রাস্তাঘাটগুলো তো ভালো হবে। দুদিন মটোরে করে এলেই তখন রাস্তার দিকে নজর পড়বে—

—হ্যাঁ, দুদিন মটোরে এসেই তোমার গাঁয়ের রাস্তা অমনি পাথর দিয়ে বাঁধিয়ে গ্যাংট্যাং রোড ধরে ফেলছে ! তুমিও যেমন পাগল দাদাঠাকুর ! ছাড়ান দ্যাও ওসব কথা।

প্রভাস যে মোটরখানা এনেছে, সাতকড়ি চৌধুরীদের চণ্ডীমণ্ডপের সামনে সেখানা কাঁঠালতলার ছায়ায় দাঁড় করানো। চৌধুরীদের চণ্ডীমণ্ডপে আট-দশজন লোকের ভিড়।

কেদার সামনের রাস্তায় কালো চকচকে গাড়িখানার পাশে দাঁড়িয়ে ভালো করে জিনিসটা দেখতে লাগলেন। কেমন একটা গরম গন্ধ, কিসের গন্ধ কেদার ঠিক বুঝতে পারেন না। ঝকঝক করছে পেতলের বা কিসের ডান্ডা, হ্যান্ডেল—আর কি সব যন্ত্রপাতি।

বেশ জিনিস।

এত কাছে দাঁড়িয়ে কেদার কখনো মোটর গাড়ি দেখেননি। রাস্তায় যেতে যেতে গাড়িখানার ওধারে আরো দু-একজন পথচলতি চাষাভুষো লোক দাঁড়িয়ে গেল গাড়ি দেখতে।

কেদার তাদের দিকে চেয়ে হাসিমুখে বললেন, কালে কালে কত কাণ্ডই দেখা গেল— আঁ—কি বললা মোড়লের পো ?তাই না কি, বলো ঠিক করে। দশ বছর আগে দেখেছিলে কেউ ?

একজন চাষিলোক স্টিয়ারিংয়ের চাকা আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বললে, এখানডাতে চাকা একটা আবার কেন, হ্যাদে ও দা'ঠাউর ?

কেদার বিজ্ঞভাবে বললেন, ও হল হ্যান্ডেলের চাকা। ওটা ঘোরায়।

লোকটির নিকট সব ব্যাপারটা এক মুহূর্তে পরিষ্কার হয়ে গেল। সে হাসিমুখে বললে, দেখুন দিখি দা'ঠাউর, বললেন আপনি, তবে আমি বোঝলাম। না বলে দিলে কি আমরা বুঝতে পারি ?

সে কি বুঝলে তা অবিশ্যি সে-ই জানে।

এই সময় কেদারকে দেখতে পেয়ে কে চণ্ডীমণ্ডপ থেকে ডেকে উঠল—ও কেদার রাজা, ওহে ও কেদার রাজা—শোন শোন, এদিকে এস না একবার—

প্রভাসকে ঘিরে গ্রামের অনেকগুলি ভদ্রলোক বসে। জগন্নাথ চাটুজ্যেও আছে ওদের মধ্যে, কেদারকে ডাক দিয়েছে সে-ই।

চণ্ডীমণ্ডপের মালিক সাতকড়ি চৌধুরী বললেন, কেদার-দা যে ! আরে এস এস—বসতে দাও হে—কেদার-দা'কে বসাও—

জগন্নাথ বললে, আরে ভায়া কেদার রাজা, এসে পড়েছ ঠিক সময়ে—তোমার কথাই হচ্ছিল।

কেদার বিস্ময়ের সুরে বললেন—আমার কথা !

তাঁর কথা কোথাও মজলিশে আলোচিত হবার মতো গুণ তাঁর কি আছে ?কেদার ভেবে পেলেন না। কখনো আলোচিত হয়ওনি।

জগন্নাথ বললে, তোমার কথা কেন, সকলেরই কথা। প্রভাস, চিনতে পেরেছ কেদার ভায়াকে ?রাজবাড়ির কেদার-রাজা। এ হল প্রভাস—আমাদের গাঁয়ের রাসু বিশ্বেসের নাতি—

কেদার বললেন, হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি জানি। তবে সেই ছেলেবেলায় হয়তো দু-একবার দেখে থাকব, বাবাজি তো আসে না গাঁয়ে বড় একটা—কাজেই এদানীং দেখিনি আর।

প্রভাসের বয়স ত্রিশ-বত্রিশ, মাথায় কোঁকড়া চুলে টেরি কাটা, গায়ে সাদা আদ্দির পাঞ্জাবি, জরিপাড় ধুতি পরনে। সকলেই জানে প্রভাস চরিত্রহীন ও বওয়াটে, কিন্তু বড়লোকের ছেলের কাছে স্বার্থ অনেকের অনেক রকম, মুখে কিছু বলতে সাহস করে না।

সাতকড়ি চৌধুরী বললেন—প্রভাসকে আমরা ধরেছি, আমাদের পুবপাড়ার ইস্কুলটার সম্বন্ধে কিছু বিবেচনা করুক। ওদের হাত ঝাড়লে পব্বোত।

কেদার এক পাশে গিয়ে বসলেন। ব্যাপারটা কিছুক্ষণ পরে বুঝলেন, এ গ্রামের প্রাইমারি ইস্কুলের বাড়িটা পাকা করে দেবার জন্যে সবাই প্রভাসকে ধরেছে, শ-চার পাঁচ টাকা ব্যয় করলে আপাতত বাড়িটা এক রকম দাঁড়িয়ে যায়।

প্রভাস বলছিল—তা যখন আপনারা বলছেন, তখন দিয়ে দেব, তবে টাকা আপাতত এখন আনিনি, আপনারা যদি কেউ আমার সঙ্গে কলকাতায় গিয়ে—

—আহা সে-জন্যে ভাবনা কি ?তুমি যখন হয় পাঠিয়ে দিয়ো। তুমি বললেই আমরা কাজ আরম্ভ করে দিই। তোমার ভরসা পেলে আমরা করতে পারিনে এমন কি কাজ আছে ?কি বলো হে জগন্নাথ খুড়ো ?

জগন্নাথ চাটুজ্যে সাতকড়ির কথায় কোনো উত্তর না দিয়ে কেদারের দিকে চেয়ে বললেন, তোমার কথা কি হচ্ছিল বলি, ইস্কুলটার জন্যে তোমার গড়বাড়ির পুরোনো ইট কিছু দিতে হবে।

কেদার দ্বিরুক্তি না করে বললেন—নিয়ো।

—ঠিক তো ?

—নিশ্চয়।

—তা হলে সব কথা তো মিটে গেল হে সাতু, কেদার রাজার ইট আর প্রভাসের টাকা, ইস্কুল বাড়ি তো পাকা হয়ে রয়েছে। এক ছিলিম তামাক খাও—বসো কেদার রাজা।

প্রভাস উঠতে চাইলে—কিন্তু সাতকড়ি চৌধুরী বাধা দিলেন। চা হচ্ছে বাড়ির মধ্যে তার জন্যে, না খেয়ে যাবার জো নেই।

কেদারের একটু চা খাবার ইচ্ছে ছিল না এমন নয়, সুতরাং তিনিও চেপে বসলেন। জগন্নাথ চাটুজ্যে তাঁর সঙ্গে তার নিজের সংসারের ঝাঞ্ঝাটের গল্প শুরু করলে। মেজ ছেলেটার জ্বর হচ্ছে আজ এক মাস, রোজ বিকেলে জ্বর আসে, কত রকম কি করলেন, কিছুতেই জ্বর যাচ্ছে না। ও-পাড়ার যতীশ চক্কত্তির সঙ্গে জমি নিয়ে বিবাদ চলেছে গেঁয়োহাটিতে। জগন্নাথ বলে জমি আমার, যতীশ বলে আমার। প্রজারা ফলে খাজনা বন্ধ করেছে দু-পক্ষের কাউকেই খাজনা দেয় না।

কেদার বললেন, কেন, জমির পড়চা দেখলেই তো মিটে যায়—কার জমি লেখাই তো আছে—

—আরে তা কি আর দেখা হয়নি ভাবছ কেদার রাজা ?পড়চা-দৃষ্টে জমি সনাক্ত করতে হবে না !

—পড়চা দেখে যদি জমি সনাক্ত করতে না পারে, তা হলে আমীন ডেকে মীমাংসা করে নাও। সেটেলমেন্টের ম্যাপ আছে, তাই দেখে আগে মেপে নেবার চেষ্টা কর না কেন ?

—তুমি একদিন এসো না ভায়া। তুমি ম্যাপ দেখে একটা মীমাংসা দাও না করে ?জমিজমার কাজ তুমি তো খুব ভালো বোঝ।

—কেদার-দা সত্যিই ভালো জানে জমিজমা-সংক্রান্ত কাজ—কিন্তু মন এদিকে দিতে চায় না একেবারেই। নিজের অনেক জমি ভিন্ন ভিন্ন গ্রামে বেহাতি হয়ে গেল, দেখেও দেখে না, ওই হয়েছে ওর দোষ।

একথা বললেন সাতকড়ি চৌধুরী। অনেক দিন আগে তাঁর নিজের জমিজমার দলিলসংক্রান্ত কি একটা জটিল ব্যাপারের ভালো মীমাংসা করে দেন কেদার, সেই থেকে কেদারের বৈষয়িক কাজকর্মের প্রতি সাতকড়ি চৌধুরীর যথেষ্ট শ্রদ্ধা।

এই সময়ে চা এল। এখানে আর কেউ চা খায় না বলে বোধ হয় চা এসেছে শুধু প্রভাসের জন্যেই। শুধু চা নয়, খানকতক গরম পরোটা আর একটু আলু-চচ্চড়িও এসেছে। সকলেই নানা অনুযোগ অনুরোধ করে প্রভাসকে খাওয়াতে লাগল। কেদার চা খাবেন কি না এ কথা কেউ জিজ্ঞেস করলে না, সুতরাং চা-পানের ইচ্ছা আপাতত কেদারকে দমন করতে হল।

প্রভাস চা-পান শেষ করে উঠে পড়ল। সকলে গিয়ে তাকে তার মোটরে উঠিয়ে দিলে।

সাতকড়ি বললেন, এখন যাবে কোথায় প্রভাস ?

—এখন একবার রানীনগর যাব কাকা, হারাণ কাপালীর কাছে একখানা তিনশো টাকার হ্যান্ডনোট আছে, তামাদির মুখে দাঁড়িয়েছে, বাবা বলে দিয়েছেন একবার গিয়ে তাগাদা দিতে।

—ওবেলা একবার এসো। গড়ের ইট কেদার-দা দিতে চেয়েছেন, তোমায় দেখিয়ে আনব। কি বলো জগন্নাথ খুড়ো ?তুমি টাকা দেবে, ইটগুলো তুমি দেখে নাও। এই, সব সরে যা গাড়ির কাছ থেকে, তোদের এত ভিড় কেন ?

প্রভাসের গাড়ির চারিধারে বহু ছেলেমেয়ে এসে জড়ো হয়েছিল। সকলকে সরিয়ে সাবধান করে দু-চারবার হর্ন দিয়ে প্রভাস গাড়ি ছেড়ে দিলে।...

জগন্নাথ চাটুজ্যে পথের বাঁকে দ্রুতবিলীয়মান গাড়িখানার দিকে চেয়ে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন—সব টাকা রে বাপু টাকা। ওর ঠাকুর-দা এই গাঁয়ের পুবপাড়ার কামারের দোকান করত, হেঁই-ও হেঁই-ও করে হাতুড়ি পেটাত, আমরা ছেলেবেলায় দেখেছি। সাতু বাবাজি, রাসু বিশ্বেসকে মনে আছে নিশ্চয়ই।

সাতকড়ি চৌধুরীর বয়স আসলে চল্লিশের বেশি নয়। তার চেয়ে অন্তত পঁচিশ বছর বেশি বয়সের লোক জগন্নাথ চাটুজ্যে তাঁকে নিজের দলে টানবার চেষ্টা করছে দেখে তিনি ক্ষুণ্ণমুখে বললেন—আমার কি করে মনে থাকবে জগন্নাথ খুড়ো, আমি দেখিইনি.....

কেদার বললেন, তোমার যে কাণ্ড জগন্নাথ-দাদা। ও দেখবে কোথা থেকে ?আমারই ভালো মনে হয় না।

জগন্নাথ বললেন—তা সে যাই হোক, মোটের ওপর পয়সা করেছে বটে। ব্যবসা না করলে কি আর বড়লোক হওয়া যায় ?ওই রাসু কামারের ছেলে—আমরা রাসু কামার বলেই জানতাম ছেলেবেলায়—সেই রাসুর ছেলে হারাণ কলকাতায় গিয়ে ঘোড়ার গাড়ি সারানোর ছোট্ট দোকান খুললে বউবাজারে। ক্রমে দোকানের উন্নতি হতে লাগল—মাথা খুলে গেল, তখন পুরোনো গাড়ি কিনে তাই সারিয়ে বেচতে লাগল। তার পর দ্যাখো আজকাল ওদের অবস্থা। কলকাতায় চারখানাবাড়ি।

সাতকড়ি চৌধুরী বললেন, আজকাল প্রভাসই কর্তা। ও-ই বলছিল ওর বাবা বাতে পঙ্গু, উঠে হেঁটে বেড়াতে পারে না। প্রভাসই দেখাশুনো করে।

একজন কে বললে—তবে প্রভাস নাকি বাপের পয়সা বিস্তর উড়িয়েছে।

জগন্নাথ চাটুজ্যে বললেন—তা ওড়াবে না কেন ?হারাণ বিশ্বেস কম টাকা করেনি তো ?ছেলে যদি না ওড়াবে তবে ওড়াবে কে বলো না ?ঘোর বওয়াটে আর মাতাল—

সাতকড়ি চারিদিকে চেয়ে বললেন, থাক থাক, ওকথা থাক খুড়ো। সে-সব কথায় দরকার কি তোমার আমার ?যার ছাগল তার লেজের দিকে সে কাটুক না—বাদ দাও। ওরা হল আজকাল বড়লোক, এদিগরে সাত-আটখানা গাঁয়ের মহাজন হল ওরা। ওদেরই খাতির। টাকার দরকার হলে হারাণ বিশ্বেসের কাছে—কলকাতায় গিয়ে হ্যান্ডনোট লিখে কর্জ না করলে যখন উপায় নেই, তখন তার ছেলে কি করে না করে সে-সব কথার আলোচনা রাস্তায় দাঁড়িয়ে না করাই ভালো।

বেলা বেড়েছে। কেদার বাড়ির দিকে রওনা হলেন। পথে প্রভাসের গাড়ির সঙ্গে আবার দেখা—বেজায় ধুলো উড়িয়ে আসছে, কেদার এক পাশে দাঁড়ালেন। ধুলোর পাহাড় সৃষ্টি করে হর্ন বাজিয়ে মোটরখানা সবেগে পাশ কাটিয়ে চলে গেল, পেট্রল ও গ্যাসের গন্ধ ছড়িয়ে। কেদার ধুলোর মধ্যে চোখ মিট মিট করতে করতে প্রশংসমান দৃষ্টিতে সেদিকে চেয়ে রইলেন।

সকালে উঠেই সেদিন কেদার খাজনা আদায় করতে যাবার জন্যে তৈরি হচ্ছেন, এমন সময় জগন্নাথ চাটুজ্যে এসে ডাকলেন, ওহে কেদার রাজা, বাড়ি আছ নাকি ভায়া ?

কেদার বললেন, এসো জগন্নাথ দাদা, এসো। কি মনে করে ?

—ওরা সব আসছে, ইট কোথা থেকে নেবে দেখিয়ে দেবে চলো।

কেদার বললে, ও আর দেখিয়ে দেওয়া কি, তুমি তো জানো—যেখান থেকে হোক—

জগন্নাথ জিভ কেটে বললে, তা কি হয় ভায়া ?তোমার জিনিস না বলে দিলে কি আমরা নিতে পারি ?চলো তুমি। প্রভাস নিজে আসবে এখুনি—আরো সব আসছে।

—ততক্ষণ বসবে এসো দাদা। ওরে শরৎ, তোর জ্যাঠামশায়ের জন্যে বসবার কিছু দে।

শরৎ একখানা পিঁড়ি পেতে দিয়ে বললে, জ্যাঠামশায় তো এদিকে আসা ছেড়েই দিয়েছেন আজকাল। বসুন ভালো হয়ে। চা খাবেন ?

জগন্নাথ চাটুজ্যে একগাল হেসে বললে, তা মা, দে না হয় করে।

নিজের বাড়িতে জগন্নাথের চা খাওয়ার পাট নেই কোনো কালে, তবে পরের বাড়িতে হলে কোনো কিছু খাওয়াতেই আপত্তি নেই জগন্নাথের।

কেদার বললেন, তারপর, তোমাদের ইস্কুলের বাড়ি আরম্ভ হবে কবে ?

—জিনিসপত্র জোগাড় হলেই হবে। প্রভাস টাকা দিলেই আমরা কাজ আরম্ভ করে দিই।একটু তামাক সাজো ভালো করে ভায়া। চা-টা তোমার এখানেই খাওয়া যাক।

কিছুক্ষণ পরে শরৎ এসে দু-পেয়ালা চা সামনে রাখল। সে সকালেই স্নান সেরে নিয়েছে, পরনে সরুপাড় ফর্সা ধুতি, একরাশ ভিজে এলো চুল পিঠে ফেলা—গায়ের রং ফুটেছে স্নান করে—লম্বা পাতলা দেহ, সুন্দর ভুরু, বড় বড় চোখ—প্রতিমার মতো সুশ্রী।

চা নামিয়ে বললে, জ্যাঠামশায়, বসুন, একটা জিনিস খাওয়াব। খাবেন তো ?

—কি মা ?

—সে এখন বলছি নে। আনি আগে, তখন দেখবেন।

শরৎ একটা পাথরের খোড়া ভর্তি বাসি পায়েস এনে জগন্নাথের সামনে রাখলে। হাসিমুখে বললে, খান। বাবা বড় ভালোবাসেন বলে কাল রাত্রে করেছিলুম—তা আজ সকালে অনেকখানি রয়েছে দেখলাম। বাবা চেয়েছিলেন খেতে কিন্তু ওঁকে এখন আর দেব না, দুপুরে ভাতের সঙ্গে দেব বলে রাখলাম খানিকটা।

এমন সময় গ্রামের আরো অনেকের সঙ্গে প্রভাসকে দূরে আসতে দেখে কেদার বললেন, ও শরৎ, আরো সবাই আসছে। চা আর হবে নাকি ?

শরৎ বললে, ক’ পেয়ালা ?

—চার-পাঁচ পেয়ালার মতো হোক না হয়।

—তা হবে না, দুধ নেই। কাল রাত্রে একটু দুধ রেখেছিলাম, তাই দিয়ে তোমাদের করে দিলাম। এক পেয়ালার মতো একটুখানি পড়ে আছে।

—তবে প্রভাসের জন্যে শুধু এক পেয়ালা করে দে। ও গাঁয়ে কখনো আসে না, ওকে দেওয়া উচিত আগে। আর সব তো ঘরের লোক।

ওরা কিন্তু কেউই বাড়ির কাছে এল না। অতিথিশালার কাছে এসে সাতকড়ি চৌধুরী ডাক দিয়ে বললেন,—ও কেদার দাদা, এসো এদিকে, প্রভাস এসেছেন—আর কে বসে ওখানে—জগন্নাথ খুড়ো ?

কেদার বললেন, তুমি বসে পায়েস খাও দাদা, আমি যাই দেখি।

সাতকড়ি বললেন, কোথা থেকে ইট দেবে হে ?চলো নিয়ে।

—চলো, কালো পায়রার দীঘির পাড়ে জঙ্গলে অনেক ইট আছে। দুটো মন্দিরের ভাঙা ইটের রাশি। তাই নিয়ো—কি বলো ?

প্রভাস চারিদিকে চেয়ে চেয়ে দেখছিল বিস্ময়ের দৃষ্টিতে। সে এ-গ্রামে ইতিপূর্বে কয়েকবার এলেও কেদারের বাড়ি কখনো আসেনি বা গড়ের মধ্যেও কখনো ঢোকেনি। এত বড় বড় ভাঙা ঘরদোর ও মন্দির যে এখানে আছে সে তা জানত না। আগে জানলে সে ক্যামেরাটা নিয়ে আসত কলকাতা থেকে।

কেদার তাকে বললেন, চলো প্রভাস, ওখানে জগন্নাথদা বসে আছেন, তুমিও একটু চা খাবে এসো। এসো সতু ভায়া, তুমিও এসো।

উপস্থিত ব্যক্তিগণের মধ্যে চা-পান করতে অভ্যস্ত নয় কেউই, সাতকড়িও না। সুতরাং প্রভাস ছাড়া আর কেউ চা খেতে গেল না।

সাতকড়ি বললেন, ঘুরে এসো প্রভাস, দেরি না হয়—আমরা এখানেই আছি।

প্রভাসকে ঘরের দাওয়ায় পিঁড়ি পেতে বসিয়ে কেদার মেয়েকে চা দিতে বললেন। শরৎ এসে চা দিয়ে যাবে, কিন্তু অপরিচিত প্রভাসের সামনে হঠাৎ আসতে সঙ্কোচ বোধ করে পেয়ালা হাতে দোরের কাছে দাঁড়িয়ে আছে দেখে কেদার বললেন, ওকে দেখে লজ্জা করতে হবে না, বুঝলি মা ! ও আমাদের গাঁয়ের ছেলে—এখনই না হয় থাকে কলকাতায়। ও পর নয়। দিয়ে যাও চা।

শরৎ এসে প্রভাসের সামনে চা রাখলে। প্রভাস শরৎকে কখনো দেখেনি বলা বাহুল্য—চা দেবার সময় সে মৃদু কৌতূহলের সঙ্গে প্রথমটা একবার শরতের দিকে চাইলে...কিন্তু শরৎকে দেখবার পরক্ষণেই প্রভাসের চোখমুখ যেন অপ্রত্যাশিত বিস্ময়ে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। মুখের চেহারাযে বদলে গেল অতি অল্পক্ষণের জন্যে, এ যে-কেউ দেখলেই বলতে পারত।

প্রভাস আশা করেনি এত সুন্দরী মেয়েকে আজ সকালে এই ভাঙা-ইটের-স্তূপে-ঘেরা জঙ্গলাবৃত ক্ষুদ্র বাড়িতে এ ভাবে দেখতে পাবে। এত রূপ আছে, এই সব পাড়াগাঁয়ে !

প্রভাস থতমত খেয়ে চায়ের পেয়ালাটা হাতে তুলে নিলে।

কেদার বললেন, তোমাদের কলকাতায় কোথায় থাকা হয় বাবাজি ?

প্রভাস অন্যমনস্ক হয়ে কি যেন ভাবছিল, কেদারের প্রশ্নে যেন চমকে উঠে বললে, আমায় বলছেন ?আপার সারকুলার রোড—

—তোমার বাবার শরীর কেমন ?

—আছে ভালো, তবে উঠতে হাঁটতে পারেন না। বয়েস তো হল কম নয়। সাহেব ডাক্তার দেখছে—তবে এ বয়েসের রোগ—

—তোমার একটি ছোট ভাই আছে শুনছিলাম, সে কি করে ?

—সে-ও দোকানে বেরোয়। খুব ছোট নয়, তার বয়েস এই সাতাশ বছর হল।

জগন্নাথ চাটুজ্যে বললে, বাবাজি বিয়ে করেছ কোথায় ?

—কই, আমি বিয়ে তো করিনি এখনো।

কেদার জানতেন না যে প্রভাস অবিবাহিত। প্রভাসের সম্বন্ধে এ কথা তিনি কারো মুখে শোনেননি।

তিনি বিস্ময়ের সুরে বললনে, বিয়ে করোনি ! তা তো জানতাম না।

জগন্নাথ চাটুজ্যে বললেন, আমিও জানতাম না। বাবাজির বয়েস অবিশ্যি এখনো—বয়েসটা কত হল বাবাজি ?

—আজ্ঞে একত্রিশ যাচ্ছে।

—ওঃ, একত্রিশ ! যথেষ্ট সময় আছে। তোমাদের এখনো যথেষ্ট—

—সে জন্যে নয় কাকাবাবু, বিয়ে আমার করবার ইচ্ছে নেই।

—বলো কি বাবাজি ! তোমাদের রাজার মতো সম্পত্তি, বাড়িঘর, বিয়ে করবে না কি রকম ?

প্রভাস হাসি-হাসি মুখে চুপ করে রইল।

জগন্নাথ চাটুজ্যে বললে, রাসু-দাদা কিছু বলেন না এ নিয়ে ?

—অনেক বড় বড় সম্বন্ধ এনেছেন। হুগলী বালিতে একবার পঁচিশ হাজার টাকা দেবে আর হীরে জহরতের জড়োয়া—বাবা কিছুতেই ছাড়বেন না। বাবাকে বললাম, অমন সম্বন্ধ এর পরে জোটবার অভাব হবে না, যদি আমি বিয়েই করি। বাবা তাদের জানিয়ে দিলেন, কিন্তু তবুও তারা পীড়াপীড়ি করতে লাগল এমন যে আমি ওয়ালটেয়ার পালিয়ে গেলাম—সেখানে আমাদের বাড়ি আছে কিনা ! বছর পাঁচ-ছয় হল বাবা হাইকোর্টের সেলে কিনেছিলেন।

কেদার বললেন, কি জায়গাটা বললে বাবাজি—কোথায় সেটা ?

—ওয়ালটেয়ার। সমুদ্রের ধারে।

সমুদ্র কোন্ দিকে কত দূরে, কেদারের সে সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণার অভাব ছিল, কিন্তু জগন্নাথ চাটুজ্যের জামাই রেলে কাজ করে, সে গত পুজোর সময় সস্ত্রীক পাশ নিয়ে পুরী গিয়েছিল। জগন্নাথ চাটুজ্যের জানা আছে মাত্র এইটুকু যে, পুরী নামক প্রসিদ্ধ তীর্থস্থানটি সমুদ্রের ধারে—সে সমুদ্র যত দূরেই হোক বা যে দিকেই হোক। সুতরাং সে জিজ্ঞেস করলে পুরীর কাছে বাবাজি ?

—না, পুরী থেকে অনেক নিচে।

বলা বাহুল্য, পুরীর নিচে বা ওপরে কি ভাবে আর একটা জায়গা থাকতে পারে এ কথা জগন্নাথ বা কেদার কারো কাছেই তেমন পরিস্ফুট হল না। সে দিক থেকে বরং সমস্যা জটিলতর হয়ে দাঁড়াত এদের কাছে, কিন্তু শরৎ দোরের কাছে দাঁড়িয়ে ওদের কথাবার্তা শুনছিল, সে তার বাবার মুখের দিকে চেয়ে বললে—পুরীর আরো দক্ষিণে হল তা হলে—না বাবা ?

কেদার বিপন্নমুখে বললেন, হাঁ—দক্ষিণে !—তাই—ইয়ে দক্ষিণেই তো তা হলে গিয়ে—

প্রভাস হঠাৎ শরতের মুখের দিকে একটু বিস্ময়মিশ্রিত প্রশংসার দৃষ্টিতে চেয়েই তখনই আবার চোখ ফিরিয়ে নিয়ে জগন্নাথের দিকে চেয়ে বললে, ঠিক বলেছেন উনি। দক্ষিণেই হল।

এবার সকলে পুকুরের পাড়ের জঙ্গলের মধ্যে ঢুকল ইট দেখবার জন্যে। ছাতিম-বনের তলায় এদিক ওদিক ছড়ানো ভাঙা ঘরবাড়ি ও প্রাচীন দেউলগুলির ধ্বংসস্তূপ সকলকেই বিস্ময়াবিষ্ট করে তুলল। বেতের দুর্ভেদ্য ঝোপের আড়ালে কতদূর পর্যন্ত ছড়ানো বড় বড় ইটের স্তূপ, পাথরের কড়ি, পাথরের চৌকাঠ, নকশা করা প্রাচীন ইট, ভাঙা থামের মাথা, সকলেরই মনে বর্তমানের বহুদূর পিছনকার এক লুপ্ত বিস্মৃত অতীতের

রহস্যময় বার্তা ক্ষণকালের জন্যে বহন করে নিয়ে এল—যাতে জগন্নাথ চাটুজ্যের মতো কল্পনাশূন্য নিরেট ব্যক্তিকেও বলতে শোনা গেল—বাস্তবিক। এসব দেখলে মন কেমন করে—কি বলো সতু বাবাজি ?

সাতকড়ি ঘাড় নেড়ে সায় দিয়ে বললেন, তা আর করে না ?

কিন্তু সকলের চেয়ে বিস্ময়ান্বিত হয়েছে প্রভাস—তা তার মুখ দেখেই বেশ বোঝা গেল।

প্রভাস এসব কোনোদিন দেখেনি—বা তাদের গ্রামে যে এরকম আছে তা শুনলেও সেটা যে এই ধরনের ব্যাপার তা জানত না।

সে বিস্ময়ের সুরে বললে, ওঃ, এ তো অনেক কাল আগেকার ! এ সব কীর্তি ছিল কাদের ?

সাতকড়ি বললেন, এই আমার কেদার দাদার পূর্বপুরুষের—আবার কার ?এঁরাই গড়শিবপুরের রাজবংশ। কেন, তুমি জানতে না বাবাজি ?যাক দেখে নাও দিকি, ক'গাড়ি ইট হবে বা কোন্ দিক থেকে খুঁড়বে ?

প্রভাস চুপ করে রইল। জগন্নাথ চাটুজ্যে বললে, যেখান থেকে হয় হাজার দশেক ইট আপাতত নাও না। কেদার ভায়ার কোনো আপত্তি নেই তো ?

কেদার নির্বিকার মানুষ—কোনো প্রকার ভাব বা অনুভূতির বালাই নেই তাঁর। তিনি বললেন, আমার আপত্তি কি ?ইট তো পড়েই রয়েছে !

সাতকড়ি বললেন, কিন্তু এ ইটের দাম কিছু দিতে পারব না কেদার দাদা, তা আগে থেকেই বলে রাখছি।

কেদার ক্ষুদ্র মনের পরিচয় কোনোদিন দেননি—তিনি দিলদরিয়া মেজাজের মানুষ সবাই জানে। বললেন, কিছু বলবার দরকার নেই সেসব। নিয়ে যাও না ভায়া—আমি কি তোমায় বলেছি দামদস্তুরের কথা ?

ইতিপূর্বেও কেদারের অবৈষয়িকতা ও ঔদর্যের সুযোগ নিয়ে পার্শ্ববর্তী গ্রামের বহু লোক গড়ের ধ্বংসস্তূপ থেকে বিনামূল্যে গাড়ি গাড়ি ইট নিয়ে গিয়েছে ঘরবাড়ি তৈরি বা মেরামতের জন্যে—অর্থকষ্ট যথেষ্ট থাকা সত্ত্বেও কেদার কারো কাছে মূল্য চাইতে পারেননি বা কাউকে বিমুখওকরেননি কোনোদিন, অথচ যেখানে পুরোনো ইটের হাজার-করা দর পাঁচ টাকা করে ধরলেওকেদার ইট বিক্রি করেই অন্তত দেড় হাজার টাকা নিট দাম আদায় করতে পারতেন।

কিন্তু তা কখনো করবেন না কেদার। রাজবংশের ছেলে হয়ে পূর্বপুরুষের ভিটের ইট বিক্রি করে টাকা রোজগার ?ছিঃ !...এমনি দেবেন। লোকের উপকার হয়, হোক না।

সাতকড়ি বললেন, তা হলে প্রভাস বাবাজি, কাল থেকে লোক লাগিয়ে দিই—কি বলো ?

প্রভাস বললে, বেশ, নিয়ে যান—আমি তো বলেছি কাজ আরম্ভ করুন।

ক্ষণকালের সে ভাবান্তর কেটে গিয়েছে সকলের মন থেকেই। এরা অন্য ধাতের মানুষ, প্রত্যক্ষ দৃষ্ট বাস্তব ছাড়া অন্য কোনো জগতের সঙ্গে এদের বিশেষ পরিচয় নেই।

কেদার দেখিয়ে দিলেন কোন্ পথে ইটের গাড়ি আসতে পারে, কারণ তিনি ভিন্ন গড়ের জঙ্গলের অন্ধি-সন্ধি বড় কেউ একটা জানে না।

কাজ মিটে গেল। সাতকড়ি বললেন, চলো সবাই জঙ্গলের মধ্যে থেকে বেরিয়ে যাই—মশার কামড়ে মলাম।

বনের মধ্যে একটু যেন ভিজে ভিজে এখনো গাছপালা—বেলা বেশি হয়েছে বটে, কিন্তু ঘন ছাতিম-বনের আবরণ ভেদ করে সূর্যকিরণ এখনো বনের তলায় পড়েনি। কি একটা বনফুলেরসুমিষ্ট গন্ধ ঠাণ্ডা বাতাসে।

প্রভাস সমস্ত পথ ঘোর অন্যমনস্কভাবে চলে এল। সে আজ যেন কেমন হয়ে গিয়েছে।

গড়বাড়ি থেকে বের হয়ে গ্রামে ঢুকবার মুখে সে কেদারকে বললে, আপনি বাড়ি থাকেন, না কোথাও চাকরি করেন ?

কেদার বললেন, না বাবাজি, চাকরি-টাকরি কখনো আমাদের বংশে করেনি কেউ। বাড়িই থাকি।

—আসুন না একবার কলকাতায়। আমাদের বাড়ি রয়েছে—দয়া করে সেখানে গিয়ে—

—আমার কখনো কোথাও যাওয়া হয় না বাড়ি ফেলে—তা ছাড়া মেয়েটা একলা বাড়িতে—ইয়েহ্যাঁ, এই সব কারণে যেতে পারি নে কোথাও। আর ধরো গিয়ে আমার বাড়ি একেবারে গাঁয়ের বাইরে, মানুষজন নেই—ফেলে যাই কি করে ?

এ কথার প্রভাস বিশেষ কোনো জবাব দিলে না।

কেদার আবার বললেন, তুমি এখন ক-দিন থাকবে ?

প্রভাস বললে, না, আমি কালই যাব বোধ হয়। কলকাতায় অনেক কাজ রয়েছে পড়ে। পরশু তারিখের একটা পোস্ট-ডেটেড চেক রয়েছে মোটা টাকার—আমি না গেলে সেখানা ব্যাঙ্কে প্রেজেন্ট করা হবে না।

কেদার আদৌ বুঝলেন না জিনিসটা কি। ব্যাঙ্ক জিনিসটা তিনি জানেন, শুনেছেন বটে—কিন্তু পোস্ট-ডেটেড চেক কথার অর্থ কি, বা সে কি ব্যাপার—এ সব সম্বন্ধে কোনো জ্ঞান নেই তাঁর। তিনি শুধু বিজ্ঞের মতো ঘাড় নেড়ে বললেন, ও ! ঠিক ঠিক !

ওরা চলে গেল সবাই। কেদার এত বেলায় অন্য কোথাও যাওয়া উচিত না বিবেচনা করে বাড়ির দিকেই ফিরছেন এমন সময় গেঁয়োহাটির ক্ষেত্র কাপালির সঙ্গে দেখা। সে গড়ের খাল পার হয়ে তাঁর বাড়ির দিক থেকেই আসছে। কেদার বললেন, কি হে ক্ষেত্র, আমার ওখানে গিয়েছিলে নাকি ?

—প্রাতপেন্নাম দা-ঠাকুর। মোদের গাঁয়ে ওবেলা যাতি হবে, একেবারে ভুলে গিয়ে বসে আছ ! দা-ঠাকুর আমাদের একেবারে বোম্ ভোলানাথ। মনে নেই আজ আমাদের যাত্তারার দলের আখড়াই ?আপনি গিয়ে বেয়ালা না ধরলি আসর জমবে, না আসরে ঢোলক বাজবে ?চলো দা-ঠাকুর—তোমার বাড়ি গিয়েছিলাম, তা মা-ঠাকরুন বললেন তিনি কোথায় গিয়েছেন বেরিয়ে।

—ভালোই তো—তা ক্ষেত্র, তুমিও দুটো খেয়ে যাও আমার বাড়ি, চলো না ?বেলা হয়ে গিয়েছে, চলো।

ক্ষেত্র কাপালি রাজী হল না। সে চলে গেল, যাবার সময় কেদারকে তাদের গ্রামে যেতে বলে গেল বার বার করে।

কেদার বাড়ি ফিরে দেখলেন শরৎ রান্না সেরে বসে আছে। বললে, বাবা নেয়ে নাও, ভাত হয়ে গিয়েছে কতক্ষণ। ওরা সব চলে গেল, ইট নিয়েছে ?

—হ্যাঁ, ইট কাল গাড়ি পাঠিয়ে নিয়ে যাবে।

—গেঁয়োহাটির ক্ষেত্র এসেছিল তোমার খোঁজে। দেখা হয়েছে ?

—এই তো গেল। ওবেলা ওদের আখড়াই বসবে তাই ডাকতে এসেছিল কিনা ?খেয়ে একটু ঘুমিয়ে নেব—তার পর যাব ওদের গাঁয়ে। তেল দাও।

ঘুমিয়ে উঠে বেলা তিনটের সময় কেদার গেঁয়োহাটি রওনা হবার উদ্যোগ করছেন, এমন সময় ভাঙা দেউড়ির রাস্তায় প্রভাসকে আসতে দেখে হঠাৎ বড় ব্যস্ত হয়ে উঠলেন।

—আরে এসো এসো বাবাজি এসো ! কি মনে করে ?...

প্রভাস একা এসেছে। ওবেলার সাজ আর এবেলা নেই গায়ে—সাদা সিল্কের একটা শার্ট পরেছে, হাতে ও গলায় সোনার বোতাম, পরনে জরিপাড় ধুতি, পায়ে নতুন ফ্যাশনের খাঁজকাটা জুতো। হাতের পাঁচ আঙুলের মধ্যে তিন আঙুলে পাথর-বসানো আংটি রোদ পড়ে চিকচিক করছে।

—ও শরৎ মা, এদিকে এসো—প্রভাসকে একটা বসার জায়গা দাও। চা খাবে তো প্রভাস ?হ্যাঁ, খাবে বৈকি, বোসো বোসো।

প্রভাস বললে, আপনাদের এখানে মোটর আসবার রাস্তা নেই। গাড়িখানা গড়ের খালের ওপারে দাঁড় করিয়ে রেখেছি।

শরৎ একটা আসন বার করে প্রভাসকে বসতে দিয়ে রান্নাঘরের দিকে সম্ভবত চা করতে গেল। প্রভাস বসে চারিদিকে তাকিয়ে বললে, আমি এর আগে কখনো গড়বাড়িতে আসিনি, খুব কাণ্ড ছিল তো এক সময় ! দেখেশুনে সত্যিই অবাক হয়ে যাবার কথা বটে। কি ছিল, তাই ভাবি ! মন কেমন যেন হয়ে যায়, না কাকা ?

কেদার এ ধরনের কথা অনেক লোকের মুখ থেকে অনেক বার শুনেছেন, শুনে আসছেন তাঁর বাল্যকাল থেকে। এই সব ইট-পাথরের ঢিবি আর জঙ্গলের মধ্যে লোকে কি যে দেখতে পায়, তিনি ভেবেই পান না। পয়সা থাকলেই বোধ হয় মানুষের মনে এসব অদ্ভুত ও আজগুবি মনোবৃত্তির সৃষ্টি হয়—কে জানে ?কেদারের কৌতুক হয় এ ধরনের কথা শুনলে। থাকে সব কলকাতায় বড় বড় বাড়িতে, ইলেকটিরি আলো আর পাখার তলায়, এই সব পাড়াগাঁয়ে সে যা দেখে তাই ভালো লাগে—আসল কথাটা হল এই। একবার অনেক দিন আগে মহকুমার হাকিমএসেছিলেন এই গ্রামে কি একটা মোকদ্দমার তদারক করতে। যেমন সকলেই আসে, তিনি এলেন গড়শিবপুরের রাজবাড়ি দেখতে। কেদারের ডাক পড়ল। কেদার তো সঙ্কোচে জড়সড় হয়ে হাকিমের সামনে হাজির হলেন। হাকিম-হুকুমকে বিশ্বাস নেই, কাঁচা-খেকো দেবতা সব !

হাকিম জিজ্ঞেস করলেন, আপনি গড়শিবপুরের রাজবংশের লোক ?

—আজ্ঞে, হুজুর।

—আপনাকে দেখে আমার মনের মধ্যে কি হচ্ছে, জানেন ?আপনি কে আর আমি কে ! আপনি এ পরগনার রাজা—আর আমি—আপনার একজন কর্মচারীর সমান।

কেদার সম্ভ্রম দেখিয়ে নীরব রইলেন। বড়লোক খেয়াল-খুশিতে অনেক কিছু বলে—সব কথার জবাব দিতে নেই।

শরৎ তখন মাত্র পনেরো বছরের মেয়ে, উদ্ভিন্ন-যৌবনা, অপূর্ব সুন্দরী। হাকিম তাকে কাছে ডেকে আদর করে বললেন, মাকে আমি নিয়ে যেতাম, যদি আজ রাঢ়ী শ্রেণীর ব্রাহ্মণ হতাম, আমার সে সৌভাগ্য নেই। আমার ছেলেটি এবার বি-এ পাশ করেছে। কিন্তু বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণের সঙ্গে তো আপনি কাজ করবেন না। মা আমার রাজবংশের মেয়ে বটে ! ওর সেবা পাব, সে ভাগ্য কি আর করেছি ?

শরৎ মুখ নীচু করে রইল লজ্জায় ও সঙ্কোচে।

দশ-এগারো বছর আগেকার কথা।

শরৎ প্রভাসের সামনে চা এনে দিলে। সে খুব সরুপাড় একখানা ধুতি পরেছে, হাতে দু-গাছা সোনার চুড়ি—মায়ের হাতের বালা ভেঙে ক-গাছা চুড়ি হয়েছিল, এই দু-গাছা তার মধ্যে অবশিষ্ট আছে। জড়িয়ে এলো-খোঁপা বাঁধা, দেখলে ওকে উনিশ-কুড়ি বছরের বেশি বলে কিছুতেই মনে হয় না, এমনি লাবণ্যভরা মুখশ্রী।

প্রভাসের দিকে চেয়ে বললে, দেখুন তো, আর চিনি দেব কিনা—

প্রভাস চায়ে চুমুক দিয়ে একটু সঙ্কোচের সুরে বললে, আজ্ঞে না। আমি চিনি কম খাই—

কেদার বললেন, তার পর, কি মনে করে বাবাজি ?

প্রভাস যেন আমতা আমতা করে উত্তর দিলে—ইয়ে—এই কিছু না—এই দিক দিয়ে যাচ্ছিলাম কি না !...তাই—

—বেশ বেশ। বোসো বাবাজি—

প্রভাস চা-পান করে বসে রইল বটে, তবে একটু উশখুশ করতে লাগল। বসে থাকাটা তার পক্ষে যেন বড়ই অস্বাচ্ছন্দ্যকর হয়ে উঠছে। অথচ মুখেও কোনো কথা যোগায় না। এমন অবস্থায় সে কখনো পড়েনি।

কেদার বললেন, তুমি কালই তো কলকাতায় যাবে—না ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, কাল দুপুরে রওনা হব খেয়ে-দেয়ে।

আবার সে একটু উশখুশ করতে লাগল।

তার এ ভাবটা বুদ্ধিমতী শরতের চোখ এড়াল না। তার মনে হল, প্রভাস কিছু বলবার জন্যে এসেছে—কিন্তু তা বলতে পারছে না। সে একটু বিস্ময়মিশ্রিত কৌতূহলের দৃষ্টিতে প্রভাসের দিকে চেয়ে রইল।

পরক্ষণেই প্রভাস পকেট থেকে একটা ছোট মখমলের বাক্স সসঙ্কোচে বার করে বললে, এইটে এনেছিলাম দিদির জন্যে—

কেদার বিস্ময়ের স্বরে বললেন, কি ওটা ?

—এই গিয়ে—একটা আংটি—

—শরতের জন্যে এনেছ ?

—হ্যাঁ—ভাবলাম, কখনো আসিনে—যখন আলাপ হয়েই গেল আপনাদের সঙ্গে, তাই—

কেদার হাত বাড়িয়ে মখমলের বাক্স হাতে নিয়ে বললেন, দেখি ?বাঃ, বাক্সটি বেশ ! আংটিটা—এ যে দেখছি বেশ দামী জিনিস। এ তুমি আনলে কোথা থেকে ?

—ওবেলা মোটরে চলে গিয়েছিলাম রাণাঘাট। সেখান থেকে কিনে এনেছি—আমার জানাশুনা দোকান, এ জিনিস বাইরে শো-কেসে সাজিয়ে রাখে না। আমাকে চেনে বলে বার করে দিলে।

—কত দাম নিয়েছে ?

প্রভাস সলজ্জভাবে বললে, সে কথা আর কেন জিজ্ঞেস করছেন কাকাবাবু। দাম আর কি, অতি সামান্য—আপনাদের দেওয়ার মতো কিছু না—

কেদার আংটিটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে দেখতে বললেন, আমার মনে হচ্ছে তুমি বেশ পয়সা খরচা করেছ। এ পাথরখানা তো বেশ দামী, হীরে বোধ হয়—না ?

প্রভাস একটু উৎসাহের সুরে বললেন, আজ্ঞে হ্যাঁ। দেড় রতি ওজন, আসল পাথর। তবে দামদস্তুরের কথা এখনো স্যাক্‌রার সঙ্গে কিছু হয়নি—

কেদার বাক্সটা প্রভাসের হাতে ফিরিয়ে দিয়ে বললেন, কেন এত খরচপত্র করতে গেলে অনর্থক ?এ তুমি নিয়ে যাও বাবাজি। এ দরকার নেই।

প্রভাসের মুখে যেন কে কালি লেপে দিল। সে ভয়ে ভয়ে বললে—এনেছিলাম দিদিকে দেব বলে—খুব আশা করেছিলাম—যদি অপরাধ না নেন—

—না বাবাজি—শরৎ বিধবা মানুষ, ও আংটি-টাংটি পরে না তো ! ও বড় গোঁড়া ধরনের মেয়ে। এতদিন চুল কেটে ফেলত, শুধু আমার ভয়ে পারে না।

প্রভাস কিছু কথা খুঁজে না পেয়ে চুপ করে রইল। কেদারের মনে কেমন একটু সহানুভূতি জাগল প্রভাসের প্রতি—বেচারি যেন বড়ই লজ্জিত ও অপ্রতিভ হয়ে পড়েছে আংটির বাক্স ফেরত দেওয়ায়। নাঃ, এদের সব ছেলেমানুষি কাণ্ড !

মেয়ের দিকে চাইতে গিয়ে কেদার দেখলেন শরৎ কখন সেখান থেকে সরে গিয়েছে। ডাকলেন—ও শরৎ, শোনো মা—

শরৎ ঘরের ভেতর থেকে জবাব দিলে—কি বাবা ?

—হ্যাঁরে, প্রভাস একটা আংটি দিতে চাচ্ছে তোকে—কি করবি ?রাখবি ?

শরৎ আড়াল থেকেই বললে—আমি কি জানি ?তুমি যা ভালো বোঝো।...আংটি আমি তো পরি নে—তবে উনি যখন হাতে করে এনেছেন থাক জিনিসটা।

কথা শেষ করার সঙ্গে সঙ্গে শরৎ ঘর থেকে বেরিয়ে এসে হাত বাড়িয়ে বললে—দেখি ?

প্রভাস জিনিসটা কেদারের হাতে দিলে—তিনি মেয়ের হাতে তুলে দিলেন সেটা। প্রভাস শরতের দিকে কৃতজ্ঞতার দৃষ্টিতে চেয়ে দেখল—কিন্তু শরৎ তখন বাক্সটি খুলে আংটি নেড়েচেড়ে দেখছে—তার চোখ অন্যদিকে ছিল না।

কেদার হাসিমুখে বললেন—পছন্দ হয়েছে তোর ?তা পছন্দ হবার জিনিস বটে। আমি শুধু বলছি প্রভাসকে যে এত খরচ করবার কি দরকার ছিল ?এখান থেকে সাত ক্রোশ তফাত রাণাঘাটের বাজার। মটোর গাড়ি আছে তাই যেতে পেরেছিলে বাবাজি।

প্রভাসের মুখ উজ্জ্বল দেখাচ্ছিল, সে বললে, দিদিকে একটা সামান্য জিনিস দিলাম— এতে খরচপত্রের কি আর—কিছুই না। অতি সামান্য জিনিস—

শরৎ বললে, বসুন আপনি। আমি খাবার করছি, খেয়ে যাবেন। ততক্ষণ বাবা একটু গল্প করো না প্রভাসবাবুর সঙ্গে।

কেদার আসলে খুব সন্তুষ্ট নন, তিনি একটু বিরক্তই হয়েছেন প্রভাস আসাতে। বেলা পড়ে আসছে, এখন তাঁর বেরুবার সময়—গেঁয়োহাটির আখড়াইয়ের আসরে বেহালা না বাজালে আখড়াই জমবে না, ক্ষেত্র কাপালি বলে গিয়েছে ওবেলা।

আর ঠিক এই সময়ে এসে কিনা জুটল প্রভাস !

একে তো মেয়ে বাড়ি থেকে বেরুতে দেয় না, তার ওপর যদি প্রতিবেশীরা পর্যন্ত বাদ সাধে, তবে তিনি বাঁচেন কি করে ?

শরৎ ঘরের মধ্যে চলে গিয়েছে খাবার করতে—কেদার আর কিছুক্ষণ বসে প্রভাসের সঙ্গে অন্যমনস্কভাবে একথা ওকথা বললেন। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছিল তার মন নেই কথাবার্তার দিকে—গেঁয়োহাটিতে একটা ছিটের বেড়ার দেওয়াল দেওয়া চালাঘরে এতক্ষণে কত লোক জুটেছে—সবাই তাঁর আগমন-পথের দিকে উদ্বিগ্ন দৃষ্টিতে চেয়ে আছে—তিনি না গেলে আখড়াইয়ের আসর একেবারে মাটি।

বেলা বেশ পড়ে এসেছে। এখান থেকে দেড় ক্রোশ রাস্তা গেঁয়োহাটি—অনেক দূর।

হঠাৎ তিনি উঠে পড়ে বললেন, মা, প্রভাস বাবাজি রইলেন বসে। তুমি খাবার করে খাইয়ে দিয়ো। আমার বিশেষ দরকার আছে—গেঁয়োহাটিতে খাজনার তাগাদা আছে। প্রভাসের দিকে চেয়ে বললেন—বোসো তুমি বাবাজি, কিছু মনে কোরো না—

মেয়েকে কোনো রকম প্রতিবাদের সুযোগ না দিয়েই তিনি দাওয়া থেকে নেমে উঠোন পার হয়ে ভাঙা দেউড়ির দিকে হন হন করেই হাঁটতে শুরু করলেন। অনেক সময় এরকম ক্ষেত্রে মেয়ে ছুটে এসে পথ আটকায়—পূর্বের অভিজ্ঞতা থেকে কেদার এ জানেন কিনা।

শরৎ রান্নাঘর থেকে চেঁচিয়ে বললে, যেয়ো না বাবা—শোনো বাবা—খেয়ে যাও খাবার—শোনো ও বাবা—

সঙ্গে সঙ্গে সে খুন্তি হাতে রান্নাঘর থেকে বার হয়ে এসে নিচু চালের দাওয়ায় দাঁড়িয়ে মাথা নিচু করে চেয়ে দেখলে, কেদার ভাঙা দেউড়ির পথে অদৃশ্য হয়েছেন।

তার লজ্জা করতে লাগল, প্রায় অপরিচিত প্রভাস যে বসে সামনে—নইলে সে এতক্ষণ দেখিয়ে দিত বাবা জোরে হেঁটে কতদূর পালান ! গড়ের খালে নামবার আগেই সে ছুটে গিয়ে ধরে ফেলত বাবার হাত।

ছিঃ, কি অন্যায় বাবার !

প্রভাসের দিকে চেয়ে বললে, একটু বসুন, কেমন তো ?আমি মোহনভোগ চড়িয়ে এসেছি কড়ায়—আসছি নামিয়ে—

প্রভাস খানিকক্ষণ একা বসে থাকবার পরে শরৎ কাঁসার কানা-উঁচু রেকাবিতে মোহনভোগ এনে ওর সামনে রাখলে, আর এক গেলাস জল।

—কেমন হয়েছে বলুন তো প্রভাসদা ?

শরতের স্বর সম্পূর্ণ নিঃসঙ্কোচ—আত্মীয়তার সহজ হৃদ্যতায় মধুর ও কোমল।

প্রভাস একটু অবাক হয়ে গেল ওর ‘দাদা’ ডাকে।

শরতের মুখের দিকে চেয়ে বললে, আপনি কি করে জানলেন আমি আপনার চেয়ে বড় ?

শরৎ মৃদু হাসিমুখে জবাব দিলে—আমি জানি।

—কি করে জানলেন ?

—বারে, ভুলে গেলেন ?ওবেলা তো জগন্নাথ জেঠাকে বললেন এখানে বসে আপনার বয়সের কথা।

এইবার প্রভাসের মনে পড়ল। ওবেলা এ-কথা উঠেছিল বটে। সে কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললে, বেশ হল, আপনার সঙ্গে আলাপ হয়ে গেল—

শরৎ সে কথার কোনো উত্তর না দিয়ে বললে, কেমন হয়েছে মোহনভোগ বললেন না যে ?

—খু-ব ভালো হয়েছে। সত্যি বলছি চমৎকার হয়েছে—

—মা খুব ভালো করতে পারতেন, তেমনটি আমার হাতে হয় না।

—আমার একটা অনুরোধ রাখুন। আংটিটা পরুন আমার সামনে—

শরৎ বাক্সটা খুলে আংটিটা হাতে নিয়ে আঙুলে পরে বললে, বেশ হয়েছে। এই দেখুন—

প্রভাস আনন্দে গলে গিয়ে বললে, কি চমৎকার মানিয়েছে আপনার আঙুলে !

শরৎ ছেলেমানুষের মতো খুশিতে নিজের আঙুলের দিকে বার বার চেয়ে দেখতে লাগল।

প্রভাস বললে, আচ্ছা আপনি একা থাকেন, কাকা বেরিয়ে গেলে ভয় করে না আপনার ?

—ভয় করলেই বা করছি কি বলুন—উপায় তো নেই। বাবা লুকিয়ে পর্যন্ত পালিয়ে যান, পাছে আমি আটকে রাকি। ওঁর ছেলেমানুষি স্বভাব—দেখে আসছি এতটুকু বেলা থেকে। মা বেঁচে থাকতেও ঠিক অমনি করতেন।

—আচ্ছা, আপনি কখনো কলকাতা দেখেছেন ?

শরৎ ঠোঁট উলটে হেসে বললে, কলকাতা ! উঃ—তা আর জানি নে। কখনো জীবনে গোয়াড়ি কেষ্টনগর কি নবদ্বীপ দেখলাম না, তার কলকাতা ! আমি এই গড়ের খালের জঙ্গলে কাটালাম সারা জীবনটা প্রভাসদা—সত্যি বলছি ভালো লাগে না।

প্রভাস যেন বড় উৎফুল্ল হয়ে উঠল—পরক্ষণেই আবার সে ভাবটা চেপে সহজ তাচ্ছিল্যের সুরে বললে, এ আর কি কঠিন আপনার কলকাতা দেখা ! যেদিন মনে করবেন, সেদিনই হতে পারে।

শরৎ হর্ষদীপ্ত স্বরে বললে, আপনি নিয়ে যাবেন প্রভাসদা ?

প্রভাস সোৎসাহে বললে, কেন নিয়ে যাব না ?বলুন না আপনি কবে যাবেন ?মোটর তো রয়েছে—টানা মোটরে বেড়িয়ে আসবেন কলকাতা।

—খুব ভালো কথা প্রভাসদা। যাব এর মধ্যে একদিন। একঘেয়েমি বরদাস্ত হয় না আর।

প্রভাস একহাত জমি শরতের দিকে এগিয়ে বসল উৎসাহের ঝোঁকে। বললে—আপনাকে আজ নতুন দেখছি বটে, কিন্তু মনে হয় যেন আপনার সঙ্গে আমার আলাপ আজকের নয়, অনেক পুরোনো।

কি জানি কেন, এ কথা শরতের কানে ভালো শোনাল না—সে নিজেকে কিছু দূরে সরিয়ে নিয়ে গেল। প্রভাসের কথার কোনো উত্তর সে দিলে না।

প্রভাস বোধ হয় শরতের এ ভাব লক্ষ্য করলে। সে সুর বদলে বললে—আপনার বাবা বড় ভালো লোক, ওঁকে আমার নিজের বাবার মতো ভাবি।

বাবার প্রশংসা শুনে শরতের মন আহ্লাদে পূর্ণ হয়ে গেল। ওর বাবাকে গ্রামের কেউ প্রশংসা করে না, অন্তত সে তো বড়-একটা শোনেনি কখনো কারো মুখে, এক রাজলক্ষ্মী ছাড়া। কিন্তু রাজলক্ষ্মী বালিকা মাত্র, তার মতামতের মূল্য কি ?

শরৎ বললে, বাবার মতো মানুষ একালে হয় না। একেবারে সাদাসিদে, কিছুই বোঝেন না ঘোরপ্যাঁচ, গাঁয়ের লোক কত রকম কি বলে, মজা দেখবার জন্যে ওঁকে নাচিয়ে দিয়ে কত রকম কি করে—সে সব দিকে খেয়াল নেই। দেখুন প্রভাসদা, আমাদের অতিথিশালা আছে বলে গাঁয়ের লোক ইচ্ছে করে বাইরের লোক এনে বাবার ঘাড়ে চাপাবে। আমাদের অবস্থা অথচ সবাই জানে—কিন্তু বাবাকে জব্দ করা তো চাই। আমার এত দুঃখু হয় সময়ে সময়ে।

—আপনি বলেন না কেন কাকাকে বুঝিয়ে ?

—আমার কথা উনি শোনেন, না কখনো শুনেছেন ?মাকেই বড় গেরাহ্যি করতেন, আর আমি ! যা খেয়াল ধরবেন, তাই করবেন।

—আচ্ছা, আজ উঠি তা হলে। আর এক দিন আসব এখন। কলকাতা যাওয়ার কথা মনে আছে তো ?একদিন নিয়ে যেতে আসব কিন্তু।

প্রভাস চলে গেলে শরৎ গৃহকর্ম শেষ করে সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বালল। চারিদিকে বন-বাদাড়ে-ঘেরা উঠোন, বেশ একটু শীত পড়েছে—হেমন্তকাল শেষ হতে চলেছে।

শরৎ উত্তর দেউলে প্রদীপ দিয়ে এসে রান্নাঘরের মধ্যে ঢুকল। বাবা কত রাত্রে ফিরবেন ঠিক নেই—সে রান্না শেষ করে বসে থাকবে। একলা থেকে থেকে ভালো লাগে না সত্যই এই নিবান্দা পুরীতে, এই বন-বাদাড়ের মধ্যে।

তার মন চায় একটু মানুষজনের সঙ্গ, কারো সঙ্গে একটু কথাবার্তা কওয়া যায়, কেউ একটা মজার গল্প বলে। তবুও কলকাতা থেকে প্রভাসদা এসেছিল, খানিকটা সময় কাটল।

এই সময় যদি একবার রাজলক্ষ্মী আসত !

রান্না করতে করতে রাজলক্ষ্মীর সঙ্গে গল্প করা যেত তা হলে। মুখটি বুজে কি করে মানুষ থাকতে পারে সারাদিন ?

রান্না চড়িয়ে শরৎ আপনমনে গুন্‌গুন্‌ করে গান গাইতে লাগল—

দাদা, কে বা কার পর কে কার আপন !

কালশয্যাপরে

মোহনিদ্রা ঘোরে

দেখি পরস্পরে অসার আশার স্বপন—

এই গ্রামেই বারোয়ারির যাত্রায় শোনা গান। শরতের গলার সুর এক সময়ে খুব ভালো ছিল—এখন আর কিশোরীর বীণানিন্দিত সুকণ্ঠ নেই—তবুও সে বেশ ভালোই গায়। তবে রাজলক্ষ্মী ছাড়া তার গান আর কেউ শোনেনি কখনো, এই যা দুঃখ ! এমন কি কেদারও শোনেননি।

একবার সে বাইরে বেরুল—বেশ জ্যোৎস্না আজ। শীতের আমেজ দিয়েছে বাতাসে—বাইরে এলে গা সির-সির করে। ছাতিম-বনে আর ছাতিম-ফুলের সুগন্ধ নেই—উত্তর দেউলে প্রদীপ দিতে গিয়ে সে দেখেছে।

মনে কত সব অস্পষ্ট ইচ্ছা জাগে, কত কি করবার ইচ্ছে হয়, কত কি দেখবার ইচ্ছে হয়, এই বনের মধ্যে মাসের পর মাস, বছরের পর বছর এই অবস্থায় থেকে মন হাঁপিয়ে ওঠে। অথচ এও সে জানে, অন্য কোথাও গিয়ে সে বেশি দিন থাকতে পারবে না।

তাদের গড়ের খালের দু-পাশে বনে ভরা, ঘরবাড়ি ভাঙা ইটের আর কাঠের স্তূপ। কিন্তু শরতের সমস্ত অস্তিত্ব এই ভিটেটির ওপর দাঁড়িয়ে আছে। উত্তর দেউলে যখন সে প্রদীপ দেখাতে যায়—তখন বাদুড়নখীর জঙ্গল, ছাতিমগাছের সারি, অন্ধকারে কালো পায়রার দীঘি, ভাঙা মন্দির—এরা যেন তার জীবনে একটা স্থায়ী শান্ত অস্তিত্বের বাণী বহন করে আনে, যে অস্তিত্বটা শরতের কাছে একমাত্র সত্য ও বাস্তব।

নীল আকাশের তলায় দুপুরের ঝমঝম রোদে কালো পায়রার দীঘিতে সে কতদিন নেমেছে ক্ষার কাচতে, কিংবা কুলের থলে মেলে দিয়েছে উঠানের মাচানের ওপর—বাবা হয়তো ঘরে ঘুমিয়ে, কিংবা হয়তো বাড়ি নেই—সেই সময় কতবার তার মনে হয়েছে নানা অদ্ভুত কথা—বহুদূরের কোনো নাম-না-জানা দেশ থেকে সে জন্মেছে এসে এই গড়বাড়ির রাজবংশে—যে রাজবংশে সে আর তার বাবা চলে গেলে বাতি দিতে আর কেউ থাকবে না। সে রাজবংশের মেয়ে—রূপকথার রাজকন্যা, রুক্ষ চুলে তেলের অভাব তখন তার মনে থাকে না, ভাঁড়ারের চালডালের দৈন্য, ছেঁড়া কাপড়ের পুঁটুলি বাঁশের আড়ার ওপর—এসব সে ভুলে যায়।

সে রাজার মেয়ে—রাজকন্যা।

ওই নীল আকাশ, ওই ছাতিম-বনের সারি, ঘুঘু-কোকিলের দল, সারা দেশ, সারা পৃথিবী তার অস্তিত্বের দিকে সসম্ভ্রমে চেয়ে আছে কিসের অপেক্ষায়—গভীর রহস্যভরা তার মহিমান্বিত অস্তিত্বের দিকে।

আবার এক এক সময় ভুল ভেঙে যায়।

সে তখন বড় ছোট হয়ে পড়ে।

যখন রাজলক্ষ্মীদের বাড়ি চুপি চুপি কাঠা হাতে চাল ধার করতে যেতে হয়, কলুর তাগাদাকে হজম করতে হয়, পয়সার অভাবে ঘর্মাক্ত মুখে হেঁইও হেঁইও করে সাবানদেওয়া ময়লা কাপড়ের রাশি কাচতে হয় নির্জন দীঘির ঘাটে—তখন সে হয় নিতান্ত গরিবের ঘরের মেয়ে, হয়তো বাগ্‌দী কিংবা দুলে—তার কোনো লজ্জা নেই, সঙ্কোচ নেই, অপমান নেই— নিজের জন্যে নয়, নিজের কষ্ট সে কোনোদিন গ্রাহ্য করেওনি, কিন্তু বাবার জন্যে সে করতে পারে না এমন কাজই নেই...বাবার এতটুকু কষ্ট সে দেখতে পারবে না কোনোদিন..

তার নিঃসন্তান মাতৃত্বের সবটুকু স্নেহ গিয়ে পড়েছে বাবার ওপরে। বাবা বৃদ্ধ হয়ে পড়েছেন, সব জিনিস হয়তো ঠিকমতো বুঝতে পারেন না—তাঁকে আগলে বেড়ানো উচিত সব সময়।

মা যখন নেই, তখন তাকেই করতে হবে বাবার সব কাজ। তাঁর সব সুখ-সুবিধে তাকেই দেখতে হবে। বাবাকে ফেলে তার মরেও সুখ নেই।

এ অভাবের সংসারে সে যে কত জায়গা থেকে জিনিসপত্র জুটিয়ে আনে, বাবা কি তার কোনো খবর রাখেন ?

তিনি দুবেলা ঠিক খাবার সময় এসে বললেন—শরৎ ভাত হয়েছে ?ভাত দে মা। চাল যে কতদিন বাড়ন্ত থাকে, তেল-নুনের অভাবে রান্না হয় না—বাবা কখনো রেখেছেন সে সন্ধান ?

রাজকন্যার গর্ব তখন খসে পড়ে, রাজকন্যা তখন এক গরিব গৃহস্থের ছেঁড়াশাড়ি-পরা মেয়ে হয়ে কাঠা হাতে তেলের বাটি হাতে ছোটে ধর্মদাস কাকাদের বাড়ি, রাজলক্ষ্মীদের বাড়ি...সাজিয়ে বানিয়ে কত মিষ্টি মিষ্টি মিথ্যে কথা সেখানে বলে, মানকে জলে ভাসিয়ে দেয়, চক্ষুলজ্জাকে আমল দিতে চায় না।

যখন আরো বয়স কম ছিল, মাঝে মাঝে কিন্তু সত্যিকার রাজকন্যা হতে তার ইচ্ছে জাগত মনে। গড়বাড়ির পুকুরপাড়, বন, জংলী লতায় ঢাকা ইটের স্তূপ চাঁদের আলোয় ফুটফুট করছে, তার স্বাস্থ্যভরা দেহের প্রতি পদক্ষেপে গর্ব ও আনন্দ, প্রাণে অফুরন্ত গানের ঝঙ্কার, মুকুলিত প্রথম যৌবনের অপরিসীম স্বপ্ন তার চোখের চাউনিতে—তখন একদিন এক দেশের রাজপুত্র এলেন ঘোড়ায় চেপে, তার রূপের খ্যাতি দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে পড়েছে যে—না এসে কে থাকতে পারবে ?

—বিয়ে তোমায় আমি করব না রাজপুত্তুর—

—ওমা, সে কি সর্বনাশ ! তুমি বলো কি রাজকন্যে, আমার ঘোড়ার দিকে চেয়ে দেখো, ঘেমে উঠেছে। কদ্দূর থেকে ছুটে আসছি যে তোমার জন্যে—আর তুমি বলো কি না—

—বাজে কথা বলে লাভ কি রাজপুত্তুর। ফিরে যাও—

—কেন বলো না ?কি হয়েছে ?

—আমরা মস্ত বড় বংশ, তার ওপরে ব্রাহ্মণ—তোমার কোন্ দেশে ঘর, কি বংশ তার নেই ঠিকানা—আমায় কত হীরেমোতির গহনা দিতে হবে জানো ? আমার বাবাকে একগাদা টাকা দিতে হবে জানো ?...বাবা দোকান করবেন—

—এই কথা ! কত টাকা দিতে হবে তোমার বাবাকে ?কিসের দোকান করবেন তিনি ?

—দাও দু হাজার পাঁচ হাজার। চাল-ডাল-ঘি-তেলের প্রকাণ্ড মুদিখানার দোকান—ছিবাস কাকার দোকানের চেয়ে অনেক, অনেক বড়—বাবার কষ্ট যে দূর করবে, সে আমায় নিয়ে যাবে—

কেদার এসে ডাক দিলেন—ও মা, ওঠ্—ও শরৎ—উঠে পড়ো—

আঁচল বিছিয়ে কখন শরৎ উনুনের সামনে রান্নার পিঁড়ির পাশে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। বাবার ডাকে সে ধড়মড় করে উঠে পড়ল।

—নাঃ, তুই কোন্ দিন পুড়ে মরবি দেখছি ! আচ্ছা, রাঁধতে রাঁধতে অমন করে উনুনের সামনে শোয় ?যদি আঁচলখানা উড়ে পড়তো আগুনে ?ঘুম ধরলে তোর আর জ্ঞানকাণ্ড থাকে না—

শরৎ একটু অপ্রতিভ হয়ে পড়েছিল, ঘুমজড়িত কণ্ঠে বললে, কি হয়েছে ?...আঁচল উড়ে পড়ত তো বেশ ভালোই হত। তোমার হাত থেকে উদ্ধার পেয়ে স্বগ্‌গে চলে যেতাম— বাবাঃ—রাত্তিরে একটু ঘুমুবারও জো নেই—বেশ যাও—কথা শেষ করেই শরৎ আবার তখুনি মেঝের ওপর শুয়ে পড়ল।

কেদার জানেন, মেয়ের ঘুমের ঘোর এখনো কাটেনি—এই রকম হয় প্রায় প্রতিদিন, তিনি দেখে এসেছেন। ভারি ঘুমকাতুরে মেয়ে।

তিনি আবার ডাক দিলেন—ও শরৎ—মা আমার ওঠো—এই যে আমি বাড়ি এইচি—ও মা—ওঠো, লক্ষ্মী-মা আমার—বুঝলি, উঠে চোখে জল দে দিকি ?ঘুম কেটে যাবে এখন—

শরৎ এবার সত্যিই উঠল।

কেদার বললেন, যা চোখে জল দিয়ে আয়—তোর যা ঘুম। রাত আর এমন কি হয়েছে ?এই তো সবে রাত দশটার গাড়ির শব্দ পাওয়া গেল, যখন গড়ের খাল পার হই।

শরৎ বাবাকে খাবার ঠাঁই করে দিয়ে ভাত বাড়তে বসল।

খানিকটা পরে খাওয়াদাওয়া সেরে কেদার তামাক খেতে খেতে বললেন—ভালো কথা, প্রভাস কখন গেল রে ?বেশ ছেলেটি। ওকে এবার একদিন নেমন্তন্ন করে খাওয়াতে হবে। তোরও একটা কিছু দেওয়া উচিত।

—কি দেব বাবা ?আমিও তা ভেবেছি।

—একটা কিছু বুনে-টুনে দে না। আসন-টাসন গোছের। শুধু হাতে কারো কাছে কিছু নিতে নেই তো ?দিস একটা কিছু করে। আংটিটা কই দেখি ?

শরৎ মৃদু হাসিমুখে বললে, সে নেই বাবা।

কেদার অবাক হয়ে মেয়ের মুখের দিকে চেয়ে বললেন, নেই। কি হল ?

শরৎ মুখ নিচু করে হাসি-হাসি মুখেই বললে, সে বাবা আমি দীঘির জলে ফেলে দিয়ে এসেছি। রাগ করোনি বাবা ?

—সে কি রে ?কখন ?

—উত্তর দেউলে পিদিম দিতে যাওয়ার সময়। কি হবে বাবা বিধবা মানুষের হীরের আংটি পরে ?

কেদার মেয়ের সঙ্গে তর্ক করলেন না। মেয়েকে চিনতে তাঁর বাকি নেই। সুতরাং তিনি চুপ করে রইলেন। কেবল তাঁর মনে দুঃখ হচ্ছিল অমন দামী আংটিটা যদি রাখবিই নে বাপু, তবে সে বেচারির কাছ থেকে নেওয়া কেন ?

এমন খামখেয়ালি মেয়ে !

দুপুরে রাজলক্ষ্মী এল শরতের কাছে। কেদার খেয়ে হাট করতে বেরিয়ে গিয়েছেন—আজ গেঁয়োহাটির হাটবার।

রাজলক্ষ্মী দেখতে বেশ মেয়েটি। নিতান্ত পাড়াগেঁয়ে, কখনো শহরের মুখ দেখেনি, তবে শহরের কথা অনেক জানে। তার দুই মামাতো ভগ্নীপতি এখানে মাঝে মাঝে আসে। কলকাতায় কাজ করে তারা—শহরের অনেক গল্প সে শুনেছে ওদের মুখে।

রাজলক্ষ্মী বললে, হাঁ শরৎদি, প্রভাসবাবু বুঝি কাল বিকেলে তোমাদের বাড়ি এসেছিল ?কি বললে ?

—বলবে আর কি, বৈকেলে এসেছিল, সন্দের আগে চলে গেল। গল্পগুজব করলে বসে—চা করে দিলাম। বেশ লোক প্রভাসদা। আমাদের বলেছে এক দিন কলকাতায় নিয়ে যাবে—বাবাকে আর আমাকে।

—কবে শরৎ দিদি ?

—তার কিছু ঠিক আছে ?তবে প্রভাসদা বলেছে যেদিন আমি মনে করব সেদিনই নিয়ে যাবে।

—রেলে ?

—না, মটোর গাড়িতে। এখান থেকে সমস্ত পথ মটোরে যাবে—কেমন মজা হবে, কি বলিস ?তুই চড়েছিস কখনো মটোর গাড়িতে ?

রাজলক্ষ্মী উদাস নয়নে অন্য দিকে চেয়েছিল। শরৎদিদির কথায় তার মনে কত অদ্ভুত ছবি জেগে উঠেছে। আজ বছর দুই আগে পিসেমশাই একটি বিয়ের সম্বন্ধ এনেছিলেন তার জন্য—ছেলেটি কলকাতায় চাকরি করতো। চল্লিশ টাকা মাইনে। বেড়ে নাকি হতে পারে একশো টাকা। তাদের পৈতৃক বাড়ি কোন্নগর, চাকরি উপলক্ষে কলকাতায় আছে অনেক দিন।

সম্বন্ধটা রাজলক্ষ্মীর মনে ধরেছিল। ছেলেটিও দেখতে নাকি ভালোই ছিল। কি দেনা-পাওনার গণ্ডগোলে সম্বন্ধ ভেঙে গিয়েছে।

মাস দুই ধরে কথাবার্তা চলবার ফলে রাজলক্ষ্মীর মন অনেকবার নানা রঙিন স্বপ্ন বুনেছিল সেটাকে ঘিরে। কখনো যে কলকাতা সে দেখেনি এবং হয়তো দেখবেও না কখনো ভবিষ্যতে—সেই কলকাতা শহরের একটা বাড়ির দোতলার ঘরে খাট টেবিল চেয়ার সাজানো তাদের ঘরকন্না, দালানের এক কোণে ছোট্ট একটি খাঁচায় টিয়া কি ময়না পাখি, মাটি-দেওয়া-টিনের টবে তুলসী গাছ, একটা ঘেরাটোপ-মোড়া সেলাইয়ের কল টেবিলের এক পাশে—নিস্তব্ধ দুপুরে বসে সে হয়তো কিছু একটা বুনছে কি সেলাই করছে—উনি গিয়েছেন আপিসে—বাসায় শ্বশুর-শাশুড়ি বা এ ধরনের কোনো ঝামেলা নেই—সে আছে একাই—নিজেকে কত মনে মনে সেই কল্পনীয় ঘরকন্নাটিতে ডুবিয়ে দিয়েছে সে, সে ঘরের খুঁটিনাটি কত কি পরিচিত হয়ে উঠেছিল তার মনের মধ্যে—দেখলেই যেন চিনে নিতে পারত ঘরটা—কিন্তু কোথায় কি হয়ে গেল, সে ঘরে গিয়ে ওঠা তার আর ঘটে উঠল না।

শরৎ দিদির কথায় সে অল্পক্ষণের জন্যে অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিল, শেষের দিকের প্রশ্নের মানে সে ভালো করে না বুঝে শূন্যদৃষ্টিতে শরতের মুখের দিকে চেয়ে বললে—কি বললে শরৎদি ?মজা ?..ও, মজা হবে না আবার ?খুব হবে। সত্যি কথা বলতে কি, এখান থেকে যেখানে বেরুবে সেখানেই ভালো লাগবে। একঘেয়ে দিন যেন আর কাটতে চায় না। অসহ্য হয়ে উঠছে দিন দিন। দুপুরে যে তোমার এখেনে নিশ্চিন্দি হয়ে বসব তার উপায় নেই। এতক্ষণ কাকিমা ঘুম থেকে উঠলেন, যদি দেখেন এখনো এঁটো বাসন মাজা হয়নি, রান্নাঘর ধোয়া হয়নি, তবে সন্ধে পর্যন্ত বকুনি চলবে।

শরৎ হাসিমুখে বললে, তা হলে তুই ঝগড়া করে এসেছিস বাড়ি থেকে, ঠিক বললাম। হ্যাঁ কি না বল্ ?

রাজলক্ষ্মী চুপ করে রইল।

শরৎ বললে, তাই বুঝলাম এতক্ষণ পরে। নইলে ঠিক দুপুরবেলা তুমি আসবার মেয়েই আর কি ! ভাত খেয়ে এসেছিস না আসিসনি, সত্যি কথা বল্—আমার মাথার দিব্যি—আমার মরা মুখ দেখবি—

—না, তা নয়। তেমন ঝগড়া নয়। ভাত খেয়েছি বৈকি—

—সত্যি বলছিস ?

—মিথ্যে কথা বলব না শরৎদি, তুমি যখন অমন দিব্যি দিলে। না, সে খাওয়ার কথা নিয়ে নয়—ঝগড়া নিয়েও নয়, সত্যিই এত একঘেয়ে হয়ে উঠেছে এখানে—ইচ্ছে হয় যেদিকে দু-চোখ যায় ছুটে যাই—

—সত্যি, যা বলিস ভাই, আমারও বড় একঘেয়ে লাগে। সেই সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত একই হাঁড়ি-হেঁসেল নিয়ে নাড়ছি, আর একই দীঘির ঘাটে সতেরো বার দৌড়ুচ্ছি, তার পর কেবল নেই আর নেই—

কিন্তু তরুণী রাজলক্ষ্মীর মন যা চায়, যে জন্যে ব্যাকুল—শরৎ তা ঠিক বুঝতে পারেনি। রাজলক্ষ্মীও ঠিকমতন বোঝাতে পারে না, তাই নিয়েই তো আজ বাড়িতে কাকিমার বকুনি খেতে হল। সে সর্বদা নাকি থাকে অন্যমনস্ক, কি তাকে বলা হয় নাকি তার কানে যায় না—ইত্যাদি, তার বিরুদ্ধে বাড়ির লোকের অভিযোগ। শরৎ বুঝতে পারে না ওর দুঃখ। ঘরকন্না করে করে শরতের মন বসে গিয়েছে এই সংসারেই, যেমন তাদের বংশের

পুরোনো আমলের পাথরের থাম আর ভাঙা মূর্তিগুলো ক্রমশ মাটির ওপর চেপে বসতে বসতে ভেতরে সেঁধিয়ে যাচ্ছে।

উঠোনের রোদ এইসময় একটু পড়ল। রাজলক্ষ্মী বললে—চলো শরৎ-দি, একটু গিয়ে দীঘির ঘাটে বসি, বেশ ছায়া আছে গাছের—বেশ লাগে।

শরৎ বললে, আমায় তো যেতেই হবে এঁটো বাসন মাজতে। চল ওখানে বসে গল্প করিস—আমার কি হয়েছে জানিস—মুখ বুজে থেকে থেকে আরো মারা গেলুম। আচ্ছা তুই বল্ রাজলক্ষ্মী, ভালো লাগে সকাল থেকে রাত দশটা অবধি ?কার সঙ্গে দুটো কথা কই যে ! —বাবা তো সব সময়েই বাইরে—

—তুমি তো আবার এমন জায়গায় থাকো যে গাঁয়ের কেউ আসতে পারে না।—এত দূর আর এই বনের মধ্যিখানে। জানো শরৎ-দি, গাঁয়ের বউ-ঝি এদিকে আসতে ভয় পায়, সাধনের বউ সেদিন বলছিল গড়বাড়িতে নাকি ভূত আছে—

—সাধনের বউয়ের মুন্ডু—দুর !

—তোমার নাকি সয়ে গিয়েছে। তা ছাড়া সে ভূতে তোমায় কিছু বলবে না। তুমি তো এই বংশের মেয়ে—রাজার মেয়ে। আমাদের মতো গরিব-গুরবো লোকদেরই বিপদ—হি-হি—

—মরবি কিন্তু মার খেয়ে আমার কাছে—

কালো পায়রা দীঘির সান-বাঁধানো ভাঙা ঘাটের নিচু ধাপে বড় বড় গাছের ছায়া এসেপড়েছে পুকুরের জলে আর ঘাটের রানাতে। ঘাটে ছাতিম আর অন্য অন্য গাছের ছায়া। বাঁ-দিকে দূরে উত্তর দেউল, যদিও এখান থেকে দেখা যায় না—সামনে সেই ইটের ঢিবিটা। প্রভাস যেখান থেকে ইট নিয়ে গিয়েছে গ্রামের স্কুলের জন্যে। সামনে প্রকাণ্ড দীঘিটার নিথর কালোজল—জলের ওপর এখানে-ওখানে পানকলস আর কলমির দাম, কোণের দিকে রাঙা নাললতার পাতা ভাসছে, যদিও এখন ওর ফুল নেই।

শরৎ এ সময় রোজ বসে একাই বাসন মাজে। আজ রাজলক্ষ্মীকে পেয়ে ভারি খুশি হয়েছেসে।

এই ঘাটে বসে শরৎ কত স্বপ্ন দেখেছে—রোজ এই বাসন মাজবার সময়টি একা বসে বসে। নীল আকাশের তলায় ঠিক দুপুরের অলস স্তব্ধতাভরা ছাতিম-বন, ভাঙা ইটের রাশ আর কালো পায়রা দীঘির নিথর কালো জল—হয়তো কখনো কাক ডাকে কা-কা—কিংবা যেমন আজকাল ঘুঘু সারাদুপুর ধরে ডাকের বিরাম বিশ্রাম দেয় না। কি ভালোই যে লাগে !

জীবনের যে একঘেয়েমির কথা রাজলক্ষ্মী বললে, শরৎ তা কখনো হয়তো সে ভাবে বোঝনি। এই গ্রামে এই গড়বাড়ির ইটের ভগ্নস্তূপের মধ্যে সে জন্মেছে—এরই বাইরের অন্যকোনো জীবনের সে কল্পনা করতে পারে না। অন্তত করতে পারত না এতদিন।

কিন্তু কি জানি, সম্প্রতি তার মনে কোথা থেকে বাইরের হাওয়া এসে লেগেছে—কালো দীঘির নিস্তরঙ্গ শান্ত বক্ষ চঞ্চল হয়ে উঠেছে।

প্রথমে এল তাদের অতিথিশালায় সেই বুড়ো বামুন, তার বাবার কাছে যে জেলার সীমানা দেখবার অপূর্ব গল্প করেছিল। যা ছিল স্থাণুবৎ অচল, অনড়—সেই নির্বিকার অতি শান্ত অস্তিত্বের মূলে কোথায় যেন সে কি নাড়া দিয়ে গেল। তার এবং তার বাবার।

বামুনজ্যাঠা কত গল্প করত তার রান্নাঘরে পিঁড়ি পেতে বসে বসে। বাইরের ঘরকন্না, কত সংসারের কথা, কত ধরনের সুখ-দুঃখের কাহিনী। বড় বড় আম কাঁঠালের বাগান, যা তাদের গড়ের বাগানের চেয়েও অনেক বড়, পঞ্চাশ বিঘের কলমের আমবাগান, কত বড় বাড়ি, তাদের মেয়েদের বউদের কথা, দিগন্তবিস্তীর্ণ মাঠ, মাঠের মধ্যে বাবলা গাছের সারি, শ্যাওড়াবন, শিরীষের ফল পেকে ফেটে কালো বীচির রাশি ছড়িয়ে আছে; উইয়ের ঢিবির পাশে বনধুতুরার ঝোপ। শরৎ তন্ময় হয়ে শুনত।...

অন্য এক জীবন, অন্য এক অস্তিত্বের বার্তা বহন করে আনত এ সব গল্প। আজ সে মেয়ে হয়ে জন্মেছে—তার হাত-পা বাঁধা, কোথাও যাবার উপায় নেই, কিছু দেখবার উপায় নেই—তার ওপর রয়েছেন বাবা, বৃদ্ধ, সদানন্দ বালকের মতো সরল, নির্বিকার।

তার পরে এল প্রভাসদা।

প্রভাসদা এল আর এক জীবনের বার্তা নিয়ে। শহরের সহস্র বৈচিত্র্য ও জাঁকজমক আছে সে কাহিনীর মধ্যে। মানুষ যেখানে থাকে এত অদ্ভুত আমোদ-প্রমোদের মধ্যে ডুবে—নিত্য নতুন আনন্দের মধ্যে যেখানে দিন কাটে, দেখতে ইচ্ছে হয় শরতের সে দেশ কেমন। খুব বড় একটা আশা ও আকাঙ্ক্ষা শরতের মনে জেগেছে প্রভাসের সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়ার পর থেকে।

তার পরে এই রাজলক্ষ্মী, ষোল বছরের কিশোরী মেয়ে তো মোটে—এরও নাকি একঘেয়ে লাগছে আজকাল গড়শিবপুরের জীবন। ওর বয়সে শরৎ শুধু শিবপুজো করেছে বসে বসে দীঘির ঘাটে বোধনের বেলতলায়, অত সে বুঝতও না, জানতও না।

কিন্তু আজকালের মেয়েদের মন আলাদা। শরৎ যে কালের মেয়ে, সে কাল কি আছে ?

রাজলক্ষ্মী শরতের দিকে চেয়ে হঠাৎ বলে উঠল—সত্যি শরৎদি—

শরৎ মুখ নিচু করে বাসন মাজছিল, মুখ তুলে ওর দিকে চেয়ে বিস্ময়ের সুরে বললে, কি রে ?

—আচ্ছা, তোমার চেহারা দেখলে কে বলবে তোমার বয়স হয়েছে ! তোমাকে দেখে, আমিমেয়েমানুষ, আমারই চোখের পলক পড়ে না শরৎদি—সত্যি-সত্যি বলছি। রাজকন্যে মানায় বটে।

শরৎ সলজ হাসি হেসে বললে, দুর বাঁদরী !

—মিথ্যে বলিনি শরৎদি—এতটুকু বাড়িয়ে বলছি নে—

—কেন নিজের দিকে তাকিয়ে বুঝি কথা বলিস্ নে ?

—আর লজ্জা দিয়ো না দিদি, তোমার পায়ে পড়ি। অনেক তাকিয়ে দেখেছি, কাজেই ওকথা মনে সর্বদাই জেগে থাকে। ওকথা তুলে আর কেন মন খারাপ করিয়ে দাও ?

শরৎ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে একটু ইতস্তত করে বললে—একটা কথা বলব রাজলক্ষ্মী ?

—কি শরৎদি ?

—আমায় অমন কথা আর বলিস্ নে। কে কোথায় থেকে শুনবে আর কি ভাববে। এ গাঁ বড় খারাপ হয়ে উঠেছে ভাই।

—কেন শরৎদি এ কথা বললে ?

—তোকে এতদিন বলিনি, কাউকে বলিনি বুঝলি ?কিন্তু যখন কথাটা উঠলই, তখন তোর কাছে বলি।

—কি কথা বলে ফেল না ঝাঁ করে। হাঁ করে তোমার মুখের দিকে কতক্ষণ চেয়ে থাকব—

—এ গাঁয়ের কতকগুলোপোড়ারমুখো ড্যাকরা জুটেছে, তাদের মা বোন জ্ঞান নেই—সেগুলোর জ্বালায় আমার সন্দের সময় উত্তর দেউলে পিদিম দিতে যাবার যদি জো থাকে—সেগুলো কবে ষাঁড়াতলার ঘাটসই হবে তাই ভাবি—

রাজলক্ষ্মী অবাক হয়ে শরতের মুখের দিকে চেয়ে বললে, বলো কি শরৎদি। এ কথা তো কোনো দিন শুনিনি তোমার মুখে। কবে দেখেছ ?কি করে তারা ?

—কি করে আবার—উত্তর দেউলে অন্ধকারে লুকিয়ে থাকে, ছাতিমবনের মধ্যে ফিস্‌ফিস্ করে। রোজ নয়, মাঝে মাঝে প্রায়ই করে। এই কালও তো করেছিল।

—কাল ?

—কালই। প্রভাসদা উঠে চলে গেল, তখন প্রায় বেলা গড়িয়ে গিয়েছে। আমি উত্তর দেউলে গেলাম সন্দে দেখাতে, আর অমনি শুনি মন্দিরের পশ্চিম গায়ে দেওয়ালের ওপাশে কার পায়ের শব্দ অন্ধকারে—

—বলো কি শরৎদি ! আমার শুনে যে গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠেছে। তোমার ভয় করল না ?

—আমার গা-সওয়া হয়ে গিয়েছে ভাই। আর বছর সারা বর্ষাকাল অমনি করে মরেছে পোড়ারমুখোরা—তাদের যমে ভুলে আছে—আবার শুরু করেছে এই কদিন—

—তার পর, কি হল ?

—কি আর হবে, সাহস নেই এক কড়ার। হেই করলে কুকুরের মতো পালিয়ে যায়। একবার যদি দেখতে পাই—তবে দেখিয়ে দিই কার সঙ্গে তারা লাগতে এসেছে। বঁটি দিয়ে নাক কেটে ছাড়ি—

—জ্যাঠামশায়কে বলো না কেন ?

—বাবাকে ?পাগল ! উনি কিছু করতে পারবেন না, মাঝে পড়ে গাঁয়ে ঢাক বাজিয়ে বেড়াবেন। মন্দ লোকে পাঁচ কথা বলবে।

—বাবাকে কি ধর্ম্মদাসকে বলব তবে ?

—না ভাই, কাউকে বলবি নে। পাঁচ জনে পাঁচ রকম কথা ওঠাবে। গাঁয়ের লোক বড় খারাপ, জানো তো সবই। কাকারা করতে যাবেন ভালো ভেবে, হয়ে যাবে উলটো। তা ছাড়া তাঁরা করবেনই বা কি ?চোখে তো কাউকে দেখিনি।

—আচ্ছা সন্দেহ হয় কারো ওপরে শরৎদি ?

শরৎ চুপ করে নিচু মুখে বাসন মাজতে লাগল।

রাজলক্ষ্মী বললে, বলো না শরৎদি, কাউকে সন্দেহ করো ?

—কার ভাই নাম করব—যখন চোখে দেখিনি। তবে সন্দেহ আমার হয় কার ওপর তা বলতে পারি, তুই কিন্তু কারো কাছে কিছু বলতে পারবি নে। কীর্তি মুখুজের ভাগ্নে অনাদি ছোঁড়াটার চালচলন অনেক দিন থেকে খারাপ দেখছি। রাস্তাঘাটে যখন দেখা হয়—তখন কেমন হাঁ করে মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে, শিস্ দেয়—আর ওই বটুক মুখপোড়াটাকেও আমার সন্দেহ হয়।

—বটুক-মামা ?তার তো বয়েস হয়েছে অনেক—তবে—

—বয়েস হয়েছে তাই কি ?আমিও তো দাদা বলে ডাকি। ও লোক কিন্তু ভালো না।

—সে আমিও একটু একটু না জানি এমন নয় শরৎ দিদি—একদিন হয়েছে কি শোনো তবে বলি। আমি আসছি হারান চক্কত্তিদের বাড়ি থেকে—ঠিক দুপুর বেলা, ঘোষেদের কাঁটালবাগানে এসে বটুক মামার সঙ্গে দেখা—

শরৎ বাধা দিয়ে বললে, থাকগে—ওসব কথা আর শুনে কি করব ?ওসব শুনলে রাগে আমার সর্বশরীর রি-রি করে জ্বলে। তবে ওরা এখনো আমায় চিনতে পারেনি। কাউকে কিছু বলবার দরকার নেই আমার। শাস্তি যেদিন দেব, সেদিন নিজের হাতে দেব। মুখপোড়াদের শিক্ষে সেদিন ভালো করেই হবে। তবে একটা কথা বলি—যাদের নাম করলাম, তাদের সন্দেহ করি এই পর্যন্ত। ওরা কিনা আমি ঠিক জানি নে—চোখে তো দেখতে পাইনি কাউকে। অন্যায় দোষ দিলে ধম্মে সইবে না।

রাজলক্ষ্মী প্রশংসমান দৃষ্টিতে শরতের সুগঠিত সুন্দর দেহের দিকে চেয়ে চেয়ে বললে—সে যদি কেউ পারে, তবে তুমিই পারবে শরৎদি, তা আমি জানি। তোমায় দেখলে আমাদের মনে সাহস আসে।

শরৎ দুষ্টুমির হাসি হেসে রাজলক্ষ্মীর মুখের দিকে সুন্দর ভঙ্গিতে চেয়ে বলল—ইস্ ! বলিস্ কি রে ! সত্যি ?সত্যি নাকি ?

রাজলক্ষ্মীও উৎসাহের সুরে হাসিমুখে বললে, বাঃ, কি সুন্দর দেখাচ্ছে তোমায় শরৎ দিদি ?কি চমৎকার ভাবে চাইলে ?আমারই মন কেমন করে ওঠে, তবুও আমি মেয়েমানুষ।

শরৎ কৃত্রিম কোপের সঙ্গে বললে, আবার। বারণ করে দিলাম না ?ওসব কথা বলবি নে। মেয়ের এদিকে নেই ওদিকে আছে ! চল্ বাসনগুলো কিছু নে দিকি হাতে করে—বেলা আর নেই। এখন ছিষ্টির কাজ বাকি !

বাড়ি ফিরে রাজলক্ষ্মী বললে, চলে যাই শরৎ দিদি—সন্দে হলে যেতে ভয় করবে।

শরৎ তাকে যেতে দিলে না। বললে—ও কি রে ! তোকে কিছু খেতে দিলাম না যে ?তা হবে না।এইবার চা করি, আর কিছু খাবার করি।

—না শরৎদি, পায়ে পড়ি ছেড়ে দাও আজ। আর একদিন এসে খাব এখন।

শরৎ কিছুতেই শুনলে না—কখনো সে রাজলক্ষ্মীকে কিছু না খাইয়ে ছেড়ে দেয় না, নিজে সে গরিব ঘরের মেয়ে, রাজলক্ষ্মীর দুঃখ ভালো করেই বোঝে। বাড়িতে হয়তো বিকেলে খাবার কিছুই জোটে না—আগে এখানে, গল্প করে—ওকে খাওয়াতে পারলে শরতের মনে তৃপ্তি হয় বড়। শরৎ চা করে দিলে ওকে, নিজের জন্যে একটা কাঁসার গ্লাসে ঢেলে নিলে। হালুয়া করে ওকে কিছু দিয়ে বাকিটা বাবার জন্য রেখে দিলে।

রাজলক্ষ্মী বললে, ওকি শরৎদি, তুমি নিলে না ?

—আমি একবারে সন্দের পরই তো খাব। এখন খেলে আর খিদে পায় না, তুই খা।

রাজলক্ষ্মী চা ও খাবার পেয়ে একটু খুশিই হল। বললে, কি সুন্দর হালুয়া তুমি করো শরৎদি—

—যাঃ, আমার সবই তো তোর ভালো !

—তা ভালো লাগলে বলব না ?বা রে—তোমার সবই আমার যদি ভালো লাগে, তবে কি করি বলো না ?

—আমারও ভালো লাগে তুই এলে, বুঝলি ?এই নিবান্দা পুরীর মধ্যে একটা মুখটি বুজে সদাসর্বদা থাকি, কেউ এলে গেলে বড় ভালো লাগে। বাবা তো সব সময় বাড়ি থাকেন না—তোর সঙ্গে বেশ একটু গল্পগুজব করে বড় আমোদ পাই।

—আমারও শরৎদি ! গাঁয়ের আর কোনো মেয়ের সঙ্গে মিশে তেমন আমোদ পাই নে, তাই তো তোমার কাছে আসি।

রাজলক্ষ্মীর বিবাহের বয়স পার হয়েছে—কিন্তু বাপ-মায়ের পয়সার জোর না থাকায় এখনো কিছু ঠিকঠাক হয়নি। শরতের মনে এটা সর্বদাই ওঠে, যেন তার নিজেরই কন্যাদায় উপস্থিত।

কেদারকে দিয়ে শরৎ দু-এক জায়গায় কথাবার্তা তুলেছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত পয়সাকড়ির জন্যে সে-সব সম্বন্ধ ভেঙে যায়। আজ দিন দশ-বারো হল, কেদার আর একটা সম্বন্ধ এনেছিলেন—শরতের শুনে মনে হয়েছে সেখানে হলে ভালোই হয়। পূর্বে এ নিয়ে একবার দুই সখীর মধ্যে কথাবার্তা হয়েছে।

আজও শরৎ বললে—ভালো কথা, রাজলক্ষ্মী—আসল ব্যাপারের কি করবি বল—

রাজলক্ষ্মী না বুঝতে পারার ভান করে বললে—কি ব্যাপার আসল ?

—তোকে যে-কথা সেদিন বললাম। সাঁতরা পাড়ার সেই সম্বন্ধটা—

রাজলক্ষ্মী মনে মনে খুশি হয়ে উঠল। মুখে বললে—যাঃ, আর ও-সবে দরকার নেই। বেশ আছি। কেন তাড়িয়ে দেবে শরৎদি ?

—না, ও-সব চালাকি রাখ দিকি। এখন আমায় বল, বাবাকে কি বলব ?

যার সঙ্গে বিবাহের প্রস্তাব উঠেছে তার সম্বন্ধে সব কথা রাজলক্ষ্মী ইতিপূর্বে দুবার শুনেছে শরতেরই মুখে—তবুও তার ইচ্ছে হল আর একবার সেকথা শোনে।

শুনতে লাগে ভালোই। তবুও কিছু নূতনত্ব।

সে তাচ্ছিল্যের সুরে বললে, ভারি তো সম্বন্ধ ! ছেলে কি করে বলেছিলে ?

শরৎ বললে, নৈহাটিতে পাটের কলে চাকরি করে, শুনেছি মাকে নিয়ে নৈহাটিতেই বাসা করে থাকে।

রাজলক্ষ্মী ঠোঁট উলটে বললে, পাটের কলে আবার চাকরি। তুমিও যেমন !...

রাজলক্ষ্মী কথাটা বললে বটে, কিন্তু তার মনে হল এ সম্বন্ধ খারাপ নয়। ছেলেটির বিষয়ে আরো কিছু জানবার তার খুব কৌতূহল হল, কেমন দেখতে, কত টাকা মাইনে পায়, বাড়িতে আর কেউ আছে কিনা।

শরৎ কিন্তু সে দিক দিয়েও গেল না। বললে, তা তো বুঝলাম, তোর খুব উঁচু নজর। কিন্তু জজ মেজেস্টার পাত্র এখন পাওয়া যাচ্ছে কোথায় বল ? অবস্থা বুঝে তো ব্যবস্থা ? কি মত তোর ?

রাজলক্ষ্মী চুপ করে থেকে বললে, ভেবে বলব শরৎদি—আচ্ছা কি পাশ বলেছিলে যেন সেদিন ?

খানিকক্ষণ এ-সম্বন্ধে কথা চলে যদি, বেশ লাগে। শরৎ বলে, ম্যাট্রিক পাশ।

—মোটে।

—অমন কথা বলিস নে। দু-তিনটে পাশ পাত্র কি পাওয়া সহজ ?এতগুলো টাকা চাইবে।

—আচ্ছা, পাটের কল কি রকম শরৎদি ?

শরৎ হেসে বললে, আমি তো আর দেখিনি কখনো। তোরও পরের মুখে ঝাল খাওয়ার দরকার কি, একেবারে নিজের চোখেই তো দেখবি।

—যাঃ, শরৎদি যেন কি !

শরৎ হাসতে হাসতে বললে, আচ্ছা শোন, তুই যে বলছিস ম্যাট্রিক পাশ কিছুই না— দু-তিনটে পাশ ছেলের সঙ্গে তোর বিয়ে দিলে তুই কথা বলতে পারবি তার সঙ্গে ?

—কেন পারব না, দেখে নিয়ে—

গল্পে দুজনে উন্মত্ত, কখন ইতিমধ্যে সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছে, বাইরে বেশ অন্ধকার নেমেছে, ওরা খেয়ালই করেনি। ছাতিমবনে শেয়াল ডেকে উঠলে ওদের চমক ভাঙল।

রাজলক্ষ্মী ব্যস্ত হয়ে বলে উঠল, ও শরৎদি, একেবারে অন্ধকার ছেয়ে গেল যে ! আমি কি করে যাব ?

—বোস্ না। বাবা এলে তোকে বাড়ি দিয়ে আসবেন এখন।

—না শরৎদি আমি যাই, তুমি গড়ের খাল পার করে দিয়ে এসো আমায়—বাকি পথ ঠিক যাব। আমার যত ভয় এই গড়ের মধ্যে।

—আর আমি একলাটি এখন কতক্ষণ পর্যন্ত বসে থাকব তার ঠিক আছে ?বাবা যে কখন ফিরবেন ! তুই থাকলে বড্ড ভালো হত। থাক্ না লক্ষ্মীটি—আর একটু চা খাবি ?

কিন্তু রাজলক্ষ্মী আর থাকতে চাইল না। বেশি রাত পর্যন্ত বাইরে থাকলে মা ভারি বকবে। একলাটি অন্ধকারে যেতে ভয়ও করে। কেদার-জ্যাঠার আসবার ভরসায় থাকতে গেলে দুপুররাত হয়ে যাবে, বাপ রে !

কেরোসিনের টেমি ধরে শরৎ গড়ের খাল পর্যন্ত রাজলক্ষ্মীকে এগিয়ে দিল। রাজলক্ষ্মী খাল পার হয়ে ওপারের রাস্তায় উঠে বলে, তুমি যাও শরৎদি, গোয়ালাদের বাড়ির আলো দেখা যাচ্ছে— আর ভয় নেই।

যেতে যেতে সে ভাবছিল, নৈহাটি কেমন জায়গা না জানি !

সংসারে বেশি ঝামেলা না থাকাই ভালো।

ম্যাট্রিক পাশ ছেলে মন্দ নয়।

ছেলের রংটা কালো না ফর্সা ?

চার

শীত কমে গিয়েছে—বসন্তের হাওয়া দিতে শুরু করার সঙ্গে সঙ্গে সজনে গাছে থোকা থোকা ফুল দেখা দিয়েছে।

কেদার নিজের গ্রামেই একটি কৃষ্ণযাত্রার দল খুলেছেন। সম্প্রতি এ অঞ্চলে কৃষ্ণযাত্রার একটা হিড়িক এসে পড়েছে—গত পুজোর সময় থেকে এর সূত্রপাত ঘটে, বর্তমানে মহামারীর মতো গ্রামে গ্রামে হুজুক ছড়িয়ে পড়েছে। কেদার হট্‌বার পাত্র নন, তাঁর গ্রামকে ছোট হয়ে থাকতে দেবে কেন—জেলেপাড়া, কামারপাড়া এবং কুমোরপাড়ার লোকজন জুটিয়ে তিনিও এক দল খুলে মহা উৎসাহে মহলা আরম্ভ করেছেন। স্নানাহারের সময় নেই তাঁর, ভারি ব্যস্ত। সম্প্রতি তাঁর দলের গাওনা হবে চৈত্রমাসে অন্নপূর্ণা পূজার দিন, গ্রামের বারোয়ারি তলায়। বেশি দেরি নেই, দেড় মাস মাত্র।

সীতানাথ জেলের বাড়ির বাইরে বড় ছ-চালা ঘর। যাত্রার দলের মহলা এখানেই রোজ বসে। অন্য সকলের আসতে একটু রাত হয়, কারণ সবাই কাজের লোক—কাজকর্ম সেরে আসতে একটু দেরিই হয়ে পড়ে। কেদারের কিন্তু সন্ধ্যা হতে দেরি সয় না, তিনি সকলের আগে এসে বসে থাকেন।

সীতানাথ বাড়ি নেই—শীতকালের মাঝামাঝি নৌকো করে এখান থেকে পাঁচ দিনের পথ চূর্ণী নদীতে মাছ ধরতে গিয়েছে—এখনো দেশে ফেরেনি।

সীতানাথের বড় ছেলে মানিক বাড়িতে থাকে ও গ্রামের নদীতেই মাছ ধরে স্থানীয় হাটে বিক্রি করে সংসার চালায়। আজ পুরো মহলা হবে বলে সে সকাল সকাল নদী থেকে ফিরে এসে বাইরের ঘরে বড় বড় খানকতক মাদুর ও চট পেতে আসর করে রেখেছে।

কেদারকে বললে, বাবাঠাকুর, তামাক কি আর এক বার ইচ্ছে করবেন ?

—তা সাজ না হয় একবার। হ্যাঁরে মানকে, এরা এখনো সব এল না কেন ?

—আসছে বাবাঠাকুর, সবাই কাজ সেরে আসছে তো, একটু দেরি হবে।

—তুই তামাক সেজে একবার দেখে আয় দিকি বিশু কুমোরের বাড়ি। ওর ছেলেটাকে না হয় ডেকে আন। সে রাধিকা সাজবে, তার গানগুলো ততক্ষণ বেহালায় রপ্ত করে দিই—

কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে জন দুই অভিনেতা ঘরে ঢুকল—একজন ছিবাস মুদি আর একজন হৃষিকেশ কর্মকার।

কেদার খুশিতে উৎফুল্ল হয়ে বললেন, আরে ছিবাস যে ! এই যে রিষিকেশ, এসো এসো—তোমরা না এলে তো রিয়্যাশাল আরম্ভ হয় না। বেশ ভালো করেছ—বসো।

মানিক ততক্ষণ তামাক সেজে কেদারের হাতে দিয়ে বললে, তামাক ইচ্ছে করুন !

কেদারের মনে অকস্মাৎ তুমুল আনন্দের ঢেউ বয়ে গেল। বাইরের ঝিরঝিরে মিঠে ফাল্গুনের হাওয়ায় আমের বউলের সুঘ্রাণ, একটা আঁকোড় ফুলের গাছে সাদা ফুল ধরেছে—সামনে এখন অর্ধেক রাত পর্যন্ত গানবাজনার গমগমে আসর, কত লোকজন, ছেলে-ছোকরা আসবে, মানুষের জীবনে এত আনন্দও আছে !

তামাক খেতে খেতে কেদার খুশির আতিশয্যে বলে উঠলেন, ওহে রিষিকেশ, এদিক এসে—ততক্ষণ তোমার আয়ান ঘোষের পার্টটা একবার মুখস্ত বলে যাও শুনি—

কেদারের হুকুম অমান্য করবার সাধ্য নেই কারো এ আসরে। হৃষিকেশ কর্মকার দু-একবার ঢোঁক গিলে, দু-একবার ঘরের আড়ার দিকে তাকিয়ে বিপন্ন মুখে বলতে শুরু করলে—"অদ্য পৌর্ণমাসী রজনী, যমুনা পুলিনের কি অদ্ভুত শোভা ! কিন্তু অহো ! আমার হৃদয়ে সহস্র বৃশ্চিকদংশনের মতো এরূপ মর্মঘাতী জ্বালা অনুভব করিতেছি কেন ?—কোকিলের কুহু-ধ্বনি আমার কর্ণকুহরে—

—আঃ দাঁড়াও দাঁড়াও, অমন নামতা মুখস্ত বলে গেলে হবে না। থেমে দমক দিয়ে দিয়ে বললা—কাঠের পুতুলের মতো অমন আড়ষ্ট হয়ে থাকার মানে কি ?হাত-পা নড়ে না ?

এই সময় কয়েকজন লোক এসে ঢুকল। কেদারের ঝোঁক গানবাজনার দিকে, শুধু বক্তৃতার তালিম তাঁর মনে পুরো আনন্দ দিতে পারেনি এতক্ষণ, নবাগতদের মধ্যে বিশ্বেশ্বর পালের ছেলে নন্দকে দেখে তিনি হঠাৎ অতিমাত্রায় খুশি হয়ে উঠলেন।

—আরে ও নন্দ, এত দেরি করে এলি বাবা, তবেই তুই রাধিকা সেজেছিস। বারোখানা গান তোমার পার্টে, আজই সব তলিম দেওয়া চাই, নইলে আর কবে কি হবে শুনি ?বোস, বেয়ালা বেঁধে নি—গানগুলো আগে হয়ে যাক।

দু-একজন ক্ষীণ আপত্তি তুলবার চেষ্টা করলে। ছিবাস মুদির নন্দ ঘোষের পার্ট, সে বললে, এ্যাক্টোর সঙ্গে সঙ্গে গান চললে এখানে গানগুলো ভালো রপ্ত হয়ে যেত বাবাঠাকুর—নইলে এ্যাক্টো আড়ষ্ট মেরে যাবে যে !

কেদার মুখ খিঁচিয়ে বললে, থামো না ছিবাস। বোঝো তো সব বাপু—কিসে কি হয় সে আমি খুব ভালো জানি। একানে গান আগে না তালিম দিয়ে নিলে শেষকালে এ্যাক্টোর সময় গান গাইতে গেলে ভয়েই গলা শুকিয়ে যাবে। তুমি তোমার নিজের পাট দ্যাখো গিয়ে বাইরে বসে—

ছিবাস ধমক খেয়ে অপ্রতিভ হয়ে গেল। এর পরে আর কেউ কোনো প্রকার প্রতিবাদ করতে সাহস করলে না, কেদারের মুখের ওপর প্রতিবাদ কখনো বড় একটা করেও না কেউ।

সুতরাং গান-বাজনা চলল পুরোদমে।

ক্রমে সব লোক এসে জড়ো হয়ে গেল—ঘরে বসবার জায়গা দিতে পারা যায় না। বাইরের দাওয়ায় গিয়ে অনেকে বসল। বাইরে যাবার আরো একটা কারণ এই, এদের মধ্যে বেশির ভাগ ছেলেছোকরা ও বাইশ-তেইশ থেকে ত্রিশ-বত্রিশ বছরের যুবক, এরা কেদারের সামনে বিড়ি বাতামাক খায় না—অথচ বেশিক্ষণ ধূমপান না করে তারা থাকতেও পারে না, বাইরের দাওয়া আশ্রয় করা ছাড়া তাদের গত্যন্তর নেই।

গানে বাজনায় বক্তৃতায় গল্পে এবং সঙ্গে সঙ্গে তামাক ও বিড়ির ধোঁয়ায় মহলাঘরের বাতাস ভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছে, এমন সময় দূরে কিসের চিৎকার শোনা গেল।

কে একজন বললে, ও ছিবাস জ্যাঠা—চৌকিদার হাঁকছে যে বামুনপাড়ায়, অনেক রাত হয়েছে তবে !

দু-একজন উৎকর্ণ হয়ে শুনে বললে, তাই তো, রাতটা বেশি হয়ে গিয়েছে। বাবাঠাকুর, আজ বন্ধ করে দিলে হত না ?আপনি আবার এতটা পথ যাবেন—

বিশু কুমোরের ছেলে এ পর্যন্ত গোটা আষ্টেক গানের তালিম দিয়ে এবং কেদারের কাছে বিস্তর ধমক খেয়ে বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল—সে করুণ দৃষ্টিতে কেদারের দিকে চাইলে।

কেদার বললেন, ঘুম আসছে, না ?তোর কিছু হবে না বাবা। কুমোরের ছেলে, চাক ঘোরাবি, ভাঁড় আর তিজেল হাঁড়ি গড়বি, তোর এ বিড়ম্বনা কেন বল্ দিকি বাপু ?সেই সন্দে থেকে তোকে পাখিপড়া করছি, এখনো একটা গানও নিখুঁত করে গলায় আনতে পারলি নে—তোর গলায় নেই সুর তার কোত্থেকে কি হবে ?বেসুরো গলা নিয়ে গান গাওয়া চলে ?

আসলে তো একথা ঠিক নয়। বিশু ছেলেটি বেশ সুকণ্ঠ গায়ক, সবাই জানে, কেদারও তা ভালোই জানেন—কিন্তু তিনি বড় কড়া মাস্টার এবং তাঁর কথা বলবার ধরনই এই। ছেলেটির এ রকম তিরস্কার গা-সওয়া হয়ে গিয়েছে, সুতরাং সে কেদারের কথায় দুঃখিত না হয়ে বললে—দাদাঠাকুর, বাড়িতে মার অসুখ—বাবা সকাল সকাল যেতি বলে দিয়েল—

—তা যা যা। আজ তবে থাক এই পর্যন্ত, কাল সবাই সকালে সকালে আসা হয় যেন। চল হে ছিবাস, চল হে রিষিকেশ—

নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও কেদার উঠে পড়লেন, হুঁশ না করিয়ে দিলে তিনি আরো কতক্ষণ এখানে থাকতেন কে জানে !

কিন্তু মহলা-ঘরের বাইরে পা দিয়ে তিনি একটু অবাক হয়ে বললেন, একি, হ্যাঁ ছিবাস, জ্যোৎস্না উঠে গিয়েছে যে !

—আজ্ঞে হ্যাঁ বাবাঠাকুর, তাই তো দেখছি—

—তাই তো হে, আজ নবমী না ?কৃষ্ণপক্ষের নবমী, ওঃ অনেক রাত হয়ে গিয়েছে তা হলে।

পথে কিছুদূর পর্যন্ত একসঙ্গে এসে বিভিন্ন পাড়ার দিকে একে একে সবাই বেরিয়ে গেল কেদারকে ফেলে। দু-তিনজন কেদারকে বাড়ি পর্যন্ত এগিয়ে দিতে চাইলে কিন্তু কেদার সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে একাই বাড়ির দিকে চললেন। গড়ের খালপার হবার সময় নিশীথ রাত্রির জ্যোৎস্নালোকিত বনঝোপের দিকে চেয়ে চেয়ে কেদারের বেশ লাগল। কেদারের পিতামহ রাজা বিষ্ণুরামের স্বহস্তে রোপিত বোম্বাই আমের গাছে প্রচুর বউল এসেছে এবার—তার ঘন সুগন্ধে। মাঝরাত্রির জ্যোৎস্নাভরা বাতাস যেন নেশায় ভরপুর, ভারি আনন্দে জীবনের দিনগুলো কেটে যাচ্ছে মোটের উপর তাঁর। সকাল থেকে এত রাত পর্যন্ত সময় যে কোথা দিয়ে কেটে যায় তা তিনি বুঝতেই পারেন না।

কি চমৎকার দেখাচ্ছে জ্যোৎস্নায় এই গড়বাড়ির জঙ্গল, ভাঙা ইট-পাথরের ঢিবিগুলো ! সবাই বলে নাকি অপদেবতা আছে, তিনি বিশ্বাস করেন না। সব বাজে কথা।

কই এত রাত পর্যন্ত তো তিনি বাইরে থাকেন, একাই আসেন বাড়ি, কখনো কিছু তো দেখেননি ! বাল্যকাল থেকে এই বনে-ঘেরা ভাঙা বাড়িতে মানুষ হয়েছেন, এর প্রত্যেক ইটখানা, প্রত্যেক গাছটি, বনের লতাটি তার প্রিয় ও পরিচিত। তার অস্তিত্বের সঙ্গে এরা জড়ান, তিনি যে চোখে এদের দেখেন, অন্য লোকে সে চোখ পাবে কোথায় ?

কষ্ট হয় শরতের জন্যে।

ওকে তিনি কোনো সুখে সুখী করতে পারলেন না। ছেলেমানুষ, ওর জীবনের কোনো সাধপুরল না। সারাদিনের কাজকর্ম ও আমোদ-প্রমোদের ফাঁকে ফাঁকে শরতের মুখখানা যখন তাঁর মনে পড়ে হঠাৎ, তখন বড় অন্যমনস্ক হয়ে যান কেদার। যেখানেই থাকুন, মনে হয় এখনি ছুটে একবার তার কাছে চলে যান।

আহা, এত রাত পর্যন্ত মেয়েটা একা জঙ্গলে-ঘেরা বাড়ির মধ্যে থাকে, কাজটা ভালো হচ্ছে না —ঠিক নয় কেদারের এতক্ষণ বাইরে থাকা।

দোরে ঘা দিয়ে কেদার ডাকলেন, ও শরৎ, মা ওঠো, দোর খোলো—

দু-তিনবার ডাকের পর শরতের ঘুমজড়িত কণ্ঠের ক্ষীণ সাড়া পাওয়া গেল।

—উঠে দোর খুলে দে—ও শরৎ—

শরৎ বিরক্তিভরা মুখে দোর খুলতে খুলতে বললে, আমি মরব মাথা কুটে কুটে তোমার সামনে বাবা। পারিনে আর—সন্দে হয়েছে কি এ যুগে ! রাত কাবার হয়ে গেল—এখন তুমি বাড়ি এলে ! পুবে ফর্সা হবার আর বাকি আছে ?

—না না, আরে এই তো বামুনপাড়ার চৌকিদার হেঁকে গেল—রাত এখনো অনেক আছে। আর বকিস নে, এখন ভাত দে দিকি। খিদে পেয়েছে যা—

কেদার খেতে বসলে শরৎ ঝাঁঝের সঙ্গে জিজ্ঞেস করলে, কোথায় ছিলে এতক্ষণ ?

—কোথায় আর থাকব ?আমাদের দলের মহলা হচ্ছে, সেখানে আমি না থাকলেই সব মাটি। যেদিকে আমি না যাব সেদিকেই কোনো কাজ হবে না।

শরৎ একটু নরম সুরে বললে, যাত্রা কোথায় হবে ?আমি কিন্তু যাব তোমার সঙ্গে।

—তা ভালোই তো। বাড়ির মেয়েদের জন্যে চিক দিয়ে দেবে, যাবি তো ভালোই।

শরৎ একটু চুপ করে থেকে বললে, বাবা, আজ প্রভাসদা এসেছিল।

কেদার বিস্ময়ের সুরে বললেন, কোথায় ?কখন ?

—তুমি বেরিয়ে চলে গেলে, তার একটু পরেই। এখানে এসে বসল। তার সঙ্গে আর একজন ওর বন্ধু। দু জনকে চা করে দিলাম—খাবার কিছু নেই, কি করি—একটুখানি ময়দা পড়েছিল, তাই দিয়ে খানকতক পরোটা ভেজে দিলাম।

—বেশ বেশ। কতক্ষণ ছিল ?

— অনেকক্ষণ—প্রায় ঘণ্টাতিনেক। সন্ধ্যা হবার পরও খানিকক্ষণ ছিল।

—কি বলে গেল ?

—বেড়াতে এসেছিল। প্রভাসদা'র বন্ধু কলকাতায় কোনো বড়লোকের ছেলে, বেশ চেহারা। নাম অরুণ মুখুজ্যে। আমাদের গড়বাড়ির গল্প শুনে সে এসেছিল প্রভাসদা'র সঙ্গে দেখতে। অনেকক্ষণ ঘুরে ঘুরে দেখলে।

—বড়লোকের কাণ্ড, তুইও যেমন ! ঘরে পয়সা থাকলেই মাথায় নানা রকম খেয়াল গজায়। তার পর, দেখে কি বললে ?

—খুব খুশি। আমাদের এখানে এসে কত রকম কথা বলতে লাগল, অরুণবাবু আবার আসবে, ফটোগ্রাফ নিয়ে যাবে ! কি লিখবে নাকি আমাদের গড়বাড়ি নিয়ে। আমায় তো একবারে মাথায় তুললে।

—ওই তো বললাম, বড়লোকের যখন যেটি খেয়াল চাপবে। কলকাতায় মানুষের অভাব নেই—আমাদের মতো দুঃখ-ধান্দা করে যদি খেতে হত—

শরতের হাসি পেল বাবার দুঃখ-ধান্দা করে খাবার কথায়। জীবনে তিনি তা কখনো করেননি। কাকে বলে তা এখনো জানেন না। কিসে কি হয় তা শরৎ ভালো করেই জানে।

যেমন আজকের দিনের কথা। শরৎ হুবহু সত্য কথা বলেনি। ঘরে কিছুই ছিল না। ওরা গেল ভাঙা ইট কাঠ দেখতে, গড়বাড়ি ঘুরতে—সেই ফাঁকে শরৎকে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে হল রাজলক্ষ্মীদেরবাড়ি ময়দা ও ঘি ধার করতে। সেখানে পাওয়া গেল তাই মান রক্ষে। সব দিন আবার সেখানেও পাওয়া যায় না।

রাজলক্ষ্মী ওদের কথা শুনে দেখতে এসেছিল। সে-ই চা ও খাবার পরিবেশন করেছিল প্রভাস ও তার বন্ধুকে।

আর একটা কথা শরৎ বলেনি বাবাকে। প্রভাস ওকে একটা মখমলের বাক্স দিয়ে গিয়েছে। কেমন চমৎকার বাক্সটা ! তার মধ্যে গন্ধতেল, এসেন্স, পাউডার আরো সব কি কি ! না নিলে প্রভাসদা কি মনে করবে, সে বাক্সটা হাত পেতে নিয়েছিল—কলকাতার ছেলে, ওরা হয়তো বোঝে নাযে বিধবা মানুষের ওসব ব্যবহার করতে নেই। তার যে কোনো বিষয়ে কোনো সাধ-আহ্লাদ নেই, সব বিষয়ে সে নিস্পৃহ, উদাসী—কেমন এক ধরনের ! এ বয়সেই মেয়ের সন্ন্যাসিনী মূর্তি—তার বাবার ভালো লাগে না। শরৎ তা জানে। বাবাকে বলে কি হবে বাক্সটার কথা, যখন সেটা সে রাখবে না !

কেদার আহারান্তে তামাক খেতে বসলেন বাইরের দাওয়ায়।

শরৎ বলল, বাইরে কেন বাবা, ঘরে বসে খাও না তামাক, আজকাল রাত্তিরে বেশ ঠাণ্ডা পড়ে। দিনে গরম রাতে ঠাণ্ডা যত অসুখের কুটি।

গভীর রাত্রি।

বিছানায় শুয়ে একটা কথা তার মনে হল বার বার। এর আগেও অনেক বার মনে হয়েছে। প্রভাসদার বন্ধু অরুণবাবুর চেহারা বেশ সুন্দর, অবস্থাও ভালো। রাজলক্ষ্মীর সঙ্গে ওর বিয়ে দেওয়া যেত !

রাজলক্ষ্মী এল তিনদিন পরে।

সে গড়ের বনে সজনে ফুল কুড়ুতে এসেছিল, কোঁচড় ভর্তি করে ফুল কুড়িয়ে বাড়ি ফিরবার পথে শরতের রান্নাঘরে উঁকি মেরে বললে, ও শরৎদি, সজনে ফুল রাখবে নাকি ?কত ফুল কুড়িয়েছি দ্যাখো—তোমাদের ওই পুকুরের কোণের গাছে।

শরৎ রান্না চড়িয়েছিল, ব্যস্তভাবে খুশির সুরে বললে, ও রাজলক্ষ্মী আয় আয়, দেখি কেমন ফুল ?আয় তোকে আমি খুঁজছি ক'দিন। কথা আছে তোর সঙ্গে।

একটা ছোট চুবড়ি এনে বললে, দে এতে চাট্টি ফুল। বেশ কুঁড়ি কুঁড়ি ফুলগুলো, ভাজব এখন। বাবা বড্ড খেতে ভালোবাসেন।

—শরৎদি, আমাদের ওদিকে তুমিও তো যাও না ক'দিন ?

—না ভাই, বাবার পায়ে বাত মতো হতে ক'দিন কষ্ট পেলেন। তাঁর তাপসেঁক—আবার এদিকে সংসারের ছিষ্টি কাজ, এর পরে সময় পাই কখন যে যাব বল্ ! চা খাবি ?

—না শরৎদি, বেলা হয়ে গেল—আর বেশিক্ষণ থাকলে এবেলা ফুলগুলো ভাজা হবে কখন ?এ বেলা যাই—ও বেলা বরং আসব।

—দাঁড়া, তোর জন্যে একটা জিনিস রেখে দিয়েছি, নিয়ে যা—

শরৎ মখমলের বাক্সটা এনে ওর হাতে দিয়ে বললে, দ্যাখ্ তো কেমন ?খুলে দ্যাখ্—

অপ্রত্যাশিত আনন্দে ও বিস্ময়ে রাজলক্ষ্মীর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল এক মুহূর্তে। বাক্সটা খুলতে খুলতে বললে, কোথায় পেলে শরৎদি ?

—প্রভাসদা দিয়ে গিয়েছিল সেদিন।

রাজলক্ষ্মী শরতের মুখের দিকে চেয়ে বললে, তা তুমি রাখলে না ?

শরৎ মৃদু হেসে বললে, ওর মধ্যে দ্যাখ্ না কত কি—সাবান, পাউডার, মুখে মাখবার ক্রিম্—আমি কি করব ও সব ! তুই নিয়ে গিয়ে রাখলে আমার আনন্দ হবে।

রাজলক্ষ্মী কিছু ভেবে বললে, যদি মা জিজ্ঞেস করে কোথায় পেলি ?

—বলিস্ আমি দিয়েছি !

—এ নিয়ে কেউ কিছু বলবে না তো ?জানো তো নিমু ঠাকরুনকে, গাঁয়ের গেজেট। প্রভাসবাবুর কথা বলব না—কি বলো ?

—সত্যি কথা বলছি, এতে আর ভয় কি ?নিমু ঠান্‌দি এতে বলবে কি ?বলিস প্রভাসবাবু দিয়েছিল শরৎদিকে।

—ভারি খারাপ মানুষ সব শরৎদি। তুমি যত সহজ আর ভালো ভাবো সবাইকে, অত ভালো কেউ নয়। আমার আর জানতে বাকি নেই। সেবার যে এখানে প্রভাসবাবু এসেছিল, এ কথা গাঁয়ে রটনা হয়ে গিয়েছে। কাল যে এসেছিল আবার—তা নিয়েও কাল কথা হয়েছে।

শরৎ বিস্ময়ের সুরে বললে, বলিস্ কি রে ?কি কথা হয়েছে ?

—অন্য কথা কিছু নয় শরৎ দিদি। শুধু এই কথা যে প্রভাসদা তোমাদের বাড়ি আসা-যাওয়া করছে আজকাল। তুমি না হয়ে অন্য মেয়ে যদি হত, তা হলে অনেকে অন্য রকম কথাও ওঠাত—নিমু ঠাকরুন, আমার জ্যাঠাইমা, হীরেন কাকার মা, জগন্নাথ দাদু—এরা। কিন্তু তুমি বলেই কেউ কিছু বলতে সাহস করে না।

শরৎ যাত্রার দলের সুর নকল করে টেনে টেনে হাত নেড়ে বললে, দেশের রাজকন্যার নামে অপকলঙ্ক রটাবে, কার ঘাড়ে ক'টা মাথা ?সব তা হলে গর্দান নেব না দুরাচারদের ?

রাজলক্ষ্মী হি হি করে হেসে লুটিয়ে পড়ে আর কি ! মুখে কাপড় গুঁজে হাসতে হাসতে বললে, উঃ, এত মজাও তুমি করতে জানো শরৎদি ! হাসিয়ে মারলে—মাগোঃ—

শরৎ হাসিমুখে বললে, তবে একটু বসে যা লক্ষ্মী দিদি আমার। দুটো মুড়ি খেয়ে যা—

রাজলক্ষ্মী দুর্বল সুরের প্রতিবাদ জানিয়ে বললে, না শরৎদি—ফুল ভাজা হবে কখন তা হলে এবেলা ?আমায় আটকো না—

—বোস্। আমিও খাচ্ছি দুটো মুড়ি—নারকেল-কোরা দিয়ে। তুইও খাবি। যেতে দিলে তো ?সজনে ফুলের দুর্ভিক্ষ লাগেনি গড়শিবপুরে—

খানিক পরে শরৎ মুড়ি খেতে খেতে বললে, শোন রে, তোর সঙ্গে একটা কথা আছে। অরুণবাবু এসেছিল প্রভাসদার সঙ্গে, দেখেছিস তো ?ওর সঙ্গে তোর বিয়ের কথা পাড়ব প্রভাসদা'র কাছে ?অরুণবাবুরা বেশ অবস্থাপন্ন। বেশ ভালো হবে।

রাজলক্ষ্মী সলজ্জ দৃষ্টিতে শরতের মুখের দিকে চেয়ে বললে, কি যে তুমি বলল শরৎদি ! এক-এক সময় এমন ছেলেমানুষ হয়ে যাও।

ছেলেমানুষ হওয়া কি দেখলি ?

—ওরা আমায় নেবে কেন ?আমার কি রূপগুণ আছে বললো ! তুমি যে চোখে আমায় দ্যাখো—সকলে কি সে চোখে দেখবে ?

—সে ভাবনায় তোর দরকার নেই। তুই শুধু আমায় বল্, প্রভাসদা'র কাছে কথা আমি পাড়ব কিনা। অরুণবাবুকে পছন্দ হয় ?

—দুর—কি যে বলো ! শরৎদি একটা পাগল—

—সোজা কথাটা কি বল্ না ?

—ধরো যদি বলি হয়—তুমি কি করবে ?

—তাই বল্ ! আমি প্রভাসদা'র কাছে তা হলে কথাটা পেড়ে ফেলি।

রাজলক্ষ্মী চুপ করে রইল। শরৎ বললে, বাড়িতে বা অন্য কারো কাছে বলিস্ নে কোনো কথা এখন।

রাজলক্ষ্মী হাত নেড়ে বললে, হ্যাঁ, আমি বলে বেড়াতে যাই, ওগো আমার বিয়ের সম্বন্ধ হচ্ছে সবাই শোনো গো। একটা কথা, জ্যাঠামশাইকে যেন বোলো না শরৎদি।

—বাবাকে ?ও বাপ রে ! এখুনি সারা গাঁ পরগনা রটে যাবে তা হলে। পাগল তুই, তা কখনো বলি ?

রাজলক্ষ্মী বিদায় নিয়ে বাড়ি যাবার পথে গড়ের খাল পার হয়ে দেখলে, কেদার একটা চুপড়িতে আধ-চুপড়ি বেগুন নিয়ে হন্ হন্ করে আসছেন।

ওকে দেখে বললেন, ও বুড়ি, ওঃ কত সজনে ফুল রে !—কোত্থেকে ?তা বেশ। শরতের সঙ্গে দেখা করে এলি তো ?

—হ্যাঁ জ্যাঠামশায়, শরৎদির সঙ্গে দেখা না করে আসবার জো আছে ?আর না খাইয়ে কখনো ছাড়বে না !

হ্যাঁ, ভারি তো খাওয়া ! কি খেতে দিলে ?

—মুড়ি মাখলে, ও খেলে, আমি খেলাম।

—তা যা মা—বেলা হয়ে গেল আবার—

রাজলক্ষ্মী দূর থেকে কেদারকে আসতে দেখে মখমলের বাক্সটা কাপড়ের মধ্যে লুকিয়ে ফেলেছিল—সে একটু অস্বস্তি বোধ করছিল। কথা শেষ করে কেদারের সামনে থেকে পালিয়ে বাঁচল সে।

কিন্তু কিছু দূর যেতেই সে শুনলে কেদার তাকে পেছন থেকে ডাকছেন—ও বুড়ি, শুনে যা। একটু দাঁড়িয়ে যা—

—কি জ্যাঠামশায় ?

—এই বেগুন কটা আনলাম গেঁয়োহাটির তারক কাপালীর বাড়ি থেকে। তুই নিয়ে যা দুটো। সজনে ফুলের সঙ্গে বেশ হবে এখন—

রাজলক্ষ্মী বিব্রত হয়ে পড়ল। এক হাতে সে বাক্সটা ধরে আছে, অন্য হাতে ফুলে ভর্তি আঁচল। বেগুন নেয় কোন্ হাতে ?কিন্তু কেদার সদাই অন্যমনস্ক, কোনোদিকে ভালো করে লক্ষ্য করে দেখবার সময় নেই। কোনো রকমে গোটাচারেক বেগুন রাজলক্ষ্মীর সামনে নামিয়ে রেখে তিনি চলে যেতে পারলে যেন বাঁচেন, এমন ভাব দেখালেন।

রাজলক্ষ্মী ভাবলে—জ্যাঠামশায় বড় ভালো। এ গাঁয়ে ওঁদের মতো মানুষ নেই। শরৎদি কি ভালোই বাসে আমায়। এ গাঁ থেকে যদি বিয়ে হয়ে অন্য জায়গায় চলে যাই, শরৎদিকে না দেখে কি করে থাকব তাই ভাবি ! পাছে বাড়িতে জ্যাঠাইমা টের পায়, এজন্যে রাজলক্ষ্মী বাক্সটা সন্তর্পণে লুকিয়ে বাড়ি ঢুকল। মাকে ডেকে বললে, এই দ্যাখো মা—

রাজলক্ষ্মীর মা বাক্সটা হাতে নিয়ে বললে, বাঃ, দেখি দেখি—কোথায় পেলি রে ?শরৎ দিলে ?চমৎকার জিনিসটা। আমরা বাপু সেকেলে লোক, কখনো চক্ষেও দেখি নে এসব। শরৎকোথায় পেলে রে ?

রাজলক্ষ্মী বললে, ওকে প্রভাসদা কাল দিয়েছিল। তা ও তো এসব মাখবে না—জানো তো ওকে। তাই আমায় বললে, তুই নিয়ে যা। এ কথা কাউকে বোলো না কিন্তু মা—

দু-দিন পরে কেদার একদিন সকালে বললেন, শরৎ মা, আমি আজকে একবার তালপুকুর যাব খাজনা আদায় করতে, আমার আসতে একদিন দেরি হতে পারে, একটু সাবধানে থেকো।

শরৎ বলল, বেশি দেরি কোরো না বাবা, তুমি যেখানে যাও আসবার নামটি করতে চাও না তে ! আমি একলা থাকব মনে কোরো।

কেদার একবার বাড়ির বার হলে ফিরবার কথা ভুলে যান, একথা শরৎ ভালোভাবেই জানে। মুখে বললেও শরৎ জানে বাবা এখন দিন দু-তিনের মতো গা-ঢাকা দিলেন। সেদিন সে রাজলক্ষ্মীকে বলে পাঠাল একবার দেখা করতে।

দুপুরের পর রাজলক্ষ্মী এসে বললে, কি শরৎ দিদি, ডেকেছিলে কি জন্যে ?

—বাবা গিয়েছেন তালপুকুরে খাজনা আদায় করতে, আমাদের বাড়ি দু-দিন রাত্রে শুবি ?

রাজলক্ষ্মী বললে, মা থাকতে না দিলে তো থাকা হবে না। আচ্ছা, বলে দেখব এখন।

—এইখানেই খাবি কিন্তু এবেলা—

—ওই তো তোমার দোষ শরৎদি, কেন, বাড়ি থেকে খেয়ে আসতে পারি নে ?

—পারবি নে কেন, তবে দুজনে মিলে খেলে বেশ একটু আনন্দ পাওয়া যায়। খাবি ঠিক বললাম কিন্তু।

দুপুরের অনেক পরে রাজলক্ষ্মী এসেছে। বেলা প্রায় গড়িয়ে বিকেল হয়ে এল। পুকুরঘাটে ছাতিমবনের দীর্ঘ ছায়া পড়ে গিয়েছে, যখন ওরা দুজনে পুকুরঘাটে এসে বসল।

মুখে বিদেশে যাবার যত ইচ্ছেই ওরা প্রকাশ করুক, এই গ্রাম ওদের অস্তিত্বের সঙ্গে নিবিড় ভাবে জড়িয়ে গিয়েছে এর ছাতিম ফুলের উগ্র সুবাস নিয়ে, ঘুঘু ও ছাতারে পাখির ডাক নিয়ে, প্রথম হেমন্তে গাছের ডালে ডালে আলকুশী ফলের দুলুনি নিয়ে—এর সমস্ত রূপ, রস গন্ধ নিয়ে। শরৎ যখনই এই দীঘির বাঁধা ঘাটের পাড়ে বসে ছাতিমবনের দিকে তাকায়, তখন মনে হয় ওর, সে কত যুগ থেকে এই গ্রামের মেয়ে, তার সমস্ত দেহমন-চেতনাকে আশ্রয় করে আছে এই ভাঙা গড়বাড়ি, এই কালো পায়রার দীঘি, এই পুরনো আমলের মন্দিরগুলো, এই ছাতিমবন, ইটের স্তূপ।

ঋতুতে ঋতুতে ওদের পরিবর্তনশীল রূপ ওর মন ভুলিয়েছে। শরৎ অত ভালো করে বোঝে না, ঋতুর পরিবর্তন সম্বন্ধে তার মন তত সজাগ নয়, তবুও ভালো লাগে। বুদ্ধি দিয়ে না বুঝলেও অন্য একটা অনুভূতি দিয়ে তার মন এর সৌন্দর্যকে নিতে পারে।

শরৎ পুকুরপাড়ে বাসন নামিয়েই বললে, রাজলক্ষ্মী, পাতাল-কোঁড় তুলে আনবি ?ওই উত্তর দেউলের ওদিকের জঙ্গলে সেদিন অনেক ফুটেছিল—চল্ দেখে আসি।

—এখন বর্ষাকাল নয়, এখন বুঝি পাতাল-কোঁড় ফোটে ?

—ফুটে বনের তলা আলো করে আছে, বলে ফোটে না ! চল্ না দেখবি—

—আমার বড্ড ভয় করে শরৎদি ও বনে যেতে, তুমি চলো আগে আগে—

বাসন সেখানেই পড়ে রইল। গড়শিবপুরে এ পর্যন্ত কোনো জিনিস ফেলে রাখলে চুরি যায়নি। কতদিন এমন দীঘির ঘাটে এঁটো বাসন জলে ডুবিয়ে রেখে চলে যায়, সারারাত হয়তো পড়ে থাকে—তার পরদিন সকালে সে-সব বাসন মাজা হয়—একটা ছোট তেলমাখা বাটিও চুরি যায়নি। শরৎদি'র ঘরে বেশি জায়গা নেই বলে কত জিনিসপত্র বাইরেই পড়ে থাকে দিনরাত। শুধু গড়ের মধ্যে বলে যে এমন তা নয়, এ-সব পল্লীঅঞ্চলে চোরের উপদ্রব আদৌ নেই।

ঘন নিবিড় বনের মধ্যে ঢুকে রাজলক্ষ্মীর গা ছমছম করতে লাগল। শরৎদি শক্ত মেয়েমানুষ, ওর সাহস বলিহারি—ও সব পারে। বাবাঃ, এই বনে মানুষ ঢোকে পাতালকোঁড়ের লোভে ?

—ও শরৎ দিদি, সাপে খাবে না তো ?তোমাদের গড়ের ইটের ফাটলে ফাটলে সাপ বাবা—

শরৎ কৃত্রিম কোপের সঙ্গে বললে, অমন করে আমার বাপের বাড়ির নিন্দে করতে দেব না তোকে—আমাদের এখানে যদি সাপ থাকত তবে আমায় এতদিন আস্ত থাকতে হতনা। আমার মতো বনে-জঙ্গলে তো তুমি ঘোরো না। কি বর্ষা, কি গরমকাল, ঝড় নেই, বৃষ্টি নেই, অন্ধকার নেই—একলাটি বনের মধ্যে দিয়ে যাব উত্তর দেউলে সন্দে পিদিম দিতে—তা ছাড়া এই বনে কাঠ কুড়িয়ে বেড়াই, বাবা কি জোগাড় করে দেন ?

এক জায়গায় রাজলক্ষ্মী থমকে দাঁড়িয়ে বললে, দ্যাখো দ্যাখো শরৎ দিদি, কত পাতালকোঁড়—বেশ বড় বড়—

শরৎ তাড়াতাড়ি এসে বললে, কই দেখি ?

পরে হেসে বলে উঠল—দুর ! ছাই পাতালকোঁড়—ও সব ব্যাঙের ছাতা, অত বড় হয় না পাতালকোঁড়—ও খেলে মরে যায় জানিস্ ?বিষ—

—সত্যি শরৎদি ?

—মিথ্যে বলছি ?ব্যাঙের ছাতা বিষ—

—আমি খেলে মরে যাব—

—বালাই ষাট—কি দুঃখে ?

—বেঁচে বা কি সুখ শরৎদি ?সত্যি বলছি—

—কেন, জীবনের উপর এত বিতেষ্টা হল যে হঠাৎ ?

—অনেকদিন থেকেই আছে। এক এক সময় ভাবি আমাদের মতো মেয়ের বেঁচে কি হবে শরৎদি ?না আছে রূপ, না আছে গুণ—এমনি করে কষ্টস্রেষ্ট করে খুঁটে কুড়িয়ে আর বাসন মেজেই তো সারাজীবন কাটবে ?

—সুখ যদি জুটিয়ে দিই ?তা হলে কিন্তু—

—তোমার সেই সেদিনের কথা তো ?তুমি পাগল শরৎদি—

—তুই রাজী হয়ে যা না !

—সেই জন্যে আটকে রয়েছে ! তোমার যেমন কথা—

—এবার প্রভাসদাকে বলব, দেখিস্ হয় কি না—

হঠাৎ রাজলক্ষ্মী উৎকর্ণ হয়ে বললে, চুপ শরৎদি, বনের মধ্যে কারা আসছে ।

শরতের তাই মনে হল। কাদের পায়ের শব্দ বনের ওপাশে। শরৎ ও রাজলক্ষ্মী একটা গাছের আড়ালে লুকুল। দুজন লোক বনের মধ্যে কি করছে। কিসের শব্দ হচ্ছে যেন। শরৎ চুপি চুপি বললে, কারা দেখতে পাচ্ছিস ?

—না শরৎদি, চলো পালাই—

—পালাব কেন ?বাঘভালুক তো না—তুই দাঁড়া না—

একটু সরে শরৎ আবার বললে, দেখেছিস মজা ?রামলাল কাকার ছেলে সিদু আর ওপাড়ার জীবন শুঁড়ির ভাই হরে শুঁড়ি।

হঠাৎ শরৎ কড়া গলায় সুর চড়িয়ে বললে, কে ওখানে ?

দুপ দুপ দ্রুত পদশব্দ। তারপর সব চুপচাপ।

শরৎ বললে, আয় তো গিয়ে দেখি—কি করছিল মুখপোড়ারা—

রাজলক্ষ্মী চেয়ে দেখলে শরতের যেন রণরঙ্গিণী মূর্তি। ভয় ও সঙ্কোচ এক মুহূর্তে চলে গিয়েছে তার চোখমুখ থেকে। রাজলক্ষ্মী ভয় পেয়ে বললে, ও শরৎদি, ওদিকে যেয়ো না—পরে শরৎ নিতান্তই গেল দেখে সে নিজেও সঙ্গে সঙ্গে চলল। খানিকদূর গিয়ে দুজনেই দেখলে, যেখানে উত্তর দেউলের পুব কোণে একটা ভাঙা পাথরের মূর্তি পড়ে আছে ঘন লতাপাতার ঝোপের মধ্যে—সেখানে একটা লোহার শাবল পড়ে আছে, কারা খানিকটা গর্ত খুঁড়েছে আর কতকগুলো মাটিতে পোঁতা ইট সরিয়েছে।

শরৎ খিল খিল করে হেসে বললে, মুখপোড়াদের বিশ্বাস গড়ের জঙ্গলে সর্বত্র ওদের জন্যে টাকার হাঁড়ি পোঁতা রয়েছে। গুপ্তধন তুলতে এসেছিল হতচ্ছাড়া ড্যাকরারা, এরকম দেখে আসছি ছেলেবেলা থেকে। কেউ

এখানে খুঁড়েছে, কেউ ওখানে খুঁড়েছে—আর সব খুঁড়বে কিন্তু লুকিয়ে। পাছে ভাগ দিতে হয় ! যাক—শাবলখানা লাভ হয়ে গেল। চল্ নিয়ে চল্—

রাজলক্ষ্মীও হেসে কুটিপাটি। বললে, ভারি শাবলখানা নিয়ে পালাতে পারলে না ! তোমার গলা শুনেই পালিয়েছে— তোমাকে সবাই ভয় করে শরৎদি—

বনের পথ দিয়ে ওরা আবার যখন দীঘির ঘাটে এসে পৌঁছল, তখন বেলা বেশ পড়ে এসেছে। আর রোদ নেই ঘাটের সিঁড়িতে, তেঁতুল গাছের ডালে দু-একটা বাদুড় এসে ঝুলতে শুরু করেছে। ওরা তাড়াতাড়ি বাসন মেজে নিয়ে বাড়ির দিকে চলল।

শরৎ বললে, এবার কিছু খা—তারপর বাড়ি গিয়ে বলে আয় খুড়িমাকে এখানে থাকার কথা রাতে ।

রাজলক্ষ্মী ব্যস্তভাবে বললে, না শরৎদি, সন্দের আর দেরি নেই। আমি আগে বাড়ি যাই। অনেকক্ষণ বেরিয়েছি বাড়ি থেকে, মা হয়তো ভাবছে—

—বোস্ আর একটু—একটু চা করি, খেয়ে যা—

শাবল ফেলে ওদের পালানো ব্যাপারটাতে শরৎ ও রাজলক্ষ্মী খুব মজা পেয়েছে। তাই নিয়ে হাসিখুশি ওদের যেন আর ফুরোতে চায় না।

রাজলক্ষ্মী বললে, তোমার সাহস আছে শরৎ দিদি, আমি হলে পালিয়ে আসতাম—

—এই রকম না করলে হয় না, বুঝলি ?সব সময় ভীতু হয়ে থাকলে সবাই পেয়ে বসে—আর কখনো ওরা আসবে না দেখিস।

—যদি আমার না আসা হয়, একলা থাকতে পারবে শরৎদি ?

শরৎ হেসে বললে, কতবার তো থেকেছি। এমনিতেই বাবা এত রাত করে বাড়ি ফেরেন, এক একদিন আমার একঘুম হয়ে যায়। বাবার কি কোনো খেয়াল আছে নাকি ?

তার পর সে ঈষৎ লাজুক মুখে মুখ নিচু করে বললে, বাবার জন্যে মন কেমন করছে—

—ওমা, সে কি শরৎ দিদি ! আজ তো জ্যাঠামশাই সবে গেলেন—

—সেজন্যে না। বিদেশে কোথায় খাবেন কোথায় শোবেন, উনি বাড়ি থেকে বেরুলেই আমার কেবল সেই ভাবনা।

—জলে তো আর পড়ে নেই ?লোকের বাড়ি গিয়েই উঠেছেন তো—

—তুই জানিস্ নে ভাই—ওঁর নানান্ বাচবিচার। এটা খাবে না ওটা খাবে না—দুনিয়ার আদ্ধেক জিনিস তাঁর মুখে রোচে না। আমায় যে কত সাবধানে থাকতে হয়, তা যদি জানতিস্ ! পান থেকে চুন খসলেই ভাতের থালা ফেলে উঠে গেলেন। আমার হয়েছে ওঁকে নিয়ে সব চেয়ে বড় ভাবনা। একেবারে ছেলেমানুষের মতো !

রাজলক্ষ্মী হাসিমুখে বললে, তোমার বুড়ো ছেলেটি শরৎ দিদি—আহা কোথায় গেল, মায়ের প্রাণ, ভাবনা হবে না ?

শরতের চোখ ছলছল করে উঠল। আঁচল দিয়ে চোখ মুছে বললে, তাই এক এক সময় ভাবি, ভগবান আমায় যেন এর মধ্যে টেনে নিয়ো না। বুড়ো বয়সে বাবা বড় কষ্ট পাবেন। ওঁকে ফেলে আমার স্বর্গে গিয়েও সুখ হবে না—উনি মারা যান আগে, তার পর আমি কষ্ট পাই দুঃখ পাই, যা থাকে আমার ভাগ্যে।

—আমি এবার যাই শরৎদি—সন্দের আর দেরি কি ?

—তুই কিন্তু আসবি ঠিক—খুব চেষ্টা করবি, কেমন তো ?একলা আমি থাকতে পারি, সেজন্যে না। দুজনে থাকলে বেশ একটু গল্পগুজব করা যেত—মুখ বুজে এই নিবান্দা পুরীর মধ্যে থাকতে বড় কষ্ট হয়।

রাজলক্ষ্মী চলে গেলে শরৎ সলতে পাকাতে বসল—তার পর শাঁখ বাজিয়ে চৌকাঠে জলের ধারা দিয়ে তার অভ্যাসমতো ছোট্ট একটি প্রদীপ জ্বেলে নিয়ে উত্তর দেউলে সন্ধ্যাদীপ দিতে চলল। সঙ্গে দেশলাই নিয়ে গিয়ে দেউলে বসে প্রদীপ জ্বালাও চলে বটে, কিন্তু এদের বংশের নিয়ম ঘরের সন্ধ্যাদীপ থেকে জ্বালিয়ে নিয়ে যেতে হয় মন্দিরের প্রদীপ। তবে যদি ঝড়েবৃষ্টিতে পথে সেটা নিবে যায়, অগত্যা সেখানে বসেই জ্বালাতে হয়—উপায় কি ?

উত্তর দেউলের পথে শরতের কেবলই মনে হচ্ছিল, আবার হয়তো সেইখানে খুঁড়তে আরম্ভ করেছে। সে একবার গিয়ে দেখবে নাকি ?তা হলে বেশ মজা হয়—

কথাটা মনে আসতেই শরৎ আপনমনেই হি-হি করে হেসে উঠল।

—উঃ, শাবল ফেলেই ছুট্ দিলে ! এ গুপ্তধন না তুললে নয় মুখপোড়াদের। ওদের জন্যে আমার বাপ-ঠাকুরদাদা কলসি কলসি মোহর পুঁতে রেখে গিয়েছে ! যদি থাকে তো আমরা নেব আমাদের জিনিস—তোরা মরতে আসিস্ কেন হতভাগারা ?

শরৎ হঠাৎ থমকে দাঁড়াল এবং একটু অবাক হয়ে চেয়ে দেখলে একটা নতুন সিগারেটের বাক্স পড়ে আছে উত্তর দেউলের পৈঠার ওপরেই। এ বনের মধ্যে সন্ধ্যাবেলা সিগারেট খেয়েছেকে ?এখানকার লোকে সিগারেট খাবে না, তাদের তামাক জোটে না সিগারেট তো দূরের কথা ! বাক্সটা হেলাগোছা ভাবে ফেলা নয়, কে যেন তার যাবার পথে ইচ্ছে করে রেখেছে !

প্রদীপ দেখিয়ে এসে ও সিগারেটের বাক্সটা হাতে তুলে নিলে, খালি বাক্স অবিশ্যি।

রাংতাটা আছে ভেতরে। বেশ পাওয়া গিয়েছে। সিগারেটের রাংতা বেশ জিনিস। তবে এ গাঁয়ে মেলে না, কে আর সিগারেট খাচ্ছে !

শরতের হাত থেকে সিগারেটের বাক্সটা পড়ে গেল। তার মধ্যে একটানা চিঠি। শরৎ বিস্ময়ে ও কৌতূহলে পড়ে দেখলে, লেখা আছে—

"আমি তোমার জন্যে জঙ্গলের মধ্যে ভাঙা মন্দিরের পেছনে কতক্ষণবসেছিলাম। তুমি এলে না। তোমাকে কত ভালোবাসি, তা তুমি জানো না।যদি সাহস দাও, লক্ষ্মীটি, তবে কালও এই সময় এইখানেই থাকব।"

শরৎ খানিকটা অবাক হয়ে থেকে চারিদিকে চেয়ে চেঁচিয়েই বললে, আ মরণ চুলোমুখো আপদগুলো ! আচ্ছা, আবার চিঠি লেখা পর্যন্ত শুরু করেছে—হ্যাঁ ?এ-সব কি কম খ্যাংরার কাজ ?কাল এসো, থেকো না জঙ্গলের মধ্যে, থেকো ! বঁটি দিয়ে একটা নাক যদি কেটে না নিই, তবে আমার নাম নেই—যমে ভুলে আছে কেন তোমাদের, ও মুখপোড়ারা ?

রাগে গরগর করতে করতে শরৎ বাড়ি এসে দেখলে রাজলক্ষ্মী বসে আছে। বাড়ি থেকে সে একটা লণ্ঠন নিয়ে এসেছে। শরৎ খুশি হয়ে বললে, এসেছিস ভাই !

—রাজলক্ষ্মী হেসে বললে, না, একেবারে আসিনি শরৎ দিদি। মা বললে, বলে আয়, রাত্তিরে থাকা হবে না।

—সত্যি ?

—সত্যি শরৎদি। আমি কি বাজে কথা বলছি ?

—তবে তুই আর কষ্ট করে এলি কেন ?

—কথাটা বলতে এলাম শরৎ দিদি। তুমি আবার হয়তো কি মনে করবে, তাই। রাজকন্যে তুমি।

রাজলক্ষ্মীর কথা বলার ধরনে শরতের সন্দেহ হল। সে হেসে বললে, যাঃ, আর চালাকি করতে হবে না ! আমি আর অত বোকা নই—বুঝলি ?

রাজলক্ষ্মী খিল খিল করে হেসে উঠে বললে, কিন্তু তোমায় প্রথমটা কেমন ভাবিয়েছিলাম বলো না ?

শরৎ বললে, যাঃ, আমি গোড়া থেকেই জানি। খুড়িমা এখানে রাত্তিরে থাকতে না দিলে তোকে আলো নিয়ে আসতে দিতেন না। ও রাজলক্ষ্মী...একটা মজা দেখবি ভাই ?

বলেই শরৎ চিঠিখানা রাজলক্ষ্মীর হাতে দিয়ে বললে, পড়ে দ্যাখ—

রাজলক্ষ্মী পড়ে বললে, এ কোথায় পেলে ?

—উত্তর দেউলের সিঁড়ির ওপর একটা সিগারেটের খোলের মধ্যে ছিল।

—আশ্চর্য, আচ্ছা কে লিখলে বলো তো শরৎদি ?

—তাই যদি জানব, তা হলে তো একেবারে শ্রাদ্ধের চাল চড়িয়ে দিই তাদের—

—তুমি আগে যাদের কথা বলেছিলে—

—তারাও হবে হয়তো। নাও হতে পারে। সিগারেট খাবে কে এ গাঁয়ে ?

কাউকে দেখলে, কি পায়ের শব্দ শুনলে ?

শরৎ সুর বদলে মাথা ঝাঁকুনি দিয়ে বললে, বাদ দে ও-সব কথা। বাবা নেই কিনা বাড়িতে, বাবা না থাকলেই ওদের বিদ্ধি বাড়ে আমি জানি। যদি দেখতে পেতাম তবে না কথা ছিল।

রাজলক্ষ্মী বললে, আচ্ছা যদি আমি না আসতাম, তবে তুমি ভয় পেতে না শরৎদি, এই সব চিঠি পেয়ে—জ্যাঠামশায় নেই বাড়ি— ?

—দুর, কি আর ভয় ! আমার ও-সব গা-সওয়া হয়ে গিয়েছে—

—একলাটি তো থাকতে হত ?

থাকিই তো। ভয় করে কি করব ?চিরদিনই যখন একা—

—তোমার বলিহারি সাহস শরৎদি ! এই অরুণ্যি বনের মধ্যে—

—ঘরে বঁটি আছে, দা আছে—এগুক দিকি কে এগুবে শরৎ বামনীর সামনে—ঠাণ্ডা করে ছেড়ে দেব না ?কি খাবি বল্ রাত্রে—ও কথা যাক। ভাত না রুটি ?

—যা হয় করো। তুমি তো ভাত খাবে না, তবে রুটিই করো—দুজনে মিলে তাই খাব।

বাইরে বসে আটাটা মেখে ফেলি—

—তুমি যাও শরৎদি, আমি মাখছি আটা—

দু'জনে গল্পগুজবে রাঁধতে খেতে অনেক রাত করে ফেললে। তার পর দোর বন্ধ করে দু'জনে যখন শুয়ে পড়ল, তখন খুব সুন্দর জ্যোৎস্না উঠেছে। বেশি রাত্রে শরৎ ঘুম ভেঙে উঠে রাজলক্ষ্মীর গা ঠেলে চুপি চুপি বললে, ও রাজলক্ষ্মী, ওঠ্—বাইরে কার পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে যেন—

রাজলক্ষ্মী ঘুমে জড়িত কণ্ঠে ভয়ের সুরে বললে, কোথায় শরৎদি ?

—চুপ, চুপ, ওই শোন্ না—

রাজলক্ষ্মী বিছানায় উঠে বসে উৎকর্ণ হয়ে শোনবার চেষ্টা করেও কিছু শুনতে পেলে না।

শরৎ উঠে আলো জ্বাললে। তার ভয়-ভয় করছিল। তবু সে সাহস করে আলো হাতে দোর খুলে বাইরে যাবার চেষ্টা করাতে রাজলক্ষ্মী ছুটে এসে ওর হাত ধরে বললে, খবরদার বাইরে যেয়ো না শরৎদি, কার মনে কি আছে বলা যায় না। তোমার দুটি পায়ে পড়ি—

শরৎ কিন্তু ওর কথা না শুনেই দোর খুলে দাওয়ায় গিয়ে দাঁড়াল। ফুটফুট করছে জ্যোৎস্না, কেউ কোথাও নেই ! তবুও তার স্পষ্ট মনে হল খানিক আগে কেউ এখানে ঘুরে বেড়াচ্ছিল, তার কোনো ভুল নেই।

হঠাৎ তার মনে পড়ল, আজ ত্রয়োদশী তিথি।

তাদের এখানে প্রবাদ আছে, বারাহী দেবীর পাষাণ-মূর্তি ত্রয়োদশী থেকে পূর্ণিমা তিথি পর্যন্ত তিন দিন, গভীর রাত্রিকালে নিজের জায়গা থেকে নড়েচড়ে বেড়ায় গড়বাড়ির নির্জন বনজঙ্গলের মধ্যে। সেই সময় যে সামনে পড়ে, তার বড় অশুভ দিন।

শরতের সারাগায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল।

যদি সত্যিই তাই হয় ?

যদি সত্যিই বারাহী দেবীর বুভুক্ষু ভগ্ন পাষাণ-বিগ্রহ রক্তের পিপাসায় তাদেরই ঘরের আনাচে-কানাচে শিকার খুঁজে বেড়াতে বার হয়ে থাকে ?

শরৎ ভয় পেলেও মুখে কিছু বললে না। ধীরভাবে ঘরে ঢুকে দোর বন্ধ করে দিলে।

রাজলক্ষ্মী কলসি থেকে জল গড়িয়ে খাচ্ছিল, বললে, কিছু দেখলে শরৎদি ?

—না কিছু না। তুই শুয়ে পড়।

পরদিন বৈকালের দিকে প্রভাস ও আর একটি তরুণ সুদর্শন যুবক হঠাৎ এসে হাজির।

রাজলক্ষ্মী তখন সবে কি একটা ঘরের কাজ সেরে দীঘির ঘাটে শরতের কাছে যাবার জোগাড় করছে—এমন সময় ওদের দেখে জড়সড় হয়ে উঠল।

প্রভাস বললে, খুকি, তুমি কি এ বাড়ির মেয়ে ?না, তোমাকে তো কখনো দেখিনি ?বাড়ির মানুষ সব গেল কোথায় ?

রাজলক্ষ্মী সলজ্জমুখে বললে, শরৎদি দীঘির পাড়ে। ডেকে আনছি।

—হ্যাঁ, গিয়ে বলো প্রভাস আর অরুণবাবু এসেছে।

শেষের নামটা উচ্চারিত হতে শুনে রাজলক্ষ্মীর মুখ তার নিজের অজ্ঞাতসারে রাঙা হয়ে উঠল। সে জড়িত পদে কোনো রকমে ওদের সামনে থেকে নিজেকে সরিয়ে আড়ালে এনে এক ছুটে ঘাটের পাড়ে গিয়ে খবরটা দিল শরৎকে।

শরৎ অবাক হয়ে বললে, তুই দেখে এলি ? .

—ও মা, দেখে এলাম তো কি ! এসো না—

শরৎ ব্যস্তভাবে দীঘির ঘাট থেকে উঠে এল। প্রভাস ততক্ষণ নিজেই মাদুর পেতে বসে পড়েছে ওদের দাওয়ায়। হাসিমুখে বললে, আবার এসে পড়লাম। এখন একটু চা খাওয়াও তো দিদি—

—বসুন প্রভাসদা। এক্ষুনি চা করে দিচ্ছি—

প্রভাস পকেট থেকে একটা কাগজের প্যাকেট বার করে বললে, ভালো চা এনেছি। আর এতে আছে চিনি—

—আবার ও-সব কেন প্রভাসদা ?আমরা গরিব বলে কী একটু চা দিতে পারি নে আপনাদের ?

—ছিঃ, অমন কথা বলতে নেই। সে ভেবে আনিনি, এখানে সব সময় ভালো চা তো পাওয়া যায় না পয়সা দিলেও ! আর এ চিনি সে চিনি নয়, এ চায়ে খাওয়ার আলাদা চিনি। দ্যাখো না—এ পাড়াগাঁয়ে কোথায় পাবে এ চিনি ?

শরৎ হাতে করে দেখলে চৌকো চৌকো লেবেঞ্চুসের মতো জিনিসটা। এ আবার কি ধরনের চিনি ! কখনো সে দেখেইনি। শহর বাজারে কত নতুন জিনিস আছে !

প্রভাস বললে, কাকাবাবু কোথায় গেলেন ?

—বাবা গিয়েছেন খাজনার তাগাদায়। দু-তিন দিন দেরি হবে ফিরতে।

প্রভাস হতাশমুখে বললে, তিনি বাড়ি নেই। এঃ, তবে তো সব দিকেই গোলমাল হয়ে গেল !

—কেন, কি গোলমাল ?

—আমি এসেছিলাম তোমাদের কলকাতা ঘুরিয়ে আনতে। মোটর ছিল সঙ্গে। সেই ভেবেই অরুণকে সঙ্গে নিয়ে এলাম।

—তাই তো, সে এখন কি করে হয় ?

—নিতান্তই আমার অদৃষ্ট।

—সে কি, আপনার অদৃষ্ট কেন প্রভাসদা, আমাদের অদৃষ্ট।

—তা নয় দিদি, মুখে যাই বলো, প্রাচীন রাজবংশের মেয়েকে কলকাতায় নিয়ে গিয়ে সব দেখিয়ে বেড়ানোর মধ্যে যে আনন্দ আছে—তা কি সকলের ভাগ্যে ঘটে শরৎদি ?বিশেষ করে তুমি আর কাকাবাবু যখন কখনো কলকাতাতে যাওনি।

—কোথাও যাইনি—তার কলকাতায়।

অরুণ এবার কথা বললে। সে অনেকক্ষণ থেকে একদৃষ্টে শরতের দিকে চেয়ে ছিল। শরতের কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অরুণ জিভ ও তালুর সাহায্যে একপ্রকার খেদসূচক শব্দ উচ্চারণ করে বললে, ও ভাবলে একদিকে কষ্ট হয়, একদিকে আনন্দ হয়। আপনার এই সরলতার তুলনা নেই। অভিজ্ঞতা সব জায়গাতেই যে পুজো পাবে তা পাবে না। অনভিজ্ঞতার মূল্য অনেক সময় অভিজ্ঞতার চেয়ে অনেক—অনেক বেশি।

প্রভাস বললে, তাই তো, বড় ভাবনায় পড়া গেল দেখছি !

—ভাবনা আর কি, অন্য এক সময় নিয়ে যাবেন প্রভাসদা।

প্রভাস কিছুক্ষণ বসে ভেবে ভেবে বললে, আচ্ছা, কোনো রকমেই এখন যাওয়া হয় না ?ধরো তুমি আর কাউকে নিয়ে না হয় আমাদেরই সঙ্গে গেলে—

—আমি একাও আপনার সঙ্গে যেতে পারি প্রভাসদা। আমার মন তেমন নীচ নয়। কিন্তুসেজন্যে নয়—বাবার বিনা অনুমতিতে কোথাও যেতে চাই নে। যদিও আমার মনে হয় আপনি নিয়ে গেলে বাবা তাতে অমত করবেন না।

অরুণ এবার বললে, তবে চলুন না কেন, গাড়ি রয়েছে—কাল সকালে বেরুলে বেলা বারোটার মধ্য কলকাতা পৌঁছে যাওয়া যাবে। ইচ্ছে করেন, কাল রাতেই আবার আপনাকে এখানে পৌঁছে দেব, কি বলেন প্রভাসবাবু ?

প্রভাস ঘাড় নেড়ে বললে, তা তো বটেই। তাই চলো যাওয়া যাক—অবিশ্যি যদি তোমার মনের সঙ্গে খাপ খায়। কাল সকালে আমরা আসব এখন আবার—

এরা উঠে গেলে রাজলক্ষ্মী দেখলে শরৎ একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছে। কি যেন ভাবছে আপন মনে। কিছুক্ষণ পরে শরৎ নিজেই বললে, তুই তো শুনলি, তোর কি মনে হয়—যাব ওদের সঙ্গে ?খুব ইচ্ছে করছে। কক্ষনো দেখিনি কলকাতা শহর।

—তোমার ইচ্ছে শরৎদি। তুমি আমার চেয়ে বুদ্ধিমতী।

—তুই যাবি ?

—আমার যেতে খুব ইচ্ছে—কিন্তু আমার যাওয়া হবে না শরৎদি। বাবা মা যেতে দেবে না।

—আমার সঙ্গে যাবি, এতে আর দোষ কি ?

—তুমি যদি যাও, লোকে কোনো কথা ওঠাতে সাহস করবে না শরৎদি। কিন্তু আমায় কেউ ছেড়ে কথা বলবে না। শেষকালে বাপ-মা মুশকিলে পড়ে যাবে বিয়ে দেবার সময়।

—বাবাঃ, এর মধ্যে এত কথা আছে ?ধন্যি সব মন বটে !

—তুমি থাকো গাঁয়ের বাইরে। তা ছাড়া তুমি যে বংশের মেয়ে, তোমার নামে এ অঞ্চলের লোকে কিছু রটাতে সাহস করবে না। আমার বেলায় তা তো হবে না !

আরো কিছুক্ষণ পরে রান্না শেষ হয়ে গেল। শরৎ রাজলক্ষ্মীকে খেতে দিয়ে নিজে একটা বাটিতে চিঁড়েভাজা তেল-নুন দিয়ে মেখে নিয়ে খেতে বসল।

রাজলক্ষ্মী খেতে খেতে বললে, ও সাত-বাসি চিঁড়ে-ভাজা কেন খাচ্ছ শরৎদি ?আমার জন্যে তো সেই কষ্ট করলেই, রান্না করলে, এখন নিজের জন্যে না হয় খানকতক পরোটা কি রুটি করে নিলেই পারতে ?

শরৎ সলজ্জ হেসে বললে, ময়দা আর ছিল না। প্রভাসদা আর অরুণবাবুকে তখন দুখানা করে পরোটা করে দিলাম—যা ছিল সব ফুরিয়ে গেল।

—আমায় বললে না কেন শরৎদি ?ওই তোমার বড় দোষ। আমায় বললে আমি বাড়ি থেকে নিয়ে আসতাম।

—থাক গে, খাওয়ার জন্যে কি ?এখন কলকাতায় যাওয়ার কি করা যায় বল্ ! আর শোন্,ওই অরুণবাবু, দেখলি তো ?পছন্দ হয় ?এবার তবে কথাটা পাড়ি প্রভাসদা'র কাছে ?

রাজলক্ষ্মী জবাব দিতে একটু ইতস্তত করে সঙ্কোচের সঙ্গে বললে, তা তোমার ইচ্ছে। কিন্তু ও আমাদের কখনো হয় ?বলে বামন হয়ে চাঁদে হাত—

—যদি ঘটিয়ে দিতে পারি ?

রাজলক্ষ্মী মনে মনে ভাবলে, শরৎদি'র বয়সই হয়েছে আমার চেয়ে বেশি, কিন্তু এদিকে সরলা। অনেক জিনিসই আমি যা বুঝি, ও তাও বোঝে না। চিরকাল গাঁয়ের বাইরে জঙ্গলের মধ্যে বাস করে এল কিনা।

সে মুখে বললে, দিতে পারো ভালোই তো।বেশ কথা।

—ঘটকালির বখশিশ দিবি কি ?

—যা চাইবে শরৎদি।

—দেখিস্ তখন যেন আবার ভুলে যাস্ নে—

রাজলক্ষ্মীর খাওয়ার প্রবৃত্তি চলে গিয়েছিল শরৎকে বাসি চিঁড়েভাজা খেতে দেখে। তারওপর যখন আবার শরৎ গরম দুধের বাটি এনে তার পাতের কাছে নামাতে গেল, সে একেবারে পিঁড়ির ওপর থেকে উঠে পড়ল। দুধটুকু থাকলে তবুও শরৎদি খেতে পাবে।

—ও কি, উঠলি যে ?

রাজলক্ষ্মী ভালো করেই চেনে শরৎকে। সে যদি এখন আসল কথা বলে, তবে শরৎ ও দুধ ফেলে দেবে, তবু নিজে খাবে না। সুতরাং সে বললে, আর আমার খাওয়ার উপায় নেই শরৎদি, পেট খুব ভরে গিয়েছে। মরব নাকি শেষে একরাশ খেয়ে ?

—দুধ যে তোর জন্যে জ্বাল দিয়ে নিয়ে এলাম ?কি হবে তবে ?

রাজলক্ষ্মী তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বললে, কি হবে তা কি জানি। না হয় তুমি খেয়ে ফেল ওটুকু। আমার আর খাওয়ার উপায় দেখছি নে। জানোই তো আমার শরীর খারাপ, বেশি খেতে পারি নে।

অগত্যা শরৎকেই দুধটুকু খেয়ে ফেলতে হল।

পরদিন সকালেই প্রভাস ও অরুণ আবার এসে হাজির।

প্রভাস বললে, কি ঠিক করলে দিদি ?

—ও এখন হয়ে উঠবে না প্রভাসদা। আপনারা যাবেন না, বসুন। চা আর খাবার করে দি, বসে গল্প করুন।

শরৎ কাল রাত্রে ভেবে ঠিক করেছে, রাজলক্ষ্মীর বিবাহের প্রস্তাবটা সে আজই প্রভাসের কাছে উত্থাপিত করে দেখবে কি দাঁড়ায়। রাজলক্ষ্মীকে এজন্যে সে সরিয়ে দেবার জন্যে বললে, ভাই, তোদের বাড়ি থেকে এত ক'টা আটা কি ময়দা দৌড়ে নিয়ে আয় তো ?কাল রাত্রে আমাদের ময়দা ফুরিয়েছে। প্রভাসদা ও অরুণবাবুকে চায়ের সঙ্গে দুখানা পরোটা ভেজে দিই।

প্রভাস যেন একটু হতাশার সুরে বললে, তা হলে যাওয়া হল না তোমার ?এবার গেলেই বেশ হত।

শরৎ বললে, না, এবার হবে না।

—তোমার বন্ধুটিকে নিয়ে চলো না কেন ?

—কে ?রাজলক্ষ্মীর কথা বলছেন ?...আচ্ছা, একটা কথা বলব ?রাজলক্ষ্মীকে কেমন লাগল আপনাদের ?

প্রভাস একটু বিস্ময়ের সুরে বললে, কেন বলো তো ?ভালোই লেগেছে।

—গরিব বাপ-মা, বিয়ে দিতে পারছে না। ওর জন্যে একটা পাত্র দেখে দিন না কেন প্রভাসদা। বড্ড উপকার করা হবে। একটা কথা শুনুন প্রভাসদা—

প্রভাস শরতের পিছু পিছু বাড়ির পিছনদিকে গেল।

শরৎ বললে, আচ্ছা প্রভাসদা, অরুণবাবুর সঙ্গে রাজলক্ষ্মীর বিয়ে দিন না কেন জুটিয়ে ?পালটি ঘর। চমৎকার হবে—

প্রভাস যেন ঠিক এ ধরনের কথা আশা করেনি শরতের মুখ থেকে। সে আশাহতের সুরে বললে, তা—তা দেখলেও হয়।

শরতের যদি কিছুমাত্র সাংসারিক ও সামাজিক জ্ঞান থাকত তবে প্রভাসকে চিনে নিতে সে পারত এই এক মুহূর্তেই। কিন্তু শরৎ যদিও বয়সে যুবতী, সারল্যে ও ব্যবহারিক অনভিজ্ঞতায় সে বালিকা। সুতরাং সে প্রভাসের স্বরূপ ধরতে পারলে না।

সে আরো আগ্রহের সঙ্গে বললে—তাই দেখুন না প্রভাসদা ?আপনি করলে অনেক সহজ হয়ে যায় কাজটা—

প্রভাস অন্যমনস্কভাবে কি একটা কথা ভাবছিল। দু-একবার যেন কোনো একটা কথা বলবার জন্যে শরতের মুখের দিকে চাইলেও—কিন্তু শেষ পর্যন্ত বললে না।

দুজনকে চা করে দিয়ে শরৎ পথের দিকে চেয়ে আছে—এমন সময় দেখা গেল রাজলক্ষ্মী ফিরে আসছে। সে দাওয়া থেকে নেমে রাজলক্ষ্মীর কাছে গিয়ে বললে—এনেছিস্ ময়দা ?দেআমার কাছে।

—আমি যাই শরৎদি, মা বলে দিয়েছে বাড়ি ফিরতে—

—কেন বল্ তো ?প্রভাসদারা এখানে বসে আছে বলে ?

রাজলক্ষ্মী অপ্রতিভ মুখে বললে—তাই শরৎদি, জানোই তো, আমরা গরিব, এখানে ওদের সঙ্গে বসে থাকলে হয়তো কথা উঠবে। মা বড় ভয় করে ওসব।

—তাহলে তুই যা—গিয়ে মান বজায় রাখ্—

রাজলক্ষ্মী হাসতে হাসতে চলে গেল।

প্রভাসদের খাবার করে দিতে বেলা প্রায় আটটা বেজে গেল। ওরা উঠতে যাবে এমন সময় শরৎ গড়ের খালের দিকে চেয়ে আহ্লাদের সঙ্গে বলে উঠল—বাবা আসছেন। প্রভাস ও অরুণ দুজনেই যেন চমকে উঠে সেদিকে চেয়ে দেখলে। ওদের মুখ দেখে মনে হবার কথা নয় যে কেদারের অপ্রত্যাশিত প্রত্যাবর্তনে তারা খুব খুশি।

তবুও প্রভাস এগিয়ে গিয়ে হাসিমুখে কেদারের পায়ের ধুলো নিয়ে প্রণাম করলে। কেদার আনন্দের সঙ্গে বলে উঠলেন—এই যে প্রভাস, কখন এলে, ভালো সব ?...আমি—হ্যাঁ—তাই বেরিয়েছিলাম বটে। সাংকিনী ও মাক্ড়ার বিলে বাচ্ হচ্ছে খবর পেলাম পথেই। খাজনা আদায় করতে যখন যাওয়া—আর সবই জেলে প্রজা—বাচ্ শেষ না হলে কাউকে বাড়ি পাওয়া যাবে না তাও বটে—আর মস্ত কথা হচ্ছে বাচ্ না মিটে গেলে ওদের হাতে পয়সা আসবে না। তাই ফিরে এলাম।

প্রভাস বললে, ভালোই হল। শরৎ তো ছোটবোনের মতো—আপনাদের কলকাতা ঘুরিয়ে নিয়ে আসব বলে মোটর এনেছি এবার। আপনি ছিলেন না বলে একটু মুশকিল ছিল। শরৎদি বলেছিল যাবে। আমার সঙ্গে যাবে এ আর বেশি কথা কি ?নিজের দাদার মতো—তবুও আপনি এলেন—বড় ভালোই হল। কাল সকালে চলুন কাকাবাবু কলকাতায়।

শরৎ প্রভাসের কথা শুনে একটু অবাক হয়ে ভাবলে—কই, সে কখন প্রভাসদা'র সঙ্গে কলকাতায় যাবে বললে ?প্রভাসদা'র ভুল হয়েছে শুনতে—কিন্তু সে তো আজ দুবার তিনবার বলেছে তার যাওয়া হবে না।

কেদার বললেন, তা বেশ কথা। চলো না, ভালোই তো। অনেককাল থেকে কলকাতায় যাব যাব ভাবি, তা হয়ে ওঠে না। মন্দ কি ?

প্রভাস ও অরুণ একসঙ্গে খুশির সঙ্গে বলে উঠল—কাল সকালেই চলুন তবে ! সে কথা তো আমরাও বলছি।

—কখন গিয়ে পৌঁছবে ?

—বেলা বারোটার মধ্যে। কোনো কষ্ট হবে না আপনাদের, যাতে সব রকম সুবিধে হয়—

—এখানে কাল সকালে তোমরা খাবে—খেয়ে গাড়িতে ওঠা যাবে।

শরৎ বাবার অনুরোধে যোগ দিয়ে বললে, হ্যাঁ প্রভাসদা, অরুণবাবুকে নিয়ে কাল সকালে এখানেই খাবেন। না, কোনো কথা শুনব না। এখানে খেতেই হবে—

প্রভাস বললে, রাজলক্ষ্মী বলে সেই মেয়েটি যাবে নাকি ?তারও জায়গা হয়ে যাবে। বড় গাড়ি।

শরৎ বললে, না, তার যাবার সুবিধে হবে না। আমায় সে বলে গেল এই মাত্র।

প্রভাস বললে, তা হলে কাকাবাবু কাল সকালেই আসব তো ?

—হ্যাঁ, এখানে তোমরা খাবে যে সকালে। তারপর রওনা হওয়া যাবে। অরুণকেও নিয়ে এসো—

দুপুরের পরে রাজলক্ষ্মী এল। শরৎ দাওয়ায় বসে পুরানো টিনের তোরঙ্গটা থেকে তার ওবাবার কাপড় বার করতে ব্যস্ত। রাজলক্ষ্মীকে দেখে বললে, এই যে আয় রাজলক্ষ্মী, সব কাপড়ই ছেঁড়া, যেটাতে হাত দিই। আমার তবু দুখানা বেরিয়েছে, বাবার দেখছি আস্ত কাপড় বাক্সে একখানাও নেই। কি নিয়ে যে যাবেন কলকাতায়—

—তা হলে যাচ্ছ সত্যিই শরৎদি ?কাকাবাবু কোথায় ?

—যাই, একবার বেড়িয়েই আসি। বসে বসে বাবার কাপড়গুলো এখন সেলাই করব— কেনবার পয়সা নেই যে নতুন একজোড়া ধুতি কিনে নেব—বেশি ছেঁড়া নয়, একটু-আধটু সেলাই করলে কেউ টেরও পাবে না। বাবা নেই বাড়ি, এইমাত্র পাড়ার দিকে গেলেন।

শরতের মনে খুব আনন্দ হয়েছে বাইরে বেড়াতে যাবার এই সুযোগ পেয়ে। সে বসে বসে কেবল সেই গল্পই করতে লাগল রাজলক্ষ্মীর কাছে। কতকাল আগে তার শ্বশুরবাড়ি গিয়েছিল— ভালো মনেও পড়ে না— সে-ও তত বেশি দূরে নয়, টুঙি-মাজদে গ্রামের কাছে বল্লভপুরের ভাদুড়িদের বাড়ি। মাজদিয়া স্টেশনে নেমে তিন ক্রোশ গরুর গাড়িতে গিয়ে কি একটা ছোট্ট নদীর ধারে। তাদেরও অবস্থা খারাপ, আগে একসময় ও অঞ্চলের ভাদুড়িদের নামডাক ছিল, সে নাকি অনেককাল আগে। এখন সতেরো শরিকে ভাগ হয়ে আর সবাই মিলে বসে খেয়ে বেজায় গরিব হয়ে পড়েছে।

রাজলক্ষ্মী বললে, সেখানে তোমায় নিয়ে যায় না শরৎদি ?

—কে নিয়ে যাবে ভাই ?

—তোমার দেওর ভাশুর নেই ?

—আপন ভাশুরই তো রয়েছেন। হলে হবে কি, তাঁর বেজায় পুরী পাল্লা—সাত মেয়ে, পাঁচ ছেলে—নিজেরগুলোসামলাতে পারেন না—খেতে দিতে পারেন না—আমাকে নিয়ে যাবেন ! আজ তেরো বছর কপাল পুড়েছে, কখনো একখানা থানকাপড় দিয়ে খোঁজ করেননি। আর খোঁজ করলেও কি হত, আমি কি বাবাকে ফেলে সেখানে গিয়ে থাকতে পারি ?সে গাঁয়ে আমার মনও টেঁকে না।

—যদি এখন তারা নিতে আসে শরৎদি ?

—আমি ইচ্ছে-সুখে যাইনে—তবে ভাশুর যদি পেড়াপীড়ি করেন—না গিয়ে আর উপায় কি ?

—কতদিন থাকতে পারো ?বলো না শরৎদি ?

—কেন বল্ তো, আজ আবার তুই আমার শ্বশুরবাড়ি নিয়ে পড়লি কেন ?

রাজলক্ষ্মী মুখে আঁচল দিয়ে দুষ্টুমির হাসি হেসে উঠল। তার পর বললে, দাও গুছিয়ে দিই কি জিনিসপত্তর আছে—মা বলছিল—

—কি বলছিলেন খুড়িমা ?

—ভাগ্যিস কাকাবাবু এসে গিয়েছেন তাই। নইলে তোমার একা যাওয়া উচিত হত না প্রভাসবাবুর সঙ্গে—

শরতের চোখ দুটি যেন ক্ষণকালের জন্যে জ্বলে উঠল। মুখের রং গেল বদলে— রাজলক্ষ্মী জানে শরৎ দিদি রাগলে ওর মুখ রাঙা হয়ে ওঠে আগে। রাজলক্ষ্মী ভয় পেল মনে মনে, হয়তো তার এ কথা বলা উচিত হয়নি, কিন্তু বলতে তাকে হবেই শরৎদির ভালোর জন্যে। না বলে সে পারে না। কতবার তার মনে

হয়েছে—শরৎ দিদি তার ছোট বোন, সে-ই এই সংসারানভিজ্ঞা বালিকাপ্রকৃতির দিদিকে সব বিপদ থেকে, কলঙ্ক থেকে বাঁচিয়ে নিয়ে বেড়াবে।

শরৎ কড়া সুরে বললে, কেন উচিত হত না, একশো বার হত। খুড়িমাকে গিয়ে বলিস রাজলক্ষ্মী, শরৎ যেখানে ভালো ভাবে, সেখানে আপনার লোকের মতোই ব্যবহার করে—পর ভাবে না। তার মন যেখানে সায় দেয় সেখানে যেতে তার এতটুকু ভয় নেই—আমি কারো কথা—

রাজলক্ষ্মী সভয়ে বললে, ওকি শরৎদি, তোমার পায়ে পড়ি শরৎদি, অমন চলে যেয়ো না, ছিঃ—

—তবে তুই এমন কথা বলিস্ কেন, খুড়িমাই বা কেন বলেন ?তিনি কি ভাবেন—

—শোনো আমার কথা। মা সে কথা বলেনি। কিন্তু একা মেয়েমানুষ যদি বিপদে পড়ে তখন তোমায় দেখবে কে ?সেই কথাই মা বলছিল। তুমি যত ভালো ভাবো লোককে, সকলেই অত ভালো নয়। তুমি সংসারের কি বোঝো ?মার বয়েস তোমার চেয়ে তো কত বেশি—সেদিক থেকে মা যা বলেছে মিথ্যে বলেনি। লক্ষ্মী দিদি, অমন রাগে না, রাগলে সংসারে কাজ চলে ?আমি তোমায় কত ভালোবাসি, মা কত ভালোবাসে—তা তুমি বুঝি জানো না ?মা আমার গাঁয়ে কারোর বাড়ি যেতে দেয় না—কিন্তু তোমাদের বাড়ি আসতে চাইলে কখনো কোনো আপত্তি করেনি।

শরতের রাগ ততক্ষণ চলে গিয়েছে। সে রাজলক্ষ্মীর হাত ধরে বললে, কিছু মনে করিস নে রাজী—

—না, মনে তো করি নে, আমি জানি শরৎদি ছেলেমানুষের মতো, এই রেগে উঠল, এই জল হয়ে গেল। রাগ তোমার বেশিক্ষণ শরীরে থাকে না—গঙ্গাজলে ধোয়া মন যে। সাধে কি বড়বংশের মেয়ে বলে তোমাকে শরৎদি ?

শরৎ সলজ্জ-মুখে বললে, যা যা বকিস্ নে—থাম তুই।

এই সময় দূর থেকে কেদারকে আসতে দেখে রাজলক্ষ্মী বললে, কাকাবাবু আসছেন, শরৎদি—ও-সব কথা থাক, কি কি কাজ করতে হবে, কি গুছিয়ে দিতে হবে বলে দাও।

—কি আর গুছিয়ে দিবি ! দু-পাঁচ দিনের জন্যে তো যাওয়া। হ্যাঁ রে, উত্তর দেউলে সন্দে-পিদিম দেওয়ার জন্যে বামী বাগদিকে ঠিক করে দিতে পারবি ?আমি এসে তাকে চার আনা পয়সা দেব।

রাজলক্ষ্মী বললে, বলে দেখব—কিন্তু সে রাজী হবে না। সন্দেবেলা সে ঘেঁষবে উত্তর দেউলের অরুণ্যি বিজেবনে ?বাপ্‌রে ! তার চেয়ে এক কাজ করা যাক না কেন ?আমি তোমার সন্ধে দেব রোজ রোজ—

শরৎ বিস্মিত হয়ে ওর মুখের দিকে চেয়ে বললে, তুই দিবি সন্দে-পিদিম—উত্তর দেউলে ?

রাজলক্ষ্মী হেসে বললে, কেন হবে না ?পানুকে সঙ্গে নিয়ে আসব—আর সন্দের এক ঘণ্টা আগে আলো জ্বেলে রেখে চলে যাব। তোমাদের ঘরবাড়িও তো দেখাশুনো করতে হবে আমায় ?অমনি দিয়ে যাব পিদিম জ্বেলে।

—তা হলে তো বেঁচে যাই রাজলক্ষ্মী। ওই একটা মস্ত ভাবনা আমার, তা জানিস ?মনে মনে ভাবি, আমি বেঁচে থাকতে পূর্বপুরুষের দেউলে আলো জ্বলবে না—তা কখনই হতে দেব না প্রাণ ধরে। আর একটা কথা শিখিয়ে দি, যখন পিদিম হাতে নিয়ে দেউলে যাবি তখন বেতবনের জঙ্গলে বারাহী দেবীর যে ভাঙা মূর্তি আছে সেখানটাতে একবার উদ্দেশে পিদিমটা তুলে দেখাবি।

রাজলক্ষ্মীর মুখে কেমন ভয়ের ছায়া নামল—সে বললে, ওমা, ওই ভাঙা কালীর মূর্তি ! ওখানে যেতে ভয় করে।

—কালী নয়—ও বারাহী বলে এক পুরোনো আমলের দেবীমূর্তি। বহুকাল পুজোও হয়নি। কেমন চড়কের সময় সন্নিসিরা একবার ওখানে এসে নেচে যায় দেখিস্‌নি ?

—তা যাক নেচে। আমি ওখানে যেতে পারব না শরৎদি। মাপ করো।

—তুই যদি না পারিস্ তবে আমার যাওয়া হবে না। আমি বারাহী দেবীকে ফেলে রেখে যেতে পারব না।

রাজলক্ষ্মী বললে, না দিদি, সত্যি কিছু ভালো লাগছে না। তুমি চলে যাবে, আমার মন কাঁদবে সত্যিই। তাই বলছিলাম পারব না, যদি তোমার যাওয়ায় বাধা দিতে পারি। কিন্তু এখন আমার মনে হচ্ছে, এ কাজ ভালো না। শরৎ দিদি কখনো কোনো জায়গায় যায় না, কিছু দেখেনি— ও-ই যাক। ঘুরে আসুক।

কেদার গামছা পরে পুকুর থেকে স্নান করে এসে বললেন, ওমা শরৎ, একটা ডাব খাওয়াতে পারবি ?

—না বাবা, একটা ছোট্ট ডাব ওবেলা ঠাকুরদের দিয়েছি—এবেলা আর কিছু নেই। পুণ্য বাগদিকে ডেকে নিয়ে আসব ?

—না থাক্ মা, সব গুছিয়ে নিয়ে রাখো—রাজলক্ষ্মী মা এলি কখন ?তা তুই একটু সাহায্য কর না !

—ও তো করছেই বাবা। ও উত্তর দেউলে পিদিম দেবে পর্যন্ত বলছে। ও গাঁয়ের মধ্যে আর কেউ এতদূর আসেও না, খোঁজখবরও নেয় না। ও আছে তাই, তবু মানুষের মুখ দেখতে পাই।

পরদিন প্রভাসের মোটর সামনের বারুইদ'র বিল পার হয়ে যাওয়ার পরে কেদারের মুখে প্রথম কথা ফুটল। পেছনের সিটে তিনি মেয়েকে নিয়ে বসেছেন—সামনের সিটে বসেছে অরুণ ও প্রভাস—অরুণ গাড়ি চালাচ্ছে।

কেদার মাঝে মাঝে বিস্ময়সূচক দু-একটা রব করছিলেন এতক্ষণ, এইবার মেয়েকে সম্বোধন করে প্রথম কথা বললেন।

—ও শরৎ, কি জোরে যায় বটে মটোর গাড়ি, বারুইদ'র বিল গড়শিবপুর থেকে পাক্কা চার ক্রোশ রাস্তা। হেঁটে আসলে দু-ঘণ্টা আড়াই ঘণ্টার কম পৌঁছুনো যায় না—আর এই দ্যাখো, চোখের পাতা পাল্টাতে না পাল্টাতে এসে হাজির বারুইদ'র বিলে—

—হাজির কি বাবা, বিল পেরিয়েও তো গেল !

—ও, মানুষ না পাখি ?কি জোরেই যায় তাই ভাবছি।

—হ্যাঁ বাবা, কলকাতা কতদূর বললে প্রভাসদা ?

—বেলা বারোটা কি একটার মধ্যে যাব বলছে। ত্রিশ ক্রোশ হবে এখান থেকে কলকাতা।

প্রভাস সামনের সিটে বসে মুখ ফিরিয়ে চেঁচিয়ে বললে, কাকাবাবু কখনো কলকাতায় এসেছিলেন ?

কেদার বললেন, তা দু-বার এর আগে আমি কলকাতা ঘুরে এসেছি। তবে সে অনেকদিন আগের কথা। প্রায় দু-যুগ হল।

অরুণ বললে, সে কলকাতা আর নেই, গিয়ে দেখবেন। শরৎদি, আপনি কখনো যাননি কলকাতায় এর আগে ?

—নাঃ, আমি কোথাও যাইনি।

—কলকাতাতেও না ?

—কলকাতা তো কলকাতা। বলে এখনো রাণাঘাট কি রকম শহর তাই দেখিনি ! রাজী হয়ে গেল বাবা তাই, নইলে আমার আসা হত না। পিদিম দেখানোর জন্যেই তো যত গোলমাল।

আশ্চর্যের ওপর আশ্চর্য। ধর্মদাসপুরে এসে গাড়ি দাঁড়িয়েছে ছায়ায়। এখনি এল ধর্মদাসপুরে ! কেদার খাজনা আদায় করতে বেরিয়েছেন সকালে—বেলা এগারোটার কমে ধর্মদাসপুরে পৌঁছুতে পারেননি। আর সেই ধর্মদাসপুর পার হয়ে গেল বড় জোর চল্লিশ মিনিটে—কি তারও কমে।

শরৎকে বললেন, মা, এই দ্যাখো ধর্মদাসপুর গেল, সেই যে একবার ওল এনেছিলাম মনে আছে ?সে এখান থেকে নিয়ে গিয়েছিলাম। কি জোরে যাচ্ছে একবার ভেবে দ্যাখো দিকিন্ ?...হ্যাঁ, গাড়ি বের করেছে বটে সায়েবরা।

শরৎ ক্রমাগত ছেলেমানুষের মতো প্রশ্ন করতে লাগল, বাবা—আর কত দেরি আছে কলকাতা ?কতক্ষণে আমরা কলকাতা পৌঁছব ?

প্রায় ঘণ্টাচারেক একটানা ছোটার পরে একটা শহরে বাজারের মতো জায়গায় গাড়ি ঢুকল। কেদার বললেন, এটা কি জায়গা ?

প্রভাস বললে, এটা বারাসাত। আর বেশি দূর নেই কলকাতা। এখান থেকে একটু চা খেয়ে নেবেন কাকাবাবু ?

কেদার বললেন, কেন, এখানে কি তোমার কোনো জানাশুনো লোকের বাড়ি আছে নাকি ?চা খাবে কোথায় ?

—না, জানাশুনো কেউ নেই। দোকানে খাব। চায়ের দোকান আছে অনেক—

—না বাপু। তোমরা খাও, আমি দোকানের চা কখনো খাইনি, ও আমার ঘেন্না করে। আমি বরং একটু তামাক ধরিয়ে খাই, অনেকক্ষণ তামাক খাওয়া হয়নি।

দোকানের চা শরৎও খেলে না। অরুণ ও প্রভাস নিজেরা গাড়ির কাছে চা আনিয়ে খেলে। কেদার আরাম করে হুঁকো টানতে টানতে বললেন, চা ভালো ?

প্রভাস ব্যস্ত হয়ে উঠে বললে, কেন, মন্দ না ! খাবেন, আনব ?

—না, আমি সেজন্যে বলছি নে। আমি দোকানের চা কখনো খাইনি, ও খাবোও না কখনো। তোমরা খাও। আমরা সেকেলে মানুষ, আমাদের কত বাচবিচার।

গাড়ি ছেড়ে যশোর রোড দিয়ে অনেকখানি এসে একটা বড়লোকের বাগানবাড়ির মধ্যে ঢুকল। ফটক থেকে লাল সুরকির রাস্তা সামনের সুদৃশ্য অট্টালিকাটির গাড়িবারান্দাতে গিয়ে শেষ হয়েছে। পথের দু-ধারে এরিকা পামের বড় বড় চারা গাছ, ক্রোটন, শেফালি, চাঁপা, আম, গোলাপজাম প্রভৃতি নানারকম গাছ।

প্রভাস বললে, আপনারা নামুন—এবেলা এখানে থাকবেন আপনারা। এটা অরুণদের বাগানবাড়ি, ওর দাদামশায়ের তৈরি বাড়ি এটা।

কেদার ও শরৎ দুজনেই বাড়ি দেখে আনন্দে ও বিস্ময়ে নির্বাক হয়ে গেলেন। এমন বাড়িতে বাস করবার কল্পনাও কখনো তাঁরা করেননি। মার্বেল পাথরে বাঁধানো মেজে, ছোট বড় আট-দশটা ঘর। বড় বড় আয়না, ইলেকট্রিক পাখা, আলো, কৌচ, কেদারা। তবে দেখে মনে হয় এখানে যেন কেউ বাস করেনি কোনো দিন, সব জিনিসই খুব পুরোনো—দু-একটা ঘর ছাড়া অন্য ঘরগুলোতে ধুলো, মাকড়সার জালে বোঝাই।

কেদার কথাটা বললেন প্রভাসকে।

প্রভাস বললে, ওর দাদাবাবু শৌখিন লোক ছিলেন, তিনি মারা গিয়েছেন আজ বছর কয়েক। এখন মাঝে মাঝে অরুণরা আসে—সব সময় কেউ থাকে না।

শরৎ বললে, এটাই কলকাতা প্রভাসদা ?

—না, এটাকে বলে দমদম। এর পরেই কলকাতা শুরু হল। তোমরা বিশ্রাম করো—ওবেলা কলকাতা বেড়িয়ে নিয়ে আসব। এখুনি ঝি আসবে, যা দরকার হয় বলে দিয়ো ঝিকে—সব গুছিয়ে এনে দেবে। ঠাকুর আসবে এখন—

শরৎ বললে, কি ঠাকুর ?

—রান্না করতে আসবে ঠাকুর।

—বাবা ঠাকুরের হাতে রান্না খেতে পারবেন না প্রভাসদা, ঠাকুর আসবার দরকার নেই। আমি আছি তবে কি জন্যে ?

—কলকাতায় এলে, একটু বেড়াবে না, বসে বসে রান্না করবে গড়শিবপুরের মতো ?বাঃ—

—তা হোক্ গে। আমার রান্না করতে কতক্ষণ যাবে বলুন তো ?ক'জন লোকের রান্না করতে হবে ?

প্রভাস ও অরুণ শরতের প্রশ্ন শুনে হেসে ফেললে। প্রভাস বললে—ক'জন লোকের রান্না আবার ! তোমাদের দুজনের, আবার কে আসবে তোমার এখানে খেতে ?তুমি তো আর রাঁধুনী বামনী নও যে দেশসুদ্ধ লোকের রেঁধে বেড়াবে ?আচ্ছা, আমরা এখন আসি কাকাবাবু, বিকেলে ছ'টার সময় আবার আসব। মলঙ্গা লেনে আমাদের যে বাড়ি আছে সেখানে নিয়ে যাব ওবেলা।

ওরা গাড়ি নিয়ে চলে গেলে কেদার আর একবার তামাক সাজতে বসলেন।

শরৎ চারিদিকে বেড়িয়ে এসে বললে, বাঃ চমৎকার জায়গা। ওদিকে একটা বাঁধা ঘাটওয়ালাপুকুর। দেখবে এসো না বাবা ! তোমার কেবল তামাক খাওয়া আর তামাক খাওয়া ! এই তো একবার খেলে বারাসাত না কি জায়গায় !

কেদার অগত্যা উঠে মেয়ের পিছু পিছু গিয়ে পুকুর দেখে এলেন। বাঁধা ঘাট অনেক দিনের পুরোনো—কতকাল এ ঘাট যেন কেউ ব্যবহার করেনি। পুকুরের ওপারেও বাগান, কিন্তু ওদিকটাতে আগাছার জঙ্গল বড় বেশি।

শরৎ বললে, বাবা, খিদে পেয়েছে ?

—নাঃ—

—ঠিক পেয়েছে বাবা। উড়িয়ে দিলে শুনব না। ভাঁড়ারে জিনিসপত্র সব আছে দেখে এসেছি—হালুয়া আর লুচি করে আনি ?

কেদার চুপ করে তামাক টানতে লাগলেন, মেয়ের কাজে বাধা দেবার বিশেষ কোনো লক্ষণ প্রকাশ করলেন না অবিশ্যি। শরৎ কিন্তু অল্প একটু পরে রান্নাঘর থেকে ফিরে এসে বললে—বাবা, মুশকিল বেধেছে—

কি রে ?

—এখানে তো দেখছি পাথুরে কয়লা জ্বালানো উনুন। কাঠের উনুন নেই। কয়লা কি করে জ্বালতে হয় জানি নে যে বাবা ! ঝি না এলে হবেই না দেখছি।

শরৎ ছেলেমানুষের মতো আনন্দে বাগানের সব জায়গায় বেড়িয়ে ফুল তুলে ডাল ভেঙে এ গাছতলায় লোহার বেঞ্চিতে বসে ও গাছতলায় লোহার বেঞ্চিতে বসে বসে উৎপাত করে বেড়াতে লাগল। বেশ সুন্দর ছায়াভরা বাগান। কত রকমের ফুল—অধিকাংশই সে চেনে না, নামও জানে না। কেদার মেয়ের পীড়াপীড়িতে এক জায়গায় গিয়ে লোহার বেঞ্চিতে খানিকটা বসে কলের পুতুলের মতো দু-একবার মাথা দুলিয়ে বলতে লাগলেন—বাঃ, বেশ— বাঃ—

বেলা যখন বেশ পড়ে এসেছে, তখন প্রভাস মোটর নিয়ে এসে বললে—আসুন কাকাবাবু, চলো শরৎ—কাকাবাবুকে কিছু খাইয়েছ ?

শরৎ হেসে বললে, তা হয়নি। ঝি তো মোটেই আসেনি।

—তুমি তো বললে তুমিই করবে ? জিনিসপত্র তো আছে—

—কয়লার উনুনে জ্বাল দিতে জানি নে, কয়লা ধরাতে জানি নে। তাতেই তো হল না।

প্রভাস চিন্তিতমুখে বলল, তাই তো ! এ তো বড় মুশকিল হল !

কেদার বললেন, কিছু মুশকিল নয় হে প্রভাস। চলো তুমি, ফিরে এসে বরং জলযোগ করা যাবে—

প্রভাস বললে, যদি নিকটের ভালো দোকান থেকে কিছু মিষ্টি কিনে আনি, তা আপনার চলবে না কাকাবাবু?

শরৎ হেসে বললে, বাবা ও-সব খাবেন না প্রভাসদা, তা ছাড়া আমি তা খেতেও দেব না। কলকাতা শহরে শুনেছি বড় অসুখ-বিসুখ, যেখান সেখান থেকে খাবার খাওয়া ওঁর সইবে না।

অগত্যা সকলে মোটরে উঠে বসলেন, গাড়ি ছাড়ল।

প্রথমে যশোর রোডের দু-ধারে বাগানবাড়ি ও কচুরিপানা-বোঝাই ছোট বড় জলা ছাড়িয়ে বেলগেছের মোড়ের আলোকোজ্জ্বল দৃশ্য দেখে পিতাপুত্রী বিস্ময়ে নির্বাক হয়ে পড়ল। ওদের দুজনের মুখে আর কোনো কথা নেই। গাড়ি ওখান থেকে এসে পড়ল কর্নওয়ালিস স্ট্রীটে—এবং দু-ধারে দোকানপসার, থিয়েটার সিনেমা, ইলেকট্রিক আলোর বিজ্ঞাপন, দোকানের বাইরে শো-কেসে বহুবিচিত্র কাপড়, পোশাক, পুতুল, আয়না, সেন্ট, সাবান, স্নো প্রভৃতির সুদৃশ্য সমাবেশের মধ্য দিয়ে গাড়ি এসে পড়ল হ্যারিসন রোডের মোড়ে এবং এখান থেকে গাড়ি ঘুরে গেল হাওড়ার পুলের ওপর, ওপার হয়ে হাওড়া স্টেশনের গাড়িবারান্দায় গিয়ে দাঁড়াল।

পুল পার হবার সময় প্রভাস বললে, এই দেখুন হাওড়ার পুল, নিচে গঙ্গা—আমরা যাচ্ছি হাওড়া স্টেশনে।

এবারও কেদার বা শরৎ কারো মুখ থেকে কোনো কথা বেরুল না।

প্রভাস গাড়ি থামিয়ে বললে, কাকাবাবু, চলুন স্টেশনের রেস্টোরেন্ট থেকে আপনাকে চা খাইয়ে আনি—খাবেন কি ?

কেদারের কোনো আপত্তি ছিল না কিন্তু মেয়ে বাপের পরকালের দিকে অত্যন্ত সতর্ক দৃষ্টি রেখেছে—বাবা নাস্তিক মানুষ—ওঁর এ বয়সে কোনো অশাস্ত্রীয় অনাচারের সংস্পর্শে কখনো সে আসতে দেবে না কেদার তা ভালো জানতেন। তিনি মেয়ের মুখের দিকে করুণ দৃষ্টিতে চাইলেন বটে, কিন্তু শরৎ তাঁর মুখের দিকে ভালো করে না চেয়েই বললে, চলুন প্রভাসদা, উনি ওখানে খাবেন না—

অগত্যা প্রভাস আবার গাড়ি ছেড়ে হাওড়ার পুলের ওপর এল এবং আস্তে আস্তে চলতে লাগল। আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বললে, ওই দেখুন সব জাহাজ, শরৎদি দ্যাখো সমুদ্রে যে সমস্ত জাহাজ যায়, ওই দাঁড়িয়ে আছে।

স্ট্র্যান্ড রোড দিয়ে গাড়ি এল আউট্রাম ঘাটে। ওদের দুজনকে নামিয়ে নিয়ে প্রভাস আউট্রাম ঘাটের জেটিতে গিয়ে একখানা বেঞ্চিতে বসল। সামনের গঙ্গাবক্ষে ছোট বড় স্টীমার বাঁশি বাজিয়ে চলেছে, বড় বড় ভড় ও বজরা ডাঙার দিকে নোঙর করে রেখেছে, সার্চলাইট ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে লাল একখানা বড় স্টীমার আস্তে আস্তে যাচ্ছে নদীর মাঝখান বেয়ে, সুবেশা নরনারীরা জেটির ওপর বেড়িয়ে বেড়াচ্ছে—চারিদিকে একটা যেন আনন্দ ও উৎসাহের কোলাহল।

একটা বড় বয়া ঢেউয়ের স্রোতে দুলছে দেখে শরৎ আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বললে, ওটা কি ?

প্রভাস বললে, জাহাজ বাঁধে ওই আংটাতে, বয়া বলে ওকে। আরো অনেক আছে নদীতে—

এতক্ষণে ওদের দুজনের কথা যেন ফুটল। কেদার নিশ্বাস ফেলে বললেন, বাপ্ রে, এ কি কাণ্ড ! হ্যাঁ শহর তো শহর, বলিহারি শহর বটে বাবা !

শরৎ বললে, সত্যি বাবা, এমন কখনো ভাবিনি। এ যেন জাদুকরের কাণ্ড ! আচ্ছা, এখানে জলের ওপর ঘর কেন ?

প্রভাস বুঝিয়ে দিয়ে বললে, শরৎদি, কাকাবাবুকে এবার চা খাওয়ানো চলবে এখানে ?খুব ভালো বন্দোবস্ত।

শরৎ রাজী হল না। বাবাকে পরকালে যমের বাড়ি সে কখনো পাঠাতে পারবে না। যা নাস্তিক উনি, এমনি কি গতি হয় ওঁর কে জানে ! তার ওপর রাশ আলগা দিলে কি আর রক্ষা আছে ?বাবা ধেই ধেই করে নৃত্য করে বেড়াবেন এই কলকাতা শহরে !

প্রভাসের নির্বন্ধাতিশয্যে শরৎ একটু বিরক্তই হল। সে যখন বলছে বাবা যেখানে সেখানে খাবেন না, তখন তাকে অত প্রলোভন দেখাবার মানে কি ?

বললে, আচ্ছা প্রভাসদা, ওঁকে খাইয়ে কেন বাবার জাতটা মারবেন এ কদিনের জন্যে ?ও কথাই ছেড়ে দিন।

এবার কিন্তু কেদার বিদ্রোহ ঘোষণা করে বললেন, হ্যাঁ:, যত সব ! একদিন কোথাও চা খেলেই একেবারে নরকে যেতে হবে ! নরক অত সোজা নয়, পরকালও অমন ঠুনকো জিনিস নয়। চলো সবাই মিলে চা খেয়ে আসা যাক হে—

শরৎ দৃঢ়স্বরে বললে, না, তা কখনো হবে না। যাও দিকি—সন্দে-আহ্নিক তো করো না কোনোকালে, আবার ছত্রিশ জাতের জল না খেলে চলবে না তোমার বাবা ?

কেদারের সাহসের ভাণ্ডার নিঃশেষ হয়ে গেল। প্রভাসও আর অনুরোধ করলে না, তিনিও আর যেতে চাইলেন না। ওখান থেকে সবাই এল ইডেন গার্ডেনে। রাত প্রায় সাড়ে আটটা, বহু সুসজ্জিত সাহেব-মেমকে বেড়াতে দেখে শরৎ তো একেবারে বিস্ময়ে স্তম্ভিত। এত সাহেব-মেম একসঙ্গে কখনো দেখা দূরে থাক, কল্পনাও করেনি কোনো দিন। শরৎ হাঁ করে একদৃষ্টে এরিকা পামের কুঞ্জের মধ্যে বেঞ্চিতে উপবেশনরত দুটি সুবেশ, সুদর্শন সাহেব ও মেমের দিকে চেয়ে রইল। হঠাৎ কি ভেবে তার চোখ দিয়ে জল ঝরে পড়তেই আঁচল দিয়ে ক্ষিপ্রহস্তে সে মুছে ফেললে। শরতের মনে পড়ল, গ্রামের লোকের দুঃখদারিদ্র্য,কত ভাগ্যহত, দীনহীন ব্যক্তি সেখানে, কখনো জীবনে আনন্দের মুখ দেখলে না। ব্যান্ডস্ট্যান্ডে ব্যান্ড বাজছিল অনেকক্ষণ থেকে। শরৎ অনেকক্ষণ বাবার সঙ্গে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বাজনা শুনলে। কিন্তু ওর ভালো লাগল না, সবই যেন বেসুরো, তার অনভ্যস্ত কানে পদে পদে সুরের খুঁৎ ধরা পড়ছিল।

প্রভাস বললে, সিনেমা দেখবে তো বলো নিয়ে যাই !

শরৎ কখনো না দেখলেও সিনেমা সম্বন্ধে গড়শিবপুরে থাকতেই শহর-প্রত্যাগত নববিবাহিতা বালিকা কিংবা বধূদের মুখে অনেক গল্প শুনেছে। বাবাকে এমন জিনিস দেখাতেই হবে, সে নিজে দেখুক না দেখুক, কিন্তু আজ আর নয়—বাবার কিছু খাওয়া হয়নি বিকেল থেকে। একবার তার মনে হল বাবা চা খেতে চাইছেন, খান বরং কোনো ভালো পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন দোকানে বসে ! কি আর হবে: বাবা যা নাস্তিক, এত বয়েস হল, একবার পৈতেগাছটা হাতে করে গায়ত্রী জপটাও করেন না কোনোদিন, পরকালে ওঁর অধোগতি ঠেকাবার সাধ্যি হবে না শরতের—সুতরাং ইহকালে যে কদিন বাঁচেন, অন্তত সুখ করে যান। ইহকালে পরকালে দু-কালেই কষ্ট করে আর কি হবে ?

শরৎ বললে, বাবাকে চা খাইয়ে নিই কোনো দোকানে বসে। ভালো দোকান দেখে—ব্রাহ্মণের দোকান নেই?

কেদার অবাক হয়ে মুখের দিকে চাইলেন। প্রভাস বিপন্ন মুখে বললে, ব্রাহ্মণের দোকান—তাই তো—ব্রাহ্মণের দোকান তো এদিকে দেখছি নে—আচ্ছা হয়েছে—এক উড়ে বামুন ঘড়া করে চা বেচে ওই মোড়টাতে, ভাঁড়ে করে দেয়—সেই সবচেয়ে ভালো। চলুন নিয়ে যাই।

চা-পান শেষ করে ওরা আবার মোটরে চৌরঙ্গী পার হয়ে পার্ক স্ট্রীটের মোড় পর্যন্ত গেল। এক জায়গায় এসে কেদার বললেন, এখানটাতে একটু নেমে হেঁটে দেখলে হত না প্রভাস ?বেশ দেখাচ্ছে—

গাড়ি এক জায়গায় রেখে ওরা পায়ে হেঁটে চৌরঙ্গীর চওড়া ফুটপাথ দিয়ে আবার ধর্মতলার মোড়ের দিকে আসতে লাগল। দোকান-হোটেলগুলির আলোকোজ্জ্বল অভ্যন্তর ও শো-কেসগুলির পণ্যসজ্জা ওদের একেবারে তাক লাগিয়ে দিয়েছে—শরৎ তো একেবারে বিস্ময়বিমুগ্ধ !

কতকাল মেয়েমানুষ হয়েও সে জিনিসপত্রের লোভ করেনি। জিনিসপত্র অধিকার করে রাখবার মেয়েদের যে স্বাভাবিক প্রবৃত্তি চেপে চেপে রাখে মনের মধ্যে, শরতের সে-সব বহুদিন চলে গিয়েছিল মন থেকে মুছে—কিন্তু আজ যেন আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে তারা।

একটা দোকানে ক্রিস্ট্যালের চমৎকার ফুলদানি দেখে শরৎ ভাবলে—আহা, একটা ওইরকম ফুলদানি কেনা যেত !—বুনোফুল কত ফোটে এই সময় কালো পায়রা দীঘির পাড়ের জঙ্গলে, সাজিয়ে রাখত সে রোজ রোজ। একটা চমৎকার পুতুল সাদা পাথরের, একটা কি অদ্ভুত কাচের বল, তার মধ্যে বিজলির আলো জ্বলছে...কি চমৎকার চমৎকার শাড়ি একটা বাঙালির দোকানে, রাজলক্ষ্মীর জন্যে ওইরকম শাড়ি একখানা যদি নিয়ে যাওয়া যেত ! জন্মে সে এরকম রঙের আর এরকম পাড়ের শাড়ি কখনো দেখেনি।

প্রভাস বললে, এটাকে বলে নিউমার্কেট। চৌরঙ্গী ছাড়িয়ে এলাম—চলুন শরৎদির জন্যে কিছু ফল কিনি।

শরৎ বললে, না, আমার জন্যে আবার কেন খরচ করবেন প্রভাসদা ?ফল কিনতে হবে না আপনার।

প্রভাস ওদের কথা না শুনে ফলের দোকানের দিকে সকলকে নিয়ে গেল। এর নাম ফলের দোকান। শরৎ ভেবেছিল, বুঝি ঝুড়িতে করে তাদের দেশের হাটের মতো কলা, পেঁপে, বাতাবিনেবু বিক্রি হচ্ছে রাস্তার ধারে—এরই নাম ফলের দোকান। কিন্তু কি এ ব্যাপার ?এত স্তূপীকৃত বেদানা,কমলালেবু, কিশমিশ, আনারস, আঙুর যে এক-জায়গায় থাকতে পারে, এ কথা সে জানত এখানে আসবার আগে। তবুও তো এগুলো তার পরিচিত ফল, পাড়াগাঁয়ের মেয়ে—অন্য কতশত প্রকারের ফল রয়েছে যা সে কখনো চক্ষেও দেখেনি—নামও শোনেনি।

শরৎ জিজ্ঞেস করলে, কাগজে জড়ানো জড়ানো ওগুলো কি ফল প্রভাসদা ?

—ও আপেল, কালিফোর্নিয়া বলে একটা দেশ আছে আমেরিকায়, সেখান থেকে এসেছে। তোমার জন্যে নেব শরৎদি ?আর কিছু আঙুর নিই, কাকাবাবু আনারস ভালোবাসেন ?

একটা বড় ঠোঙায় ফল কিনে ওরা নিউমার্কেটের বিভিন্ন দিকে বেড়াতে বেড়াতে এক জায়গায় এল—সেখানে একটা আস্ত বাঘের হাঁ-করা মুণ্ডু মেঝের ওপর দেখে শরৎ চমকে উঠে বাবাকে দেখিয়ে বললে, বাবা, একটা বাঘের মাথা !

কেদারও অবাক হয়ে চেয়ে রইলেন সেদিকে।

প্রভাস বললে, এরা জন্তুর চামড়া আর মাথা এরকম সাজিয়ে বিক্রি করে। এদের বলে ট্যাক্সিডারমিস্ট। এরকম অনেক দোকান আছে।

এইবার সত্যি সত্যি একটা জিনিস পছন্দ হয়েছে বটে শরতের। ওই বাঘের মুণ্ডুসুদ্ধ ছালখানা। তার নিজের শাড়ির দরকার নেই, গহনার দরকার নেই—সে-সব দিন হয়ে গিয়েছে তার জীবনে। কিন্তু এই একটা পছন্দসই জিনিস যদি সে নিজের দখলে নিজের ঘরে সাজিয়ে রাখতে পারত, তবে সুখ ছিল পাঁচজনকে দেখিয়ে, নিজে পাঁচবার দেখে, পাঁচজনকে ওর গল্প করে। ডেকে এনে পাঁচজনকে দেখাবার মতো জিনিস বটে।

মুখ ফুটে সে প্রভাসকে দামটা জিজ্ঞেস করলে। প্রভাস দোকানে ঢুকে বললে, ওটা বিক্রির জন্যে নয়।—দোকান সাজাবার জন্যে। তবে এরকম ওদের আছে,—আড়াইশো টাকা দাম।

অরুণ বললে, এখন কোথায় যাওয়া হবে ?

প্রভাস বললে, কেন, সিনেমায় ?কি বলেন কাকাবাবু—

শরতের যদিও সিনেমা দেখবার আগ্রহ খুবই প্রবল, তবুও সে যেতে রাজী হল না। বাবা সেই কোন্ সকালে দুটো খেয়ে বেরিয়েছেন, এখন গিয়ে রান্না না চড়িয়ে দিলে আবার তিনি কখন খাবেন ?

অগত্যা সকলে মোটরে আলোকোজ্জ্বল কলিকাতা নগরীর বিরাট সৌন্দর্যের মধ্যে দিয়ে এল আবার সেই বেলগেছের পুলের মুখে।

শরৎ এতক্ষণ চুপ করে ছিল, এইবার বললে, বাবাঃ, কত বড় শহর। কুলও নেই, কিনারাও নেই !

প্রভাস হেসে বললে, শরৎদি, একি আর তুমি ধর্মদাসপুর পেয়েছ ?গড়শিবপুর থেকে ধর্মদাসপুর যত বড়—ততখানি লম্বা হবে কলকাতা। আজ চলো, কাল আবার ভালো করে দেখো। আমাদের মলঙ্গা লেনের বাড়িতেও নিয়ে যাব।

বেলগেছের পুল ছেড়ে দু-ধারের দৃশ্য যেন অনেকটা পাড়াগাঁয়ের মতো। বড় বড় বাগানবাড়ির ঘন বৃক্ষশ্রেণীর অন্তরালে দু-চারটি বিজলি বাতি, কোনো কোনো বাগানবাড়ি একদম অন্ধকার। এখানে এক পশলা বৃষ্টি আসতে গাড়ির জানলার কাচ উঠিয়ে দেওয়া হল হ্যান্ডেল ঘুরিয়ে—খাড়া সোজা পথ তীব্র হেডলাইটের আলোয় স্পষ্ট ফুটে উঠেছে চোখের সামনে—দ্রুতগামী মোটর লম্ফে লম্ফে যেন সে সুদীর্ঘ পথটার খানিকটা করে অংশ এক এক কামড়ে গিলে খাচ্ছে। শরৎ হাঁ করে চেয়ে রইল।

ওদের বাগানবাড়িটার ফটক দিয়ে গাড়ি ঢুকল ভেতরে।

এ বাগানটা যেন আরো অন্ধকার। তবে সব ঘরেই বিজলি বাতির বন্দোবস্ত।

প্রভাস কি টিপলে—পুটুস্ পুটুস্—এ ঘরে আলো জ্বলে উঠল সবুজ কাচের বড় চিমনির মধ্যে দিয়ে—বারান্দায় পুটুস্ পুটুস্—দীর্ঘ বারান্দায় এদিক থেকে ওদিকে তিনটে আলো জ্বলে উঠল।

শরৎ বললে, আমায় দেখিয়ে দিন প্রভাসদা কি করে জ্বালতে হয়—

পুটুস্—বাতি নিবে গেল—একদম অন্ধকার।

—এইটে হাত দিয়ে টেপোশরৎদি—এই দেখো—এই জ্বলল—আবার উঠিয়ে দাও—এই নিবে গেল—

শরৎ বালিকার মতো খুশিতে বার বার সুইচ টিপে আলো একবার জ্বালিয়ে একবার নিবিয়ে দেখতে লাগল।

—বাবা, দ্যাখো কি রকম, তুমি এরকম দ্যাখোনি—

কেদার তাচ্ছিল্যের সুরে বললেন, ওসব তুমি দ্যাখো মা। আমি এর আগেও দেখেছি, ওসব দেখে গিয়েছি—

শরৎ বললে, সে কবে বাবা ?তুমি আবার কবে কলকাতায় এসেছিলে শুনি ?

—তুই তখন জন্মাসনি। কলকাতায় তখন ঘোড়ার ট্রাম চলত। তোর মার জন্যে বড়বাজার থেকে ভালো তাঁতের ডুরে-শাড়ি কিনে নিয়ে গিয়েছিলাম, তাই দেখে তোর মার কি আহাদ !..তখন ইলেকটিরি আলো সব রাস্তায় ছিল না, দু-একটা বড় রাস্তায় দেখেছিলাম। লোকের বাড়িতে তখন গ্যাস জ্বলত—

প্রভাস বিস্ময়ের সুরে বললে, সত্যি কাকাবাবু, আপনি যা বলছেন ঠিক তো ! আমি বাবার মুখেও শুনেছি প্রথম হ্যারিসন রোডে ইলেকট্রিক লাইট জ্বলে, তখন—

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, ওই যে রাস্তা বললে, ওখানেই আমি দেখেছি—অনেক দিনের কথা।

ইতিমধ্যে ঝি এসে জানাল, উনুনে আঁচ দেওয়া হয়েছে। শরৎ তাড়াতাড়ি রান্নাঘরের দিকে গেল—যাবার সময় বলে গেল, বোসো বাবা, ভালো করে চা করে আনি—প্রভাসদা, অরুণবাবু যাবেন না চা না খেয়ে।

রাত সাড়ে ন'টার মধ্যে ক্ষিপ্তহস্তে রান্না-বাড়া সাঙ্গ করে শরৎ বাবাকে খাওয়ার ঠাঁই করে দিলে। প্রভাস ও অরুণ তার অনেক আগে চা-পান করে বিদায় নিয়েছে।

শরৎ মাথা দুলিয়ে বললে, ভাত কিন্তু নয় বাবা—লুচি—

—যা হয় দাও মা। লুচি কেন ?

—লুচির বন্দোবস্ত দেখি করে রেখেছে। ঘি, আটা—চাল আনেনি—

—বেশ ভালোই হল—তুই খেতে পাবি এখন—

—বোসো, গরম গরম আনি—

পরম তৃপ্তির সহিত প্রায় বিশ-বাইশখানা লুচি অনর্গল খেয়ে, খাওয়ার পরে কেদারের মনে পড়ল, আর বেশি খাওয়া ঠিক হবে না—মেয়ের লুচিতে টান পড়বে।

শরৎ আবার যখন দিতে এল, বললে, নাঃ আর না, থাক্।

—কেন দিই না এই দুখানা গরম গরম—

—তোমার জন্যে আছে তো ?

—ওমা, সে কি ! প্রায় আধসেরের ওপর আটা—একপোয়া আটার লুচি আমি খেতে পারি না, তুমি পারো ?

—খুব পারি। ওকথা বলো না মা—এক সময়ে...

—তোমার তো বাবা কেবল এক সময়ে আর এক সময়ে ! এখন পারো না তো আর ?

—খুব পারি—

—পারলেও আর দেব না। খেয়ে ওঠো—বিদেশবিভুঁই জায়গা—দাঁড়াও দইটা নিয়ে এসে দিই—দই আছে, মিষ্টি আছে—

আহারাদি সেরে পরিতৃপ্তির সঙ্গে তামাক টানতে টানতে কেদার মেয়েকে বললেন, প্রভাস ছোকরা ভালো। বেশ জোগাড় আয়োজন করেছে খাওয়ার—কি বলিস্ মা ?

—চমৎকার, আবার কি করবে ?

—ফলগুলো কেটেছিস্ নাকি ?

—না বাবা, কাল সকালে কাটব, তোমায় দেব। আজ তো লুচি ছিল, তাই খেলাম।

—বড্ড নির্জন বাগানটা—না ?

—গড়ের জঙ্গলের চেয়ে নির্জন নয় তা বলে। ওই তো রাস্তা দিয়ে মোটরগাড়ি যাচ্ছে, আর গড়ের জঙ্গলে যে-সময়ে শেয়াল ডাকে, বাঘ বের হয়।

—তা যা বলিস্ বাপু, সেখানে যতই জঙ্গল হোক, জন্মভূমি তো বটে। সেখানে ভয় হয়—তুই সত্যি করে বল তো ?

—ভয় হলে কি থাকতে পারতাম বাবা ?ছেলেবেলা থেকে কাটালাম কি করে তবে ?

—কিন্তু এখানে কেমন যেন ভয় করে মা। কলকাতা শহর যেমন, তেমন গুণ্ডা-বদমাইশের জায়গা।

সারাদিন মোটর ভ্রমণের ক্লান্তির ফলে রাত যেন কোথা দিয়ে কেটে গেল।

পরদিন সকালে শরৎ বাথরুমে ঢুকে স্নান সেরে নিয়ে বাবার জন্যে চা আর খাবার করতে বসল। অনেকদিন পরে সে বাবাকে ভালো করে খাওয়ানোর সচ্ছল উপকরণ হাতের কাছে পেয়ে তার সদ্ব্যবহার করতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে।

কেদার বললেন, প্রভাস আর অরুণের জন্যে খাবার করে রাখো মা, যদি ওরা সকালে এসে পড়ে ?

কিন্তু তারা সকালের দিকে এল না।

দুপুরের পর কেদার একটু ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। তাঁর দিবানিদ্রা অভ্যাস নেই—অথচ রাস্তাঘাট না চেনার দরুন কোথাও যেতে পারেন না। এই বাগানবাড়ির চতুঃসীমায় বন্দী-জীবন যাপন করার মত লোক নন তিনি।

শরৎকে ডেকে বললেন, হ্যাঁ মা, গঙ্গা কোন্‌দিকে ঝিকে জিজ্ঞেস করো তো ?

শরৎ ঘুরে এসে বললে, গঙ্গা নাকি এখান থেকে দুক্রোশ পথ, বাবা। কেন, গঙ্গা কি হবে ?

—না, একটু বেরিয়ে আসতাম গঙ্গার ধারে।

বেলা তিনটের পর প্রভাস একা মোটর হাঁকিয়ে এল।

বললে, ওবেলা কাজ ছিল জরুরি—আসতে পারলাম না। কোনো অসুবিধে হয়নি তো কাকাবাবু ?

—নাঃ অসুবিধে কি হবে ?অরুণ এল না ?

—তার সঙ্গে দেখাই হয়নি আজ সারাদিন। তবে সে-ও কাজে ব্যস্ত আছে মনে হচ্ছে। নইলে নিশ্চয় আসত।

—তুমি চা খেয়ে নাও শরৎ মা, তোমার প্রভাসদাকে—

আধ ঘণ্টার মধ্যে কেদার চা-পান শেষ করে মেয়েকে নিয়ে মোটরে উঠলেন। বললেন, কলকাতার দিকে না গিয়ে এবার চলো না বেশ গঙ্গার ধারে নির্জন জায়গায়—

—পেনেটিতে দ্বাদশ শিবের মন্দিরে যাবেন ?

শরৎ আগ্রহের সুরে বললে, তাই চলো প্রভাসদা, দেখিনি কখনো।

কেদার শিবমন্দির দেখবার কোনো আগ্রহ দেখালেন না—তীর্থদর্শনে পুণ্যঅর্জন করবার ওপর লোভ জীবনে তাঁর কোনো দিনই দেখা যায়নি।

বারাকপুর ট্রাঙ্ক রোডে পড়ে মোটর তীরবেগে পেনিটির দিকে ছুটল। রাস্তার দুধারে কত বিচিত্র উদ্যানরাজি, কত সুন্দর বাড়ি—কলকাতার বড়লোকেদের ব্যাপার। পেনিটির দ্বাদশ শিবের মন্দির দেখে শরৎ খুব খুশি। সামনে গঙ্গা, ওপারে কত কলকারখানা, মন্দির, ঘরবাড়ি। এপারে সারিসারি বাগানবাড়ি—বিকেলের নীল আকাশ গঙ্গার বিশালবক্ষে ঝুঁকে পড়েছে— নৌকো স্টীমারের ভিড়।

শরৎ অবাক হয়ে গঙ্গার বাঁধাঘাটে রানার ওপর দাঁড়িয়ে দেখে দেখে বললে—এমন কখনো দেখিনি বাবা, ওপারের দিকটা কি চমৎকার।

প্রভাস বললে, ভালো লাগছে, শরৎদি ?

—উঃ, ইচ্ছে করে এখানেই সব সময় থাকি আর গঙ্গাস্নান করি—ভালো কথা প্রভাসদা, কাল গঙ্গা নাওয়াও না কেন ?

—বেশ ভালোই তো। কোন্ সময়ে আসব বলো—কোথায় নাইবে ?

—এখানেই এসো। এ জায়গা আমার ভারি ভালো লেগেছে—

—এখানেই আসবে ?না কালীঘাটে ?কাকাবাবু কি বলেন ?

—তুমি যেখানে ভালো বোঝো। বাবার কথা ছেড়ে দাও—উনি ওসব পছন্দ করেন না।

সন্ধ্যার আগে অস্ত-দিগন্তের চিত্রবিচিত্র রঙিন আকাশের ছায়া গঙ্গার জলে পড়ে যে মায়ালোক সৃষ্টি করল, শরৎ সেরকম দৃশ্য জীবনে কোনোদিন দেখেনি। গড়শিবপুর জলের দেশ নয়—এত বড় নদী, জলের বুকে এমন রঙিন মেঘের প্রতিচ্ছায়া সে এই প্রথম দেখল। রাজলক্ষ্মীর জন্যে মনটা কেমন করে উঠল শরতের—সে বেচারি কিছু দেখতে পেলে না জীবনে, আজ সে সঙ্গে থাকলে আনন্দ অনেক বেশি হত।

বাড়ি ফিরে শরৎ রান্নাঘরে ঢুকল—প্রভাস কিছুক্ষণ বসে কেদারের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে লাগল।

কথায় কথায় কেদার বললে, হ্যাঁ হে, এখানে কোথাও গান-টান হয় না ?

আসলে কেদারের এসব খুব ভালো লাগছিল না—শহর, দেবমন্দির, গঙ্গা, দোকান, ট্রাম—এসব খুব ভালো জিনিস। কিন্তু তিনি একটু গান-বাজনা চান, চিরকাল যা করে এসেছেন। শরৎ ছেলেমানুষ, তার ওপর মেয়েমানুষ—ও শহর বাজার, ঠাকুর দেবতা দেখে খুশি থাকতে পারে—কেদারের এখন সে বয়েস নেই। মেয়েমানুষও নন যে পুণ্যের লোভ থাকবে।

প্রভাস বললে, কি রকম গান-বাজনা বলুন ?

—এই ধরো কোনো গান-বাজনার আড্ডা—শুনেছি তো কলকাতায় অনেক বড় বড় গানের মজলিশ বসে বড়লোকের বাড়ি। একদিন সে-রকম কোনো জায়গায় নিয়ে যেতে পারো ?

প্রভাস একটু ভেবে বললে, তা বোধ হয় পারব—দেখি সন্ধান নিয়ে। কাল বলব আপনাকে—

—অনেক শুনেছি বড় বড় ওস্তাদ আছে কলকাতায়, কোথায় থাকে জানো ?তাদের গান শোনবার সুবিধে হয় ?

—আমি দেখব কাকাবাবু। অরুণকে জিগ্যেস করি কাল—ও অনেক খোঁজরাখে—

প্রভাস মোটর নিয়ে চলে যাচ্ছে, এমন সময় শরৎ এসে বললে—ও প্রভাসদা, যাবেন না—

—কেন শরৎদি ?

—আপনার জন্যে একটা জিনিস তৈরি করছি—

—কি বলো না ?

—এখন বলছি নে—আসুন, খাবার সময় দেব—

—খুব দেরি হয়ে যাবে শরৎদি—

—কিছু দেরি হবে না, হয়ে গেল—গরম গরম ভেজে দেব—

কিছুক্ষণ পরে শরৎ একখানা রেকাবিতে খানকতক মাছের কচুরি এনে বললে—খেয়ে দেখুন কেমন হয়েছে। এবেলা ঝি ভালো পোনামাছ এনেছে প্রায় আধসের। অত মাছ রান্না করে কে খাবে ?তাই ভাবলাম বাবার জন্যে খান-কতক কচুরি ভাজি—

প্রভাস বললে, কাকাবাবুকে দিলে না ?

—তাঁকে এখন না। এখন খেলে রাত্রে আর খেতে পারবেন না। তখন একেবারে দেবো—

প্রভাস খাওয়া শেষ করে বিদায় নেওয়ার আগে বললে—কাল শরৎদি গঙ্গা নাওয়াব তোমায়। ভেবে রেখো কালীঘাট না পেনিটি কোথায় যাবে ?

কেদার বললেন, আমার কথাটা যেন মনে থাকে, প্রভাস। ভালো গান-বাজনার সন্ধান পেলেই খবর দেবে—

—সে আমার মনে আছে কাকাবাবু।

পরদিন সকালে উঠে কেদার দেখলেন মেয়ে তাঁর আগেই উঠে বাগানে ফুল তুলে বেড়াচ্ছে। বাবাকে দেখে বললে—ওঠো বাবা, আমি আজ পুজো করব ভেবে ফুল তুলছি। কি চমৎকার চমৎকার ফুল ফুটে আছে পুকুরের ওপাড়ে। তুমি চেনো এসব ফুল ?বিলিতি না কি ফুল—দেখিইনি কখনো—

কেদার বললেন, বেশ বাগানবাড়িটা, না মা শরৎ ?কিন্তু—

—কিন্তু কি বাবা ?

—এখানে বেশিদিন মন টেঁকে না। আমাদের গড়শিবপুরের সেই জঙ্গলা ভালো—না মা ?

—যা বলেছ বাবা। বাগানের পুকুরটা দেখে আমার এইমাত্র কালো পায়রার দীঘির কথা মনে পড়ছিল—

—আর কতদিন থাকবে এখানে ?প্রভাস কিছু বলেছে ?

—তুমি যে ক'দিন বলো বাবা। এখনো কালীঘাট দেখিনি, বায়স্কোপ দেখিনি—দেখি সেগুলো ?আর কি কি আছে দেখবার বাবা ?

—চিড়িয়াখানাটা আমার সেবারও দেখা হয়নি—এবার দেখব।

—সেবার মানে কি বাবা ?হয়তো ত্রিশ-বত্রিশ বছর আগেকার কথা। আমার জন্মাবার অনেক আগে—না ?

—হ্যাঁ—তা হবে। তোমার মায়ের জন্যে একখানা শাড়ি, বেশ ভালো ডুরে শাড়ি কিনে নিয়ে যাই, মনে আছে।

—তুমি হাত ধুয়ে নাও বাবা, আমি চা করে আনি—খাবার কি খাবে ?

এমন সময় গেটের পথে মোটরের শব্দ শোনাগেল—সঙ্গে সঙ্গে প্রভাসের মোটর এসে বারান্দার সামনের লাল কাঁকরের পথের ওপর এরিকা-পাম কুঞ্জের ছায়ায় দাঁড়িয়ে গেল। প্রভাস নেমে এসে বললে, চলুন কাকাবাবু, কালীঘাটে নিয়ে যাই—শরৎদি তৈরি হয়ে নাও।

শরৎ খুশিতে উৎফুল্ল হয়ে বললে, সে বেশ হবে প্রভাসদা, চলো বাবা, চা করে নিয়ে এলাম বলে, বসো সব।

সত্যিই এ কদিন অদ্ভুত উত্তেজনা ও আনন্দের মধ্যে শরতের দিনগুলো কেটে যাচ্ছে। কেদার বৃদ্ধ হয়েছেন, নতুন জায়গা এখন আর তাঁর মনে তেমন ধাক্কা দেয় না, জীবনের সমস্ত আকাশটা জুড়ে গড়শিবপুরের ভাঙা রাজ-দেউড়ি ও বনজঙ্গলে ঘেরা গড়খাই সেখানে পূর্ণ অধিকারের আসন পেতেছে, আর আছে ছিবাস মুদির দোকান, ওপাড়ার কৃষ্ণযাত্রার আখড়াইয়ের আসর—তার সঙ্গে হয়তো সতীশ কলুর দোকান—তাদের ছোট্ট খড়ের বাড়িখানা। এ বয়সে নতুন কোনো জিনিস জীবনে স্থান দখল করতে পারে না। জীবনের বৃত্ত পরিধিকে শেষ করে ওদিকের বিন্দুতে মিলবার চেষ্টায় রয়েছে—নব অনুভূতিরাজির সঞ্চার এ বয়সে সম্ভব কবি ও বৈজ্ঞানিকের পক্ষে, প্রতিভাবান শিল্পীর পক্ষে, কেদার সে দলে পড়ে না।

প্রভাসের মোটর এবার স্ট্র্যান্ড রোড ধরে চলল হ্যারিসন রোড দিয়ে। প্রভাস বললে, ইডেন গার্ডেনটা একবার দেখিয়ে নিয়ে যাই আপনাদের ?

কেদার বললেন, সেটা কি বাবাজি ?

—আজ্ঞে একটা বাগান, বেশ ভালো, সবাই বেড়াতে আসে।

—ও বাগান-টাগান আমরা আর কি দেখব, বন-বাগান তো দেখেই আসছি, তুমি বরং আমাদের কালীঘাটটা নিয়ে চল।

কালীঘাটে কালীমন্দিরের সামনের চত্বরে অরুণ দাঁড়িয়ে আছে, দেখতে পেয়ে শরৎ খুশির সুরে বললে—বাবা, ওই অরুণবাবু, ডাকুন না প্রভাসদা ?

প্রভাস বললে, এখানে আমাদের সঙ্গে মিশবার কথা ছিল ওর। ও অরুণ—এই যে !

শরৎ কালী-গঙ্গায় স্নান সেরে মন্দিরে দেবী দর্শন করে এল। সঙ্গে রইল প্রভাস। কেদার মোটরে বসে চারিপাশের ভিড় দেখতে লাগলেন। অরুণ একটা ছোট ঘর ভাড়ার চেষ্টায় গেল, কারণ প্রভাস ও অরুণ দুজনে শরৎকে বিশেষ করে ধরেছে, এখানে চড়ুইভাতি করতে হবে।

শরৎ বড় অস্বস্তি বোধ করে একটা ব্যাপারে। এখানকার লোকে এমনভাবে তার মুখের দিকে হাঁ করে চেয়ে আছে কেন ?শহরের লোকের এমন খারাপ অভ্যাস কেন ?আজ কদিন থেকেই সে লক্ষ্য করছে। অপরিচিত মেয়েদের দিকে অমনভাবে চেয়ে থাকা বুঝি ভদ্রতা ?শরতের জানা ছিল কলকাতার লোকে শিক্ষিত, তাদের ধরনধারণ খুব ভদ্র হবে, তাদের দেখে গড়শিবপুরের মতো পাড়াগাঁয়ের লোকেরা শিখবে। এখন দেখা যাচ্ছে তার উলটো।

অরুণ বাড়ি ঠিক করে এসে কেদারকে বললে, এরা কই ?চলুন এবার, সব ঠিক করে এলাম।

একটু পরে প্রভাসের সঙ্গে শরৎ মন্দির থেকে ফিরল। ওরা সবাই মিলে ভাড়াটে ঘরে গিয়ে শতরঞ্জি পেতে বসল। হোগলার ছাওয়া, দরমার বেড়া দেওয়া সারি সারি অনেকগুলো খুপরির মত ঘর। ছোট্ট একটুখানি নিচু দাওয়ায় মাটির উনুন। প্রভাস মোটরের ক্লিনারকে সঙ্গে নিয়ে গিয়ে প্রচুর বাজার করে নিয়ে এল, এমন কি প্রসাদী মাংস পর্যন্ত। কেদার খুব খুশি। মেয়েকে বললেন—ভালো করে মাংসটা রাঁধিস মা, একটু ঝাল দিস্।

—সে কি বাবা, ঝাল যে তুমি মোটে খেতে পারো না ?

—তা হোক, কচি পাঁটার মাংস ঝাল না দিলে ভালো লাগে না।

রান্না-খাওয়া মিটতে বেলা তিনটে বাজল। অরুণদের আবার কে একজন বন্ধু এসে ওদের সঙ্গে যোগ দিলে। লোকটি এসেই বলে উঠল—এই যে প্রভাস, আরে অরুণ এনেছিস্ তো জুত করে ! ভালো চীজ বাবা, তোদের সাহস আছে বলতে হবে !

প্রভাস তাড়াতাড়ি তাকে চোখ টিপে দিলে, শরৎ দেখতে পেল। কে কিছু বুঝতে পারলে না, লোকটা অমন কেন, এসেই চিৎকার করে কতকগুলো কথা বলে উঠল—যার কোনো মানে হয় না ! কলকাতা শহরে কত রকম মানুষই না থাকে।

কি জানি কেন, লোকটাকে শরতের মোটেই ভালো লাগল না। মোটা মতো লোকটা, নাম গিরীন, বয়সে প্রভাসের চেয়েও বড়, কারণ কানের পাশের চুলে বেশ পাক ধরেছে।

তিনটের পরে ওখান থেকে বেরিয়ে কিছু দূরে গিয়ে প্রভাস একটা বাগানের সামনে গাড়ি রেখে বললে—এই চিড়িয়াখানা কাকাবাবু, নেমে দেখুন এবার—

শরৎ সব দেখেশুনে সমস্ত দিনের কষ্ট ও শ্রম ভুলে গেল। কেদারও এমন এমন একটা জিনিস দেখলেন, যা তাঁর মনে হল না দেখলে জীবনে একটা অসম্পূর্ণতা থেকে যেত। পৃথিবীতে যে এত অদ্ভুত ধরনের জীবজন্তু থাকতে পারে, তার কল্পনা কে করেছিল ?কেদার তো ভাবতেই পারেন না। পিতাপুত্রীতে মিলে সমবয়সি বালক-বালিকার মতো আমোদে পশুপক্ষী দেখে বেড়াল। এ ওকে দেখায়, ও একে দেখায়। কী ভীষণ ডাক সিংহের ?জলহস্তী—এর নাম জলহস্তী ?ছেলেবেলায় 'প্রাণী-বৃত্তান্ত' বলে বইয়ে কেদার এর কথা পড়েছিলেন বটে। ওই দ্যাখো শরৎ মা, ওকে বলে উটপাখি।

কতবড় ডিম বাবা উটপাখির !আচ্ছা ও খায়, প্রভাসদা ?বিক্রি হয় ?

ফেরবার সময় গেটের কাছে এসে গিরীন প্রভাস ও অরুণের সঙ্গে কি সব কথা বললে। প্রভাস এসে বললে, কাকাবাবু, এবার চলুন সিনেমা দেখে আসি, মানে বায়োস্কোপ। কাছেই আছে—

কেদার বললেন, তা চলো, যা ভালো হয়।

বাইরে এসে ওরা একটা ফাঁকা মাঠের ধারে মোটর থামিয়ে রেখে কেদার ও শরৎকে নেমে হাওয়া খেতে বললে। এরই নাম গড়ের মাঠ। সেদিনও নেমেছিল শরৎ। তখন সন্ধ্যা হয়ে আসছে—রাস্তার ধারে গ্যাসের আলো এক-একটা করে জ্বেলে দিচ্ছে। শরৎ জিজ্ঞাসা করলে—সে বায়োস্কোপ কতক্ষণ দেখতে হবে ?প্রভাস বললে, এই সাড়ে ন'টা পর্যন্ত।

শরৎ ভেবে দেখলে, অত রাত্রে গিয়ে রান্না চড়ালে বাবা খাবেন কখন ?তা ছাড়া বাবা আজ সারাদিন এখানে ওখানে বেড়িয়ে শ্রান্ত হয়ে পড়েছেন—বুড়ো বয়সে অত অনিয়ম করলে যদি শরীর অসুস্থ হয়ে পড়ে বিদেশে—তখন ভুগতে হবে তাকেই। সে বললে, আজ থাক প্রভাসদা, আজ আর বায়স্কোপ দেখে দরকার নেই। বাবার খেতে দেরি হয়ে যাবে।

গিরীন তবুও নাছোড়বান্দা। সে বললে, কিছু ক্ষতি হবে না—মোটরে যেতে আর কতটুকু লাগবে ?আজই দেখা যাক।

শরৎকে অত সহজে ভোলানো যাবে তেমন প্রকৃতির মেয়ে নয় সে। নিজের বুদ্ধিতে সে যা ঠিক করে, ভালো হোক, মন্দ হোক, তার সে সঙ্কল্প থেকে নড়ানো গিরীনের কর্ম নয়—গিরীন শীঘ্রই তার পরিচয় পেলে। প্রভাসকে সে ইংরেজিতে কি একটা কথা বললে, প্রভাস ও অরুণ দুজনেঅনুচ্চস্বরে কি বলাবলি করল।

প্রভাস বললে, কাকাবাবু কি বলেন ?

কেদার নিজের মত অনুসারে চলবার সাহস পান, গড়শিবপুরে, এখানে মেয়ের মতের বিরুদ্ধে যেতে তাঁর সাহসে কুলোয় না। সুতরাং তিনি বললেন, ও যখন বলছে, তখন আজ না হয় ওটা থাকগে প্রভাস, কাল যা হয় হবে।

অগত্যা প্রভাস ওদের নিয়ে মোটরে উঠল—কিন্তু বেশ বোঝা গেল ওদের দল তাতে বিরক্ত হয়েছে।

পাঁচ

পরদিন প্রভাসের দলের কেউই বাগানবাড়িতে এল না। শরৎ সন্ধ্যার দিকে বাগানে আপনমনে খানিকটা বেড়িয়ে বাবাকে ডেকে বললে, বাবা খাবে নাকি ?

কেদার বললেন, আজ এরা কেউ এল না কেন রে শরৎ ?

—কি জানি বাবা ! বোধ হয় কোনো কাজ পড়েছে—

—তা তো বুঝলাম, কিন্তু যা দেখবার দেখে নিতে পারলে হত ভালো। আবার বাড়ি ফিরতে হবে সংক্রান্তির আগেই—

কেদারের আর তেমন ভালো লাগছিল না বটে, কিন্তু তিনি বুঝেছিলেন মেয়ের এত তাড়াতাড়ি দেশে ফিরবার ইচ্ছে নেই—তার এখন দেখবার বয়স, কখনো কিছু দেখেনি, আছে আজীবন গড়শিবপুরের জঙ্গলে পড়ে। দেখতে চায় দেখুক—তিনি বাধা দিতে চান না।

শরৎ বললে, পেঁপে খাবে বাবা ?বাগানের গাছ থেকে পেড়েছি, চমৎকার গাছ-পাকা ! নিয়ে আসি দাঁড়াও—

কেদার বললেন, আশপাশের বাগানবাড়িতে লোক থাকে কিনা জানিস কিছু মা ?

—চলো না, তুমি পেঁপে খেয়ে নাও—দেখে আসি।

মিনিট পনেরো পরে দুজনে পাশের একটা অন্ধকার বাগানবাড়ির ফটকের কাছে গিয়েদাঁড়াতেই একজন খোট্টা দারোয়ান ফটকের পাশের ছোট্ট একটা গুমটি ঘর থেকে বার হয়ে বললে, কেয়া মাংতা বাবুজি ?

কেদার হিন্দি বলতে পারেন না। উত্তর দিলেন, এ বাগানে কি আছে দারোয়ানজি ?

—বাবুলোক হ্যায়—মাইজি ভি হ্যায়—যাইয়ে গা ?

—হ্যাঁ, আমার এই মেয়েটি একবার বাগান দেখতে এসেছে—

—আইয়ে—

বেশ বাগান। প্রভাসদের বাগানের চেয়ে বড় না হলেও নিতান্ত ছোট নয়। অনেক রকম ফুলের গাছ, ফুল ফুটেও আছে অনেক গাছে—সানবাঁধানো পুকুরের ঘাট, খানিকটা জায়গা তার দিয়ে ঘেরা, তার মধ্যে হাঁস এবং মুরগি আটকানো। খুব খানিকটা এদিক-ওদিক লিচুতলা ও আমতলায় অন্ধকারে বেড়ানোর পরে ওরা একেবারে বাগানবাড়ির সামনের সুরকি বিছানো পথে গিয়ে উঠল। বাড়ির বারান্দা থেকে কে একজন প্রৌঢ়কণ্ঠে হাঁক দিয়ে বললেন, কে ওখানে ?

কেদার বললেন, এই আমরা। বাগান দেখতে এসেছিলাম—

একটি পঞ্চাশ-পঞ্চান্ন বছরের বৃদ্ধ ভদ্রলোক ধপধপে সাদা কোঁচানো কাপড় পরে খালিগায়ে রোয়াকে এসে দাঁড়িয়ে বললেন, আসুন আসুন—সঙ্গে মা রয়েছেন, তা উনি বাড়ির মধ্যে যান না ?আমার স্ত্রী আছেন—

শরৎ পাশের পাঁচিলের সরু দরজা দিয়ে অন্দরে ঢুকল। কেদার রোয়াকে উঠতেই ভদ্রলোক তাঁকে নিয়ে উপরে চেয়ারে বসালেন। বললেন, কোন্ বাগানে আছেন আপনারা ?

—এই দুখানা বাগানের পাশে। প্রভাসকে চেনেন কি বাবু ?

—না, আমি নতুন এ বাগান কিনেছি, কারুর সঙ্গে চেনা হয়নি এখনো। তামাক খান কি ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, তা খাই—তবে আমার আবার হ্যাঙ্গামা আছে—ব্রাহ্মণের হুঁকো না থাকলে—

—আপনি ব্রাহ্মণ বুঝি ?ও, বেশ বেশ। আমিও তাই, আমার নাম শশিভূষণ চাটুজ্যে— 'এঁড়েদার' চাটুজ্যে আমরা। ওরে ও নন্দে, তামাক নিয়ে আয়—

দুজনে কিছুক্ষণ তামাক খাওয়ার পরে চাটুজ্যে মশাই বললেন, আচ্ছা মশাই—এখানে টেক্স এত বেশি কেন বলতে পারেন—আমার এই বাগানে কোয়ার্টারে আট টাকা টেক্স। আপনি কত দেন বলুন তো ?না হয় আমি একবার লেখালেখি করে দেখি—কলকাতায় আপনারা থাকেন কোথায় ?

কেদার অপ্রতিভ মুখে বললেন, আমার বাগান নয়—আমাদের বাড়ি তো কলকাতায় নয়। বেড়াতে এসেছি দু-দিনের জন্যে—কলকাতায় থাকি নে—

—ও, আপনাদের দেশ কোথায় ?গড়শিবপুর ?সে কোন্ জেলা ?ও, বেশ বেশ।

—বাবু কি এখানেই বাস করেন ?

—না, আমার স্ত্রীর শরীর ভালো না, ডাক্তারে বলেছে কলকাতার বাইরে কিছুদিন থাকতে। তাই এলাম—যদি ভালো লাগে আর যদি শরীর সারে, তবে থাকব দু-তিন মাস ! বেশ হল মশায়ের সঙ্গে আলাপ হয়ে। আপনার গানটান আসে ?

কেদার সলজ্জ বিনয়ের সুরে বললেন, ওই অল্প অল্প।

—তবে ভালোই হল—দুজনে মিলে বেশ একটু গান-বাজনা করা যাবে। কাল এখানে এসে বিকেলে চা খাবেন। বলা রইল কিন্তু...বাজাতে পারেন ?

—আজ্ঞে, সামান্য।

—সামান্য-টামান্য না। গুণী লোক আপনি দেখেই বুঝেছি। এখন খালিগলায় একখানা শুনিয়ে দিন না দয়া করে ?তার পর কাল থেকে আমি সব জোগাড়যন্ত্র করে রাখব এখন।

কেদার একখানা শ্যামা বিষয় গান ধরলেন, কিন্তু অপরিচিত জায়গায় তেমন সুবিধে করতে পারলেন না, কেমন যেন বাধ-বাধ ঠেকতে লাগল—সতীশ কলুর দোকানে বসে গাইলে যেমনটি হয় তেমনটি কোনোখানেই হয় না। চাটুজ্যে মশাই কিন্তু তাই শুনে খুব খুশি হয়ে উঠে বললেন, বাঃবাঃ, বেশ চমৎকার গলাটি আপনার ! এসব গান আজকাল বড় একটা শোনাই যায় না—সব থিয়েটারি গান শুনে শুনে কান পচে গেল মশাই। বসুন, একটু চায়ের ব্যবস্থা করে আসি—

কেদার ভদ্রলোককে নিরস্ত করে বললেন, চা খেয়ে বেরিয়েছি, আমি দুবার চা খাইনে সন্দের পর, রাতে ঘুম হয় না, বয়েস হয়েছে তো—এবার আপনি বরং একটা—

চাটুজ্যে মশায়ও দেখা গেল বিনয়ের অবতার। তিনি গান গাইলেন না, কারণ তিনি বললেন, একে তিনি গান গান না, কারণ গানের গলা নেই তাঁর—যাও বা একটু-আধটু হুঁ হুঁ করতেন, কেদারের মতো গুণী লোকের সামনে তাঁর গলা দিয়ে কিছুই বেরুবে না। অবশেষে অনেক অনুরোধের পর চাটুজ্যে মশায় একটা রামপ্রসাদী গেয়ে শোনালেন—কেদারের মনে হল তাঁদের গ্রামের যাত্রাদলের তিনকড়ি কামার এর চেয়ে অনেক ভালো গায়।

এ সময় শরৎ বাড়ির মধ্য থেকে বেরিয়ে এসে বললে, চলো বাবা, রাত হয়ে গেল।

চাটুজ্যে মশায় বললেন, এটি কে ?মেয়ে বুঝি ?তা মা যে আমার জগদ্ধাত্রী প্রতিমার মতো, ঘর আলো করা মা দেখছি। বিয়ে দেননি এখনো ?

—বিয়ে দিয়েছিলাম চাটুজ্যে মশাই—কিন্তু বরাত ভালো নয়, বিয়ের দু-বছর পরেই হাতের শাঁখা ঘুচে গেল। চলোমা, উঠি আজ চাটুজ্যে মশাই, নমস্কার। বড় আনন্দ হল—মাঝে মাঝে আসব কিন্তু।

—আসবেন বৈকি, রোজ আসবেন আর এখানে চা খাবেন। মাকেও নিয়ে আসবেন। মায়ের কথা শুনে মনে বড় দুঃখ হল—উনি আমার এখানে একটু মিষ্টিমুখ করবেন একদিন। নমস্কার।

পথে আসতে আসতে শরৎ বললে, গিন্নি বেশ লোক বাবা। আমায় কত আদর করলে, জল খাওয়ানোর জন্যে কত পীড়াপীড়ি—আমি খেলাম না, পরের বাড়ি খেতে লজ্জা করে—চিনি নে শুনি নে। আমায় আবার যেতে বলেছে।

—আমারও ভালো হল, কর্তা গান-বাজনা ভালোবাসে, শখ আছে—এখানে সন্দেটা কাটানো যাবে—

ওরা নিজেদের বাগানবাড়িতে ঢুকেই দেখলে বাড়ির সামনে প্রভাসের মোটর দাঁড়িয়ে রয়েছে। তার পর বাড়ি পৌঁছেই প্রভাসের সঙ্গে দেখা হল। সে বাড়ির সামনে গোল বারান্দায় বসে ছিল, বোধ হয় এদের প্রত্যাবর্তনের অপেক্ষায়। কাছে এসে বললে, কোথায় গিয়েছিলেন কাকাবাবু ?আমি অনেকক্ষণ এসে বসে আছি। কিন্তু আজ যে বড্ড দেরি করে ফেললেন— সিনেমা যাবার সময় চলে গেল। সাড়ে নটার সময় যাবেন ?প্রায় বারোটায় ভাঙবে।

শরৎ বললে, না প্রভাসদা, অত রাত্রে ফিরলে বাবার শরীর খারাপ হবে। থাক না আজ, আর একদিন হবে এখন—

কেদার বললেন, তাই হবে এখন প্রভাস, আজ বড্ড দেরি হয়ে যাবে। তুমি তো আজ ও-বেলা এলে না—এ-বেলাও আমরা সন্দে পর্যন্ত দেখে তবে বেরিয়েছি। কাল বরং যাওয়া যাবে এখন। বসে চা খাও।

—না না, কাকাবাবু, আজ আর বসব না। কাল তৈরি থাকবেন, আসব বেলা পাঁচটার মধ্যে। কোনো অসুবিধে হচ্ছে না ?

—না অসুবিধে কিসের ?তুমি সেজন্য কিছু ভেবো না।

পরদিন একেবারে দুপুরের পরই প্রভাস মোটর নিয়ে এল। শরৎ চা করে খাওয়ালে প্রভাসকে— তারপর সবাই মিলে মোটরে গিয়ে উঠল। অনেক বড় বড় রাস্তা ও গাড়ি মোটরের ভিড় পেরিয়ে ওদের গাড়ি এসে একটা বড়বাড়ির সামনে দাঁড়াল। প্রভাস বললে, এই হল সিনেমা ঘর—আপনারা গাড়িতে বসুন, আমি টিকিট করে আনি—

শরৎ বাড়িটার মধ্যে ঢুকে চারিদিকে চেয়ে আশ্চর্য হয়ে গেল। কত উঁচু ছাদ, ছাদের গায়ে বড় বড় আলোর ডুম, গদি-আঁটা চেয়ার বেঞ্চি ঝক্‌ঝক্ তক্‌তক্ করছে, কত সাহেব-মেম বাঙালির ভিড় !

কেদার বললে, এ জায়গাটার নাম কি হে প্রভাস ?

—আজ্ঞে এ হল এলফিনস্টোন পিকচার প্যালেস—একটা পার্শি কোম্পানির।

—বেশ বেশ। চমৎকার বাড়িটা—না মা শরৎ ?থাকি জঙ্গলে পড়ে, এমন ধারাটি কখনো দেখিনি—আর দেখবোই বা কোথায় ?ইচ্ছে হয় সতীশ কলু, ছিবাস এদের নিয়ে এসে দেখাই। কিছুই দেখলে না ওরা, শুধু তেল মেপে আর দাঁড়িপাল্লা ধরেই জীবনটা কাটালে।

সারা ঘর অন্ধকার হয়ে গেল। কেদার বলে উঠলেন—ও প্রভাস, এ কি হল ?ওদের আলো খারাপ হয়ে গেল বুঝি ?

প্রভাস নিম্নসুরে বললে, চুপ করুন কাকাবাবু, এবার ছবি আরম্ভ হবে।

সামনে সাদা কাপড়ের পর্দাটার ওপরে যেন জাদুকরের মন্ত্রবলে মায়াপুরীর সৃষ্টি হয়ে গেল, দিব্যি বাড়িঘর, লোকজন কথা বলছে, রেলগাড়ি ছুটছে, সাহেব-মেমের ছেলেমেয়েরা হাসি-খেলা করছে, কাপড়ের পর্দার ওপরে যেন আর একটা কলকাতা শহর।

কিন্তু ছবিতে কি করে কথা বলে ?কেদার অনেকবার ঠাউরে দেখবার চেষ্টা করেও কিছু মীমাংসা করতে পারলেন না। অবিশ্যি এর মধ্যে ফাঁকি আছে নিশ্চয়ই, মানুষের পেছন থেকে কথা বলছে কৌশল করে, মনে হচ্ছে যেন ছবির মুখ দিয়ে কথা বেরুচ্ছে—কিন্তু কেদার সেটা ধরে ফেলবার অনেক চেষ্টা করেও কৃতকার্য হতে

পারলেন না। একবার একটা মোটরগাড়ির আওয়াজ শুনে কেদার দস্তুরমতো অবাক হয়ে গেলেন। মানুষে কি মোটরগাড়ির আওয়াজ বের করে মুখ দিয়ে ?বোধ হয় কোনো কলের সাহায্যে ওই আওয়াজ করা হচ্ছে। কলে কি না হয় ?

হঠাৎ সব আলো একসঙ্গে আবার জ্বলে উঠল। কেদার বললেন, শেষ হয়ে গেল বুঝি ?

প্রভাস বললে, না কাকাবাবু, এখন কিছুক্ষণ বন্ধ থাকবে—তারপর আবার আরম্ভ হবে। চা খাবেন কি ?বাইরে আসুন তবে ?

শরৎ বললে, প্রভাসদা, দোকানের চা আর ওকে খাওয়ানোর দরকার নেই—সত্যিক জাতের এঁটো পেয়ালায় চুমুক দিতে হবে—থাকগে। ওমা, ওই যে অরুণবাবু—উনি এলেন কোথা থেকে ?

অরুণ কেদারকে প্রণাম করে বললে, কেমন লাগছে আপনার, ওঁর লাগছে কেমন ?চলুন আজ সিনেমা ভাঙলে দমদমা পর্যন্ত আপনাদের পৌছে দিয়ে আসব—

কেদার বললেন, বেশ, তা হলে আমাদের ওখানেই আজ খেয়ে আসবে দুজনে—

—না, আজ আর না, আর একদিন হবে এখন বরং।

এই সময় গিরীন বলে সেই লোকটিও ওদের কাছে এসে দাঁড়াল। প্রভাসকে সে কি একটা কথা বললে ইংরিজিতে।

প্রভাস বললে, কাকাবাবু, শরৎ দিদিকে আমার এই বন্ধু ওঁর বাড়িতে নিয়ে যাবার জন্যে বলছেন।

কেদার বললেন, বেশ তো। আজই ?

—হ্যাঁ আজ, বায়োস্কোপের পরে।

ছবি ভাঙবার পরে সবাই মোটরে উঠল। গিরীন ও প্রভাস বসেছে সামনে, কেদার, অরুণ আর শরৎ পেছনের সিটে। একটা গলির মধ্যে ঢুকে একটা ছোট বাড়ির সামনে গিয়ে দাঁড়াল। গিরীন নেমে ডাক দিলে—ও রবি, রবি ?

একটি ছেলে এসে দোর খুলে দিলে। গিরীন বললে, তোমার এই পিসিমাকে বাড়ির মধ্যে নিয়ে যাও—আসুন কেদারবাবু, বাইরের ঘরে আলো দিয়ে গিয়েছে।

সে বাড়িতে বেশিক্ষণ দেরি হল না। বাড়ির মধ্যে থেকে সেই ছেলেটাই সকলকে চা ও খাবার দিয়ে গেল বাইরের ঘরে। একটু পরে শরৎ এসে বললে, চলো বাবা।

আবার দমদমার বাগানবাড়ি। রাত তখন খুব বেশি হয়নি—সুতরাং কেদার ওদের সকলকেই থেকে খেয়ে যেতে বললেন। হাজার হোক, রাজবংশের ছেলে তিনি। নজরটা তাঁর কোনো কালেইছোট নয়। কিন্তু ওরা কেউ থাকতে রাজী হল না—তবে এক পেয়ালা করে চা খেয়ে যেতে কেউ বিশেষ আপত্তি করলে না।

কেদার জিজ্ঞেস করলেন রাত্রে খেতে বসে—ওই ছেলেটির বাড়িতে তোকে কিছু খেতে দেয়নি ?

—দিয়েছিল, আমি খাইনি। তুমি ?

—আমায় দিয়েছিল, আমি খেয়েওছিলাম।

—তা আর খাবে না কেন ?তোমার কি জাতজন্মো কিছু আছে ?বাচবিচের বলে জিনিস নেই তোমার শরীরে।

—কেন ?

—কেন ?ওরা জাতে কি তার ঠিক নেই। বামুন নয়, কায়েতও নয়—আমি পরের বাড়ি গিয়ে কি করে তোমাকে বারণ করে পাঠাই ?

—কি করে জানলে ?

—ও মা, সে যেন কেমন। দু-তিনটি বউ বাড়িতে। সবাই সেজেগুজে পান মুখে দিয়ে বসে আছে। যে ছেলেটা দোর খুলে দিলে, তাকে ও-বাড়ির চাকর বলে মনে হল। কেমন যেন— ভালো জাত নয় বাবা। একটি বউ আমায় বেশ আদর-যত্ন করেছে। বেশ মিষ্টি কথা বলে। আবার যেতে বললে। আমার ইচ্ছে হয় মাথা খুঁড়ে মরি বাবা, তুমি কেন ওদের বাড়ি জল খেলে ?আমায় পান সেজে দিতে এসেছিল, আমি বললাম, পান খাই নে।

—তাতে আর কি হয়েছে ?

—তোমার তো কিছু হয় না—কিন্তু আমার যে গা-কেমন করে। আচ্ছা গিরীনবাবুর বাড়ি নাকি ওটা ?

—হ্যাঁ, তাই তো বললে।

—অনেক জিনিসপত্র আছে বাড়িতে। ওরা বড়লোক বলে মনে হল। হারমোনিয়ম, কলের গান, বাজনার জিনিস—বেশি বিছানা-পাতা চৌকি, বালিশ, তাকিয়া—দেওয়ালে সব ছবি। সেদিক থেকে খুব সাজানো-গোজানো।

—তা হবে না কেন মা, কলকাতার বড়লোক সব। এ কি আর আমাদের গাঁয়ের জঙ্গল পেয়েছ ?

—তুমি আমাদের গাঁয়ের নিন্দে করো না অমন করে।

কেদার বললেন, তোদের গাঁ বুঝি আমাদের গাঁ নয় পাগলী ?আচ্ছা, বল তো তোর এখানে থাকতে আর ভালো লাগছে, না গ্রামে ফিরতে ইচ্ছে হচ্ছে ?

—এখন দুদিন এখানে থেকে দেখতে ইচ্ছে হয় বৈকি বাবা। আমার কথা যদি বলো—আমার ইচ্ছে এখানে এখন কিছুদিন থেকে সব দেখি শুনি—গাঁ তো আছেই, সে আর কে নিচ্ছে বলো।

পরদিন সকালে চাটুজ্যে মশায় কেদারকে ডেকে পাঠালেন। সেখানে গানের মজলিশ হবে সন্ধ্যায়। কেদারকে আসবার জন্যে যথেষ্ট অনুরোধ করলেন তিনি। মজলিশে শুধু শ্রোতা হিসাবে উপস্থিত থাকলে চলবে না, কেদারকে গান গাইতে হবে।

কেদার বললেন, আজ্ঞে, আমি বাজাতে পারি কিছু কিছু বটে—কিন্তু মজলিশে গাইতে সাহস করি নে।

—খুব ভালো কথা। কি বাজান বলুন ?

—বেহালা জোগাড় করতে পারেন বাবু ?

—বেহালা ওবেলা পাবেন। আনিয়ে রাখব। সেদিন তো বলেননি আপনি বেহালা বাজাতে পারেন। আপনি দেখছি সত্যিই গুণী লোক। ওবেলা এখানে আহার করতে হবে কিন্তু। বাড়িতে মাকে বলে আসবেন।

—আমার মেয়ে যেখানে সেখানে আমায় খেতে দেয় না, তবে আপনার বাড়িতে সে নিশ্চয়ই কোনো আপত্তি করবে না। তাই হবে।

—আপত্তি ওঠালেও শুনব না তো কেদারবাবু ?মার সঙ্গে নিজে গিয়ে ঝগড়া করে আসব। আচ্ছা তাঁকে—

—সে কোথাও খায় না। তাকে আর বলার দরকার নেই।

—বিকেলে চাও এখানে খাবেন—

বৈকালে কেদার সবে চাটুজ্যে মশায়ের বাগানবাড়িতে যাবার জন্যে বার হয়েছেন, এমন সময় প্রভাসের গাড়ি এসে ঢুকল ফটকে। প্রভাস গাড়ি থেকে নেমে বললে, কাকাবাবু কোথায় যাচ্ছেন ?

কেদারের উত্তর শুনে প্রভাস হতাশার সুরে বললে, তাই তো, তা হলে আর দেখছি হল না—

—কি হল না হে ?

—শরৎ দিদিকে আজ একবার অরুণের বাড়ি আর আমার বাড়ি নিয়ে যাবার জন্যে এসেছিলাম, ওখান থেকে একেবারে নিউমার্কেট দেখিয়ে—

—চলো একটু কিছু মুখে দিয়ে যাবে—এসো—

শরৎ ছুটে বাইরে এসে বললে, প্রভাসদা। আসুন, আসুন—অরুণবাবু এসেছেন নাকি ?বসুন প্রভাসদা, চা খাবেন।

কেদার বললেন, বড় মুশকিল হয়েছে মা, প্রভাস নিতে এসেছিল, এদিকে আমি যাচ্ছি চাটুজ্যেবাবুদের গানের আসরে। না গেলে ভদ্রতা থাকে না—ওবেলা বার বার বলে দিয়েছেন—

প্রভাসও দুঃখ প্রকাশ করলে। শরৎ দিদিকে সে নিজের বাড়ি ও অরুণের বাড়ি নিয়ে যাবার জন্যে এসেছিল কিন্তু কাকাবাবু বেরিয়ে যাচ্ছেন—

শরৎ বললে, বাবা আমি যাই নে কেন প্রভাসদার সঙ্গে ?যাব বাবা ?

কেদার খুশির স্বরে বললে, তা বরং ভালো বাবা। তাই যাও প্রভাস—তুমি শরৎকে নিয়ে যাও—তবে একটু সকাল সকাল পৌঁছে দিয়ে যেয়ো—

প্রভাস বললে, আজ্ঞে, তবে তাই। আমি খুব শিগগির দিয়ে যাব। সে বিষয়ে ভাববেন না।

প্রভাসের গাড়ি একটা বাড়ির সামনে গিয়ে দাঁড়াল। প্রভাস নেমে দোর খুলে বললে, আসুন শরৎদি, ভেতরে আসুন।

শরৎ বললে, এটা কাদের বাড়ি প্রভাসদা ?

—এটা ?এটা অরুণদেরই বাড়ি ধরুন—তবে অরুণ এখন বোধ হয় বাড়ি নেই—এল বলে।

শরৎকে নিয়ে গিয়ে প্রভাস একটা সুসজ্জিত ঘরে বসিয়ে ডাক দিলে—ও বউদি, বউদি, কে এসেছে দ্যাখো—

শরৎ চেয়ে দেখলে ঘরটার মেজেতে ফরাস বিছানা পাতা, দেওয়ালে বেশির ভাগ বিলিতি মেম-সাহেবের ছবি, একদিকে একটা ছোট তক্তপোশের ওপর একটা গদিপাতা বিছানা—তাতে বালিশ নেই, গোটা দুই ডুগি-তবলা এবং একটা বেলো-খোলা বড় হারমোনিয়াম বিছানার ওপর বসানো। একটা খোল-মোড়া তানপুরা, দেয়ালের কোণের খাঁজে হেলান দেওয়ানো। খুব বড় একটা কাঁসার পিকদানি তক্তপোশের পায়াটার কাছে। একদিকে বড় একটা কাচের আলমারি—তার মধ্যে টুকিটাকি শৌখিন কাচের ও মাটির জিনিস, গোটাকতক ছোট মতো বোতল, আরো কি কি। একটা বড় দেওয়াল-ঘড়ি।

শরৎ ভাবলে—এদের বাড়িতে গান-বাজনার চর্চা খুব আছে দেখছি। বাবাকে এখানে এনে ছেড়ে দিলে বাবার পোয়া বারো—

একটি সুবেশা মেয়ে এই সময় ঘরে ঢুকে হাসিমুখে বললে, এই যে এসো ভাই—তোমার কথা কত শুনেছি প্রভাসবাবু ও অরুণবাবুর কাছে। এসো এই খাটের ওপর ভালো হয়ে বোসো ভাই—

মেয়েটিকে দেখে বয়স আন্দাজ করা কিছু কঠিন হল শরতের। ত্রিশও হতে পারে, পঁয়ত্রিশও হতে পারে—কম হবে না, বরং বেশিই হবে। কিন্তু কি সাজগোজ। মাগো, এই বয়সে অত সাজগোজ কি গিন্নিবান্নি মেয়েমানুষের মানায় ?আর অত পান খাওয়ার ঘটা !

পেটো-পাড়া চুলে ফিরিঙ্গি খোঁপা, গায়ে গহনাও মন্দ নেই—বাড়িতে রয়েছে বসে, এদিকে পায়ে আবার চটিজুতো—মখমলের উপর জরির কাজ করা। কলকাতার লোকের কাণ্ডকারখানাই আলাদা।

শরৎ গিয়ে খাটের ওপর বসল বটে ভদ্রতা রক্ষার জন্যে— কিন্তু তার কেমন গা ঘিনঘিন করছিল। পরের বিছানায় সে পারতপক্ষে কখনো বসে না—বিছানার কাপড় না ছাড়লে সংসারের কোনো জিনিসে সে হাত দিতে পারবে না—জলটুকু পর্যন্ত মুখে দিতে পারবে না। কথায় কথায় বিছানায় বসা আবার কি, কলকাতার লোকের আচার-বিচার বলে কিছু নেই।

বউটি তেমনি হাসিমুখে বললে, পান সাজব ভাই ?পানে দোক্তা খাও নাকি ?

শরৎ মৃদু হেসে জানালে যে সে পান খায় না।

—পান খাও না—ওমা তাই তো—আচ্ছা দাঁড়াও, ভাজা মশলা আনি—

—না, আপনি ব্যস্ত হবেন না। আমার ওসব কিছু লাগবে না।

প্রভাস বললে, শরৎদি, বউদি খুব ভালো গান করেন, শুনবেন একখানা ?

শরৎ উৎফুল্ল কণ্ঠে বললে, শুনব বৈকি, ভালো গান শোনাই তো হয় না—উনি যদি গান দয়া করে—

বাবার গান ও বাজনা শরৎ শুনছে বাল্যকাল থেকেই, কিন্তু লণ্ঠনের তলাতেই অন্ধকার, বাবার গান-বাজনা আর তেমন ভালো লাগে না। এমন কি বাবা ভালো গাইতে পারেন বলেও মনে হয় না শরতের। অপরে শুনে বাবার গানের বা বাজনার কেন অত প্রশংসা করে শরৎ তা বুঝতে পারে না।

মাঝে মাঝে কেদার বলতেন গড়শিবপুরের বাড়িতে—শরৎ শোনো মা এই মালকোষখানা—বেহালার সুরের মূর্ছনায় রাগিণী পর্দায় পর্দায় মূর্তি পরিগ্রহ করত—বাবার ছড় ঘুরানোর কত কায়দা, ঘাড় দুলুনির কত তন্ময় ভঙ্গি—কিন্তু শরৎ মনে মনে ভাবত বাবার এসব কিছুই হয় না। এ ভালোই লাগে না, বাবা হয়তোবোঝেন—না, লোকে শুনে হাসে...

প্রভাস ওর বউদিদির দিকে চেয়ে হেসে বললে, শুনিয়ে দাও একটা—

মেয়েটি মৃদু হেসে হারমোনিয়মের কাছে গিয়ে বসল—তার পরে নিজে বাজিয়ে সুকণ্ঠে গান ধরল—

“পাখি এই যে গাহিলি গাছে,

চুপ দিলি কেন ঝোপে ডুবে গেলি যেমন এসেছি কাছে।”

শরৎ মুগ্ধ হয়ে শুনলে, এমন কণ্ঠ এমন সুর জীবনে সে কখনো শোনেনি। গড়শিবপুরের জঙ্গলে এমন গান কে কবে গেয়েছে ?আহা, রাজলক্ষ্মীটা যদি আজ এখানে থাকত ! রাজলক্ষ্মী কত দুঃখদিনের সঙ্গিনী, তাকে না শোনাতে পারলে যেন শরতের অর্ধেক আমোদ বৃথা হয়ে যায়। সুখের দিনে তার কথা এত করে মনে পড়ে !

গান থেমে গেলে শরতের মুখ দিয়ে আপনা-আপনি বেরিয়ে গেল—কি চমৎকার !

মেয়েটি ওর দিকে চেয়ে হেসে হেসে কি একটা বলতে যাবে—এমন সময় একটি উনিশ-কুড়ি বছরের মেয়ে দোরের কাছে এসে বললে, আজ এত গানের আসর বসল এত সকালে, কে এসেছে গো তোমাদের বাড়ি ?আমি বলি তুমি—

শরতের দিকে চোখ পড়াতে মেয়েটি হঠাৎ থেমে গেল। তার মুখের হাসি মিলিয়ে গেল। ঘরে না ঢুকে সে দোরের কাছে রইল দাঁড়িয়ে।

মেয়েটির পরনে লালরঙের জরিপাড় শাড়ি, খোঁপায় জরির ফিতে জড়ানো, নিখুঁত সাজগোজ, মুখে পাউডার। শরৎ ভাবলে, মেয়েটি হয়তো কোথাও নিমন্ত্রণ খেতে যাবে কুটুমবাড়ি, তাই এমন সাজগোজ করেছে।

প্রভাসের বউদি বললে, এই যে গানের আসল লোক এসে গিয়েছে। কমলা, এঁকে তোমার গান শুনিয়ে দাও তো ভালো—

কমলা বিষণ্নমুখে বললে, তাই তো, আমার ঘরে যে এদিকে হরিবাবু এসে বসে আছে— আজ আবার দিন বুঝে সকাল সকাল—

প্রভাস ওকে চোখ টিপলে মেয়েটি চুপ করে গেল।

প্রভাসও বললে না, তোমার একখানা গান না শুনে আমরা ছাড়ছি নে—এদিকে এসো কমলা—

কমলাও হারমোনিয়ম বাজিয়ে গান ধরলে। থিয়েটারি গান ও হালকা সুর—কলকাতার লোক বোধ হয় এইসব গান পছন্দ করে। অন্য ধরনের গান তারা তেমন জানে না, কিন্তু গড়শিবপুরে ঠাকুরদেবতা, ইহকাল পরকাল, ভবনদী পার হওয়া, গৌরাঙ্গ ও নদীয়া ইত্যাদি সংক্রান্ত গানের প্রাদুর্ভাব বেশি। বাল্যকাল থেকে শরৎ বাবার মুখে, কৃষ্ণযাত্রার আসরে, ফকির-বোষ্টমের মুখে এই সব গান এত শুনে আসছে যে কলকাতায় প্রচলিত এই সব নতুন সুরের নূতন ধরনের গান তার ভারি সুন্দর লাগল। জীবনটা যে শুধু শ্মশান নয়, সেখানে আশা আছে, প্রাণ আছে, আনন্দ আছে—এদের গান যেন সেই বাণী বহন করে আনে মনে। শুধুই হতাশার সুর বাজে না তাদের মধ্যে।

শরৎ বললে, বড় চমৎকার গলা আপনার, আর একটা গাইবেন ?

বিনা প্রতিবাদে মেয়েটি আর একটা গান ধরলে, গান ধরবার সময় ঘরের মেজেতে বসানো এক জোড়া বাঁয়াতবলার দিকে চেয়ে প্রভাসকে কি বলতে যাচ্ছিল, প্রভাস আবার চোখ টিপে বারণ করলে। আগের চেয়েও এবার চড়া সুর, দু-একটা ছোটখাটো তান ওঠালে গলায় মেয়েটি, দ্রুত তালের গান, শিরায় শিরায় যেন রক্ত নেচে ওঠে সুরে ও তালের মিলিত আবেদনে।

গান শেষ হলে প্রভাস বললে, কেমন লাগল শরৎদি ?

—ভারি চমৎকার প্রভাসদা, এমন কখনো শুনিনি—

কমলা এতক্ষণ পরে প্রভাসের বউদিদির দিকে চেয়ে বললে, ইনি কে গা ?

প্রভাসের বউদিদি বললে, ইনি ?প্রভাসবাবুদের দেশের—

শরৎ এ কথায় একটু আশ্চর্য হয়ে ভাবলে, প্রভাসদার বউদিদি তাকে 'প্রভাসবাবু' বলছেন কেন, বা যেখানে 'আমার শ্বশুরবাড়ির দেশের' বলা উচিত সেখানে 'প্রভাসবাবুদের দেশের'ই বা বলছেন কেন ?বোধ হয় আপন বউদিদি নন উনি !

কমলা বললে, বেশ, আপনার নাম কি ভাই ?

শরৎ সলজ্জ সুরে বললে, শরৎসুন্দরী—

—বেশ নামটি তো।

প্রভাস বললে, উনি এসেছেন কলকাতা শহর দেখতে। এর আগে কখনো আসেননি—

কমলা আশ্চর্য হয়ে বললে, সত্যি ?এর আগে আসেননি কখনো ?

শরৎ হেসে বললে, না।

—আপনাদের দেশ কেমন ?

—বেশ চমৎকার। চলুন না একবার আমাদের দেশে—

—যেতে খুব ইচ্ছে করে—নিয়ে চলুন না—

বেশ তো, আপনি আসুন, উনি আসুন—

মেয়েটি আর একটি গান ধরলে। এই মেয়েটির গলার সুরে শরৎ সত্যিই মুগ্ধ হয়েগেল—সে এমন সুকণ্ঠী গায়িকার গান জীবনে কখনো শোনেনি—প্রভাসের বউদিদির বয়স হয়েছে, যদিও তাঁর গলা ভালো তবুও এই

অল্পবয়সি মেয়েটির নবীন, সুকুমার, কণ্ঠস্বরের তুলনায় অনেক খারাপ। শরতের ইচ্ছে হল, কমলার সঙ্গে ভালো করে আলাপ করে।

গান শেষ করে কমলা বললে, আসুন না ভাই, আমাদের ঘরে যাবেন ?

—চলুন না দেখে আসি—

প্রভাস তাড়াতাড়ি বলে উঠল—না, উনি এখনই চলে যাবেন, বেশিক্ষণ থাকবেন না— এখন থাক্‌গে—

কিন্তু শরৎ তবুও বললে, আসি না দেখে প্রভাসদা ?এখুনি আসছি—

প্রভাস বিরত হয়ে পড়ল যেন। সে জোর করে কিছু বলতেও পারে না অথচ কমলার সঙ্গে শরৎ যায় এ যেন তার ইচ্ছে নয়। এই সময় হঠাৎ একটা লোক ঘরে ঢুকে অস্পষ্ট ও জড়িত স্বরে বলে উঠল—আরে এই যে, কমল বিবি এখানে বসে, আমি সব ঘর ঢুঁড়ে বেড়াচ্ছি বাবা—বলি প্রভাসবাবুও যে আজ এত সকালে—

প্রভাস হঠাৎ বিবর্ণ হয়ে উঠে তাকে কি একটা বলে তাড়াতাড়ি বাইরে নিয়ে গেল। লোকটার ভাবভঙ্গি দেখে শরৎ আশ্চর্য হয়ে ভাবলে—লোকটা পাগল নাকি ?অমন কেন ?

সে প্রভাসের বউদিদিকে বললে, উনি কে ?

—উনি—এই হল গে—আমাদের বাড়ির বাইরের ঘরে থাকেন—

—কমলার সম্পর্কে কে ?

—সম্পর্কে—এই ঠাকুরপো—

কমলার ঠাকুরপো কি রকম শরৎ ভালো বুঝল না। লোকটির বয়স চল্লিশের কম নয়—তা হলে কমলার দোজবরে কি তেজবরে স্বামীর সঙ্গে বিয়ে হয়েছে নাকি ?না হলে অত বড় ঠাকুরপো হয় কি করে ?কমলার ওপর কেমন একটু করুণা হল শরতের। আহা, এমন মেয়েটি। কমলাও একটু অবাক হয়ে প্রভাসের বউদিদির দিকে চাইলে। সে যেন অনেক কিছুই বুঝতে পারছে না।

শরৎ জিজ্ঞেস করলে, আপনি প্রভাসদার কে হন ?

কমলা কিছু বলবার আগে প্রভাসের বউদিদি উত্তর দিলে, ও আমার পিসতুতো বোন হয়। এখানে থেকে পড়ে।

হঠাৎ শরৎ কমলার সিঁথির দিকে চাইলে। সত্যিই তো, ওর এখনো বিয়ে হয়নি। এতক্ষণ সে লক্ষ্য করেনি। তবে আবার ওর ঠাকুরপো কি রকম হল ! শরতের বড় ইচ্ছে হচ্ছিল এসব গোলমেলে সম্পর্কের একটা মীমাংসা সে করে ফেলে—এদের প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে। কিন্তু দরকার কি পরের বাড়ির খুঁটিনাটি কথা জিজ্ঞেস করে ?

একটু পরে প্রভাস বাইরে থেকে ডাকলে, কমলা, তোমায় ডাকছেন—শুনে যাও—

কমলা চলে যাবার আগে হাত তুলে ছোট্ট একটা নমস্কার করে শরৎকে বললে, আচ্ছা, আসি ভাই—

—কেন, আপনি আর আসবেন না ?

—কি জানি, যদি কোনো কাজ পড়ে—

—কাজ সেরে আসবেন—যাবার আগে দেখা করেই যাবেন—

—আপনি কতক্ষণ আছেন আর ?

প্রভাসের বউদি বললেন, উনি এখনো ঘণ্টাখানেক থাকবেন—

কমলা বললে, যদি পারি আসব তার মধ্যে—

ও চলে গেলে শরৎ প্রভাসের বউদিদির দিকে চেয়ে বললে, বেশ মেয়েটি—

কমলা তো ?হ্যাঁ, ওকে সবাই পছন্দ করে—

—বড় চমৎকার গলা—

—গানের মাস্টার এসে গান শিখিয়ে যায় যে ! এখন বোধ হয় সেই জন্যেই উঠে গেল। আপনি বসুন চায়ের দেখি কি হল—

শরৎ ব্যস্ত হয়ে বললে, না না, আপনি যাবেন না। আমি চা খেয়ে বেরিয়েছি—

—বেরুলেন বা ! তা কখনো হয় ?একটু মিষ্টিমুখ—

—না না—আমি এসময় কিছুই খাই নে—

—বসুন, আমি আসছি।

—বসছি কিন্তু খাওয়ার জোগাড় কিছু করবেন না যেন। আমি সত্যিই কিছু খাব না।

প্রভাস বললে, থাক বরং বউদি, উনি এসময় কিছু খান না। ব্যস্ত হতে হবে না।

এই সময় অরুণ ও গিরীন বলে সেই লোকটা ঘরে ঢুকল। শরৎ হাসিমুখে বললে, এই যে অরুণবাবু আসুন—

—দেখুন মাথায় টনক আছে আমার। কি করে জানলুম বলুন আপনি এখানে এসেছেন—

গিরীন প্রভাসকে বাইরে ডেকে নিয়ে বললে, কি ব্যাপার ?

প্রভাস বিরক্ত মুখে বললে, আরে, ওই হরি সা না কি ওর নাম, সব মাটি করে দিয়েছিল আর একটু হলে—এমন বেফাঁস কথা হঠাৎ বলে ফেললে—আমি বাইরে নিয়ে গিয়ে ধমকে দিলাম আচ্ছা করে। ভাগ্যিস পাড়াগাঁয়ের মেয়ে, কিছু বোঝে না তাই বাঁচোয়া। কমলা বিবি আবার ঘর দেখাতে নিয়ে যাচ্ছিল ওর, কত কষ্টে থামাই। দেখলেই সব বুঝে না ফেলুক, সন্দেহ করতো।

—তার পর ?

—তার পর তোমরা তো এসেছ, এখন পথ বাৎলাও—

—লেমনেড খাওয়াতে পারবে না ?

—চা পর্যন্ত খেতে চাইছে না—তা লেমনেড্ !

—ও এখানে থাকুক—চলো আমরা সব এখান থেকে সরে পড়ি।

—মতলবটা বুঝলাম না।

—এখানে দু-দিন লুকিয়ে রাখো। তার পর ওর বাবা ওকে আর নেবে না—ওর গ্রামে রটিয়ে দেওয়ার ভয় দেখিয়ে দাও যে কোথায় ওকে পাওয়া গিয়েছে। পাড়াগাঁয়ের লোক, সমাজের ভয়ে ওকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারবে না।

—তাই করো—কিন্তু মেয়েটিকে তুমি জানো না। যত পাড়াগেঁয়ে ভীতু মেয়ে ভাবছ, অতটা নয় ও। বেশ তেজী আর একগুঁয়ে মেয়ে। তোমার যা মতলব, ও কতদূর গড়াবে আমি বুঝতে পারছি নে। চেষ্টা করে দেখতে পারো।

—তুমি আমার হাতে ছেড়ে দাও, দেখ আমি কি করি—টাকা কম খরচ করা হয়নি এজন্যে—মনে নেই ?

—হেনাকে ডাকো একবার বাইরে। হেনার সঙ্গে পরামর্শ করো। তাকে সব বলা আছে, সে একটা পথ খুঁজে বার করবেই। কমলাকেও বোলো।

ওর বউদিদি শরৎকে পাশের ঘরের সাজসজ্জা দেখাতে নিয়ে গিয়েছিল ইতিমধ্যে। একটা খুব বড় ড্রেসিং টেবিল দেখে শরৎ খুশি হয়ে বললে, বেশ জিনিসটা তো ?আয়নাখানা বড় চমৎকার, এর দাম কত ভাই ?

—একশো পঁচিশ টাকা—

—আর এই খাটখানা ?

—ও বোধ হয় পড়েছিল সত্তর টাকা—আমার ধীরেনবাবু—মানে আমার গিয়ে বাপের বাড়ির সম্পর্কে ভাই—সেই দিয়েছিল।

—বিয়ের সময় দিয়েছিলেন বুঝি ?এ সবই তা হলে আপনার বিয়ের সময় বরের যৌতুক হিসেবে—

—হ্যাঁ তাই তো।

—আপনার স্বামী এখনো বাড়ি আসেননি, আফিসে কাজ করেন বুঝি ?

—হ্যঁ।

—আপনার শাশুড়ি বা আর সব—ওঁদের সঙ্গে আলাপ হল না।

—এ বাড়িতে আর কেউ থাকেন না। এ শুধু মানে আমাদের—উনি আর আমি—

—আলাদা বাসা করেছেন বুঝি ?তা বেশ।

—হ্যাঁ, আলাদা বাসা। আফিস কাছে হয় কিনা। এ অনেক সুবিধে।

—তা তো বটেই।

—আপনি এইবার কিছু মুখে না দিলে সত্যিই ভয়ানক দুঃখিত হব ভাই।

বারবার খাওয়ার কথা বলাতে শরৎ মনে মনে বিরক্ত হল। সে যখন বলছে খাবে না, তখন তাকে পীড়াপীড়ি করার দরকার কি এদের ?সে যে বিধবা মানুষ, তা এরা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছে, বিধবা মানুষ সব জায়গায় সব সময় খায় না—বিশেষ করে সে পল্লীগ্রামের ব্রাহ্মণের ঘরের বিধবা, তার অনেক কিছু বাছবিচার থাকতে পারে, সে জ্ঞান দেখা যাচ্ছে কলকাতার লোকের একেবারেইনেই।

শরৎ এবার একটু দৃঢ়স্বরে বললে, না, আমি এখন কিছু খাব না, কিছু মনে করবেন না আপনি।

প্রভাসের বউদিদি আর কিছু বললে না এ বিষয়ে। শরৎ ভাবলে, এদের সঙ্গে ব্যবহারে হয়তো সে ভদ্রতা বজায় রেখে চলতে পারবে না, কিন্তু কি করবে সে, কেন এ নিয়ে পীড়াপীড়ি করা ?খাবে না বলেছে, ব্যস্ মিটে গেল—ওদের বোঝা উচিত ছিল।

—আরো দু-পাঁচ মিনিট শরৎকে এ ছবি, ও আলমারি দেখানোর পরে প্রভাসের বউদিদি ওর দিকে চেয়ে বললে, ভালো, একটা অনুরোধ রাখো না কেন—আজ এখানে থেকে যাও রাতটা।

শরৎ আশ্চর্য হয়ে বললে, এখানে ?কি করে থাকব ?

—কেন, এই আলাদা ঘর রয়েছে। উনি বোধ হয় আজ আর আসবেন না। এক-একদিন রাত্রে কাজ পড়ে কিনা ! সারারাত আসতে পারেন না। একলা থাকতে হবে, তার চেয়ে তুমি থাকো ভাই, দুজনে বেশ গল্পে-গুজবে রাত কাটিয়ে দেব, তোমাকে আমার বড় ভালো লেগেছে।

কথা শেষ করে প্রভাসের বউদিদি শরতের হাত ধরে আবদারের সুরে বললে, কথা রাখো ভাই, কেমন তো ?তা হলে প্রভাসবাবুকে—ইয়ে ঠাকুরপোকে বলে দিই আজ গাড়ি নিয়ে চলে যাক্—তাই করি, বলি ঠাকুরপোকে ?

শরৎ বিষণ্ন মনে বলে উঠল—না না, তা কি করে হবে ?আমি থাকতে পারব না। বাবার পাশের বাড়িতে চাটুজ্যে মহাশয়ের ওখানে আজ রাত্রে নেমন্তন্ন আছে, তাই রান্না নেই, এতক্ষণ আছি সেই জন্যে। নইলে কি এখনো থাকতে পারতাম। বাবা একলাটি থাকবেন, তা কখনো হয় ?তা ছাড়া তিনি ব্যস্ত হয়ে উঠবেন যে !

আমি তো আর বলে আসিনি যে কারো বাড়ি থাকব, ফিরব না।আর সে এমনিই হয় না। আপনার স্বামী যদি এসেই পড়েন হঠাৎ—

প্রভাসের বউদিদি বললে, এসে পড়লে কিছুই নয়। তিনটে ঘর রয়েছে এখানে, তোমাকে ভাই এই ঘরে আলাদা বিছানা করে দেব, কোনো অসুবিধে হবে না—থাকো ভাই, প্রভাসকে বলি গাড়ি নিয়ে চলে যাবার জন্যে। বোসো তুমি এখানে—

—না, সে হয় না ! বাবাকে কিছু বলা হয়নি, তিনি ভীষণ ভাববেন—

—প্রভাস কেন গাড়িতে করে গিয়ে বাবার কাছে খবর দিয়ে আসুক না যে তুমি আমাদের এখানে থাকবে—তা হলেই তো সব চেয়ে ভালো হয়—তাই বলি—এই বেশ সব দিক দিয়ে সুবিধা হল—তোমার পায়ে পড়ি ভাই, এতে অমত করো না।

শরৎ পড়ে গেল বিপদে। একদিকে তার অনুপস্থিতিতে তার বাবার সুবিধে অসুবিধেরব্যাপার, অন্যদিকে প্রভাসের বউদিদির এই সনির্বন্ধ অনুরোধ—কোন্ দিকে সে যায় ?অবিশ্যি একটা রাত এখানে কাটানো আর তেমন কি, সম্ভবত ওর স্বামী আজ আফিসের কাজের চাপে বাড়ি ফিরতে পারবেন না বলেই ওকে সঙ্গে রাখবার জন্য ব্যস্ত হয়েছে—শোয়ারও অসুবিধে কিছু নেই, থাকলেই হল—কিন্তু একটা বড় কথা এই যে, সে বাড়ি না ফিরলে বাবা কি ভাবনাতেই পড়ে যাবেন ! তবে বাবাকে যদি প্রভাসদা এখুনি খবর দিয়ে দেন—সে আলাদা কথা।

সে সাঁতপাচ ভেবে কি একটা বলতে যাচ্ছিল, এমন সময়ে কমলা এসে ঘরে ঢুকে বললে, বা রে, এখানে সব যে, আমি খুঁজে বেড়াচ্ছি—

প্রভাসের বউদিদি উৎফুল্ল হয়ে উঠে বললে, বেশ সময়ে এসে পড়েছ কমলা—আমি ওকে বোঝাচ্ছি ভাই যে আজ রাতটা এখানে থেকে যেতে। উনি আজ আফিস থেকে আসবেন না, জানোই তো—দুজনে বেশ একসঙ্গে গল্পগুজবে—কি বলো ?

প্রভাস এবং তার দলবল একটু আগে বাইরে কমলার সঙ্গে কি কথা বলেছে। এই জন্যই তার এখানে আসা, যতদূর মনে হয়।

সে বললে, আমিও তাই বলি ভাই, বেশ সবাই মিলেমিশে একটা রাত আপনাকে নিয়েআমোদ করা গেল—

প্রভাসের বউদিদি বললে, আর বড্ড ভালো লেগেছে তোমাকে তাই বলছি। কি বলো কমলা ?

—তা আর বলতে ! আমি তো ভাবছি একটা কিছু সম্বন্ধ পাতাব—

এই মেয়েটিকে সত্যিই শরতের খুব ভালো লেগেছিল—বয়সে এ তার সঙ্গিনী রাজলক্ষ্মীর চেয়ে কিছু বড় হবে, দেখতে শুনতে রূপসী মেয়ে বটে। সকলের ওপরে ওর গান গাইবার গলা...অনেক জায়গায় গান শুনেছে শরৎ—কিন্তু এমন গলার স্বর—

শরৎ আগ্রহের সঙ্গে বলে উঠল, বেশ, সম্বন্ধ পাতাও না ভাই—আমি ভারি সুখী হব—

—কি সম্বন্ধ পাতাবেন বলুন ?

—আপনি বলুন—

প্রভাসের বউদিদি বললে, গঙ্গাজল ! পছন্দ হয় ?

কমলা উৎসাহের সুরে ঘাড় নেড়ে বললে, বেশ পছন্দ হয়। আপনারও হয়েছে তো ?...তবে তাই—কিন্তু আজ রাত্রে—

শরৎ আপনমনেই বলে গেল—তোমাকে ভাই আমাদের দেশে নিয়ে যাব, যাবে তো ?তোমার বয়সি একটি মেয়ে আছে রাজলক্ষ্মী, বেশ মেয়ে। আলাপ করিয়ে দেব। আমাদের বাড়ি গিয়ে থাকবে। তবে হয়তো এত অজ-পাড়াগাঁ তোমার ভালো লাগবে না—

—কেন লাগবে না, খুব লাগবে—আপনাদের বাড়ি থাকব—

—জানো না তাই বলছ। আমাদের বাড়ি তো গাঁয়ের মধ্যে নয়—গাঁয়ের বাইরে জঙ্গলের মধ্যে—

কমলা আগ্রহের সুরে বললে, কেন, জঙ্গলের মধ্যে কেন ?

—আগে বড় বাড়ি ছিল, এখন ভেঙে-চুরে জঙ্গল হয়ে পড়েছে, যেমনটি হয়—

—বাঘ আছে সেখানে ?

শরৎ হেসে বললে, সব আছে, বাঘ আছে, সাপ আছে, ভূতও আছে—

কমলা ও প্রভাসের বউদিদি একসঙ্গে বলে উঠল—ভূত ! আপনি দেখেছেন ?

—না, কখনো দেখিনি, ওসব মিথ্যে কথা। কিংবা চলো তোমরা একদিন, ভূত দেখতে পাবে।

প্রভাসের বউদিদি বললে, আচ্ছা, সে জঙ্গলে না থেকে কলকাতায় এসে থাকো না কেন ভাই ! এখানে কত আমোদ-আহ্লাদ—তুমি এখানে থাকলে কত মজা করব আমরা—তোমাকে নিয়ে মাসে মাসে আমরা থিয়েটারে যাব, বায়স্কোপে যাব—খাব দাব—কত আমোদ ফুর্তি করা যাবে।

গঙ্গার ইস্টিমারে বেড়াতে যাব, যাওনি কখনো বোধ হয় ?চমৎকার বাগান আছে ওই শিবপুরের দিকে, সেখানে কত গাছপালা—

শরতের হাসি পেল। গাছপালা দেখতে ইস্টিমারে চেপে গঙ্গা বেয়ে কোথায় যেন যেতে হবে কতদূর কলকাতায় এসে— তবে সে গাছপালা দেখতে পাবে ! হায় রে গড়শিবপুরের জঙ্গল—এরা তোমাকে দেখেনি কখনো তাই এমন বলছে। সেখানে গাছ দেখতে রেলেও যেতে হয় না, ইস্টিমারেও যেতে হয় না—ঘুম ভেঙে উঠে চোখ মুছে জানালা দিয়ে চাইলেই দেখতে পাবে জঙ্গলের ঠ্যালা।

কমলাও বললে, তাই করুন—কলকাতায় চলে আসুন, কেমন থাকা যাবে—

প্রভাসের বউদিদি বললে, এই আমাদের বাড়িতেই থাকবে ভাই ! মানে—আমাদের বাড়ির কাছেও বাসা করে দেওয়া যাবে এখন। এমনি সাজিয়েগুছিয়ে বেশ চমৎকার করে দেওয়া যাবে। কি ভাই সেখানে পড়ে আছ জঙ্গলে, কলকাতায় এসে বাস করে দেখো ভাই, আমোদ ফুর্তি কাকে বলে বুঝতে পারবে। আমাদের সঙ্গে থাকবে, একসঙ্গে বেড়াব, দেখব শুনব, সে কি রকম মজা হবে বলো দিকি ভাই ?তোমার মতো মানুষ পেলে তো—

কমলাও উৎসাহের সুরে বললে, আপনাকে পেয়ে আর ছাড়তে ইচ্ছে করছে না বলেই তো—

শরতের খুব ভালো লাগছিল ওদের সঙ্গ। এমন মন-খোলা, আমুদে, তরুণী মেয়েদের সঙ্গ পাড়াগাঁয়ে মেলে না, এক আছে রাজলক্ষ্মী, কিন্তু সে-ও এদের মতো নয়—এদের যেমন সুশ্রী চেহারা, তেমনি গলার সুর, এদের সঙ্গে একত্রে বাস করা একটা ভাগ্যের কথা। কিন্তু ওরা যে বলছে, তা সম্ভব হবে কি করে ?এরা আসল ব্যাপারটা বোঝে না কেন ?

সে বললে, ভালো তো আমারও লেগেছে আপনাদের। কিন্তু বুঝছেন না, কলকাতায় বাবা থাকবেন কি করে ?তেমন অবস্থা নয় তো তাঁর ?এই হল আসল কথা।

প্রভাসের বউদিদি হেসে বললে, এই ! এজন্যে কোনো ভাবনা নেই তোমার ভাই। এখন দিনকতক আমাদের বাসাতে থাকো না—তার পর বাসা একটা দেখেশুনে নিলেই হবে এখন। আর তোমার বাবা ?উনি যে অফিসে কাজ করেন, সেখানে একটা কাজটাজ—

—সে কাজ বাবা করতে পারেন না। ইংরিজি জানেন না—উনি জানেন গান-বাজনা, বেশ ভালো বেহালা বাজাতে পারেন—

প্রভাসের বউদিদি কথাটা যেন লুফে নিয়ে বলল, বেশ, বেশ—তবে তো আরো ভালো। নরেশবাবু থিয়েটারেই তো কাজ করেন—তিনি ইচ্ছে করলে—

শরৎ বললে, নরেশবাবু কে ?

—নরেশবাবু !—এই গিয়ে—ওঁর একজন বন্ধু, আমাদের বাসায় প্রায়ই আসেন-টাসেন কিনা।

শরৎ একটুখানি কি ভেবে বললে, কিন্তু বাবা কি গাঁ ছেড়ে থাকতে পারবেন ?আমার শহর দেখা শেষ হয়নি বলে তিনি এখনো বাড়ি যাবার পীড়াপীড়ি করছেন না—নইলে এতদিন উদ্ব্যস্ত করে তুলতেন না আমাকে ! নিতান্ত চক্ষুলজ্জায় পড়ে কিছু বলতে পারছেন না তিনি টিকবেন শহরে, তবেই হয়েছে !

প্রভাসের বউদিদি বললে, আচ্ছা, এক কাজ করো না কেন ?

—কি ?

—তুমিই কেন থাকো না এখন দিনকতক ?এই আমাদের সঙ্গেই থাকো। তোমার বাবা ফিরে যান দেশে, এর পরে এসে তোমাকে নিয়ে যাবেন। আমাদের বাড়িতে আমাদের বন্ধু হয়ে থাকবে, টাকাকড়ির কোনো ব্যাপার নেই এর মধ্যে—তোমায় মাথায় করে রেখে দেব ভাই। বড্ড ভালো লেগেছে তোমাকে, তাই বলছি। কি বলিস্ কমলা ?তুই কথা বলছিস্ নে যে—বল্ না তোর গঙ্গাজলকে !

কমলা বললে, হ্যাঁ, সে তো বলছিই—

প্রভাসের বউদিদি বললে, সে-সব গেল ভবিষ্যতের কথা। আপাতত আজ রাত্রে তুমি এখানে থাকো। প্রভাস গিয়ে খবর দিয়ে আসুক তোমার বাবাকে। রাজী ?

শরৎ দ্বিধার সঙ্গে বললে, আজ ?—তা—না ভাই আজ বরং আমায় ছেড়ে দাও—কাল বাবাকে বলে—

—তাতে কি ভাই ! প্রভাস ঠাকুরপো গিয়ে এখুনি বলে আসছে। যাবে আর আসবে—ডাকি প্রভাসবাবুকে—তুমি আর অমত কোরো না। বসো আমি আসছি—তুমি থাকলে কমলাকে দিয়ে সারারাত গান গাওয়াব।

শরৎ এমন বিপদে কখনো পড়েনি।

কি সে করে এখন ?এদের অনুরোধ এড়িয়ে চলে যাওয়াও অভদ্রতা—যখন এতটাই পীড়াপীড়ি করছে তার থাকার জন্যে, থাকলে মজাও হয় বেশ—কমলার গান শুনতে পাওয়া যায়।

কিন্তু অন্যদিকে বাবাকে বলে আসা হয়নি, বাবা কি মনে করতে পারেন। তবে প্রভাসদা যদি মোটরে করে গিয়ে বলে আসে, তবে অবিশ্যি বাবার ভাববার কারণ ঘটবে না। তবুও কি তার নিজের মন তাতে শান্তি পাবে ?কোথায় বাগানের মধ্যে নির্জন বাড়ি, সেখানে একলাটি পড়ে থাকবেন বাবা, রাত্রে যদি কিছু দরকার পড়ে তখন কাকে ডাকবেন, কে তাকে দেখে ?

সে ইতস্তত করে বললে, না ভাই, আমার থাকবার জো নেই—আজ ছেড়ে দাও, বাবাকে বলে কাল আসব।

হঠাৎ প্রভাসের বউদিদি উঠে হাত বাড়িয়ে দরজা আগলে দাঁড়িয়ে বললে, যাও দিকি কেমন করে যাবে ভাই ! কক্ষনও যেতে দেব না—কই, যাও তো কেমন করে যাবে ?এমন আমোদটা আমাদের মাটি করে দিয়ে গেলেই হল !

শরৎ তার কাণ্ড দেখে হেসে ফেললে।

এমন সময় বাইরে থেকে প্রভাসের গলা শুনতে পাওয়া গেল—ও বউদিদি—

প্রভাসের বউদিদি বললে, দাঁড়াও ভাই আসছি—ঠাকুরপো ডাকছে—বোধ হয় চা চান, বন্ধু-বান্ধব এসেছে কিনা ?ঘন ঘন চা—

সে বাইরে যেতেই প্রভাস তাকে বারান্দার ও-প্রান্তে নিয়ে গিয়ে বললে, কি হল ?

তার সঙ্গে অরুণ ও গিরীনও ছিল। গিরীন ব্যস্তভাবে বললে, কতদূর কি করলে হেনা ?

—বাবাঃ—সোজা একগুঁয়ে মেয়ে ! কেবল বাবা আর বাবা ! এত বোঝাচ্ছি, এত কাণ্ড করছি এখনো মাথা হেলায়নি—কমলা আবার ঢোঁক মেরে চুপ করে রয়েছে। আমি একা বকে বকে মুখে বোধ হয় ফেনা তুলে ফেললাম। ধন্যি মেয়ে যা হোক ! যদি পারি, আমায় একশো কিন্তু পুরিয়ে দিতে হবে ! কমলা কিছুই করছে না—ওর টাকা—

গিরীন বিরক্তির সুরে বললে, আরে দুর, টাকা আর টাকা ! কাজ উদ্ধার করো আগে—একটা পাড়াগেঁয়ে মেয়েকে সন্দে থেকে ভুলোতে পারলে না—তোমরা আবার বুদ্ধিমান, তোমরা আবার শহুরে—

প্রভাসের বউদিদি মুখনাড়া দিয়ে বলে উঠল—বেশ, তুমি তো বুদ্ধিমান, যাও না, ভজাও গে না, কত মুরোদ ! তেমন মেয়ে নয় ও—আমি ওকে চিনেছি। মেয়েমানুষ হয়ে জন্মেছি, আমরা চিনি মেয়েমানুষ কে কি রকম ! ও একেবারে বনবিছুটি—তবে পাড়াগাঁ থেকে এসেছে, আর কখনো কিছু দেখেনি—তাই এখনো কিছু সন্দেহ করেনি, নইলে ওকে কি যেমন তেমন মেয়ে পেয়েছ ?

প্রভাস বিরক্ত হয়ে বললে, যাক, আর এক কথা বার বার বলে কি হবে ?সোজা কাজ হলে তোমাকেই বা আমরা টাকা দিতে যাব কেন হেনা বিবি, সেটাও তো ভাবতে হয়—

হেনা বললে, এবার যেন একটু নিমরাজি গোছের হয়েছে—দেখি—

হেনা ঘরের মধ্যে ঢুকে গেল এবং মিনিট পাঁচেক পরেই হাসিমুখে বার হয়ে এসে বললে, কই ফেল তো দেখি টাকা !

ওরা সবাই ব্যস্ত ও উৎসুকভাবে বলে উঠল—কি হল ?রাজী হয়েছে ?

হেনা হাসিমুখে ঘাড় দুলিয়ে বাহাদুরির সুরে বললে, এ কি যার-তার কাজ ?এই হেনা বিবি ছিল তাই হল। দেখি টাকা ?আমি যাকে বলে—সেই যাই পাতায় পাতায় বেড়াই—তাই—

গিরীন বিরক্তির সুরে বললে, আঃ, কি হল তাই বলো না ?গেলে আর এলে তো ?

—আমি গিয়েই বললাম, ভাই, প্রভাস ঠাকুরপোকে বলে এলাম তোমার বাবাকে খবর দিতে। সে গাড়ি নিয়ে এখুনি যাচ্ছে বললে। আমি জোর করে কথাটা বলতেই আর কোনো কথা বলতে পারলে না। কেবল বললে, প্রভাসদা যাবার আগে আমার সঙ্গে যেন দেখা করে যায়— বাবাকে কি বলতে হবে বলে দেব—কমলা কিন্তু কিচ্ছু করছে না, মুখ বুজে গিন্নি-শকুনির মতো বসে আছে।

গিরীন বলল, না প্রভাস, তুমি এখান থেকে সরে পড়ো, হেনা গিয়ে বলুক তুমি চলে গিয়েছ—তুমি এসময় সামনে গেলে একথাও বলতে পারে যে আমিও ওই গাড়িতে বাবার কাছে গিয়ে নিজেই বলে আসি। তা ছাড়া তোমার চোখমুখ দেখে সন্দেহ করতে পারে—হেনার মতোতুমি পারবে না—ও হল অ্যাকট্রেস, ও যা পারবে, তা তুমি আমি পারতে—

হেনা বললে, বঙ্গরস থিয়াটারে আজ পাঁচটি বছর কেটে গেল কি মিথ্যে মিথ্যে ?ম্যানেজার সেদিন বলেছে, হেনা বিবি, তোমাকে এবার ভাবছি সীতার পার্ট দেব—সেদিন আমার রানীর পার্ট দেখে—ও কি ওই কমলির কাজ ?অনেক তোড়জোড় চাই—

গিরীন বললে, যাক ও সব কথা, কে কোথা দিয়ে শুনে ফেলবে। এত পরিশ্রম সব মাটি হবে ! খসে পড়ো প্রভাস—তোমাকে আর না দেখতে পায়—মন আবার ঘুরে যেতে কতক্ষণ, যদি বলে বসে—না, আমি প্রভাসদার মোটরে বাবার কাছে যাব ! আর কে যাচ্ছে এখন এত রাত্রে সেই পাগলা বুড়োটার কাছে ?

প্রভাস ইতস্তত করে বললে, তবে আমি যাই ?

—যাও—তোমায় আর না দেখতে পায়—পায়ের বেশি শব্দ করো না।

—তোমরা ?তোমাদেরও এখানে থাকা উচিত হবে না, তা বুঝছ ?

—আমরা যাচ্ছি। তুমি আগে যাও—কারণ তুমি চলে গেলে ওর হাতের তীর ছাড়া হয়ে যাবে, আর তো ও মত বদলাতে পারবে না ?

হেনা বললে, আজ রাত্তিরটা কোনো রকম বেতাল না দেখে ও। তোমরা ওই হরি সা লোকটাকে আগলে রাখো—

অরুণ বললে, কোথায় সে ?

প্রভাস বললে, আমি তাকে কমলির ঘরে বসিয়ে রেখে এসেছি। কিন্তু এখন যা আছে, আর দু ঘণ্টা পরে তো থাকবে না। ওকে চেনো তো ?চীনেবাজারের অত বড় দোকানটা ফেল করেছে এই করে। বোকা তাই রক্ষে। ওকে সরিয়ে দাও বাবা, আজ রাত্তিরের মতো—

গিরীন বললে, যাও না তুমি ?কেন দাঁড়িয়ে বক্‌বক্‌ করছ ?

প্রভাস চলে যেতে উদ্যত হলে গিরীন তাকে বললে, কোথায় থাকবে ?

—আজ বাড়ি চলে যাই—বাবা সন্দেহ করবেন, বেশি রাত্তিরে বাড়ি ফিরলে—

—ভালো কথা, তোমার বাবার সঙ্গে তো ওর বাবার খুব আলাপ, সেখানে গিয়ে সন্ধান নেবে না তো বুড়ো ?

প্রভাস হেসে বুড়ো আঙুল নেড়ে বললে—হুঁ হুঁ বাবা—সে গুড়ে বালি ! অত কাঁচা ছেলে আমি নই। বাবা তো বাবা, বাড়ির কেউই ঘুণাক্ষরেও কিছু জানে না। বাবাও কেদারকে ভুলে গিয়েছেন, দুজনের দেখাশুনোনেই কতকাল। দেখলে কেউ হঠাৎ হয়তো চিনতে পারবে না। তার ওপর আমাদের বাড়ি কেদার বুড়ো জানবে কি করে ?ঠিকানা জানে না, নম্বর জানে না—কোনোদিন শোনেওনি। আর এ কলকাতা শহর, বুড়ো না চেনে বাড়ি না চেনে রাস্তাঘাট। সেদিকে ঠিক আছে।প্রভাস সিঁড়ি দিয়ে নেমে নিচে গেল।

অরুণ একটু দ্বিধার সুরে বললে, কাজটা তো এক রকম যা হয় এগুলো—শেষে পুলিশের কোনো হাঙ্গামায় পড়ব না তো ?

—কিসের পুলিশের হাঙ্গামা ?নাবালিকা তো নয়, ছাব্বিশ-সাতাশ বছরের ধাড়ি—আমরা প্রমাণ করব ও নিজের ইচ্ছেয় এসেছে। ওকে এ জায়গায় কেন পাওয়া গেল—এ কথার কি জবাব দেবে ও ?আমি বুঝিনি বললে কেউ বিশ্বাস করবে ?নেকু !

—তা ধরো ও পাড়াগাঁয়ের মেয়ে, সত্যিই ওর বয়েস হয়েছে বটে, কিন্তু এসব কিছু জানে না, বোঝে না। দেখতেই তো পেলে—একটু সন্দেহ জাগলে ওকে রাখতে পারত হেনা ?তা জাগেনি। এমন জায়গাও কখনো দেখেনি, জানে না। যদি এই সব কথা প্রমাণ হয় আদালতে ?

গিরীন আত্মম্ভরিতার সুরে বললে, শুধু দেখে যাও আমি কি করি ! গিরীন কুণ্ডুকে তোমরা সোজা লোক ঠাউরো না—

অরুণ বললে, আর একটা কথা, সে না হয় বুঝলাম—কিন্তু ওসব ঘরের মেয়ে, যখন সব বুঝে ফেলবে, তখন আত্মহত্যা করে বসে যদি ?ওরা তা পারে।

গিরীন তাচ্ছিল্যের সুরে বললে, হ্যাঁ—রেখে দাও ওসব ! মরে সবাই—দেখা যাবে পরে—

—আজ চলো আমরা এখান থেকে যাই —

—এখন ?

—আমার মনে হয় তাই উচিত। কোনো সন্দেহ না জাগে মনে—এটা যেন মনে থাকে।

হেনাকে সন্তর্পণে বাইরে আনিয়ে গিরীন বললে, আমরা চলে যাচ্ছি হেনা বিবি। রেখে গেলাম কিন্তু—

হেনা বললে, আমি বাবু পুলিশের হ্যাঙ্গামে যেতে পারব না, তা বলে দিচ্ছি। কাল দুপুর পর্যন্ত ওকে এখানে রাখা চলবে। তারপর তোমরা কোথায় নিয়ে যাবে যেয়ো—আমার টাকা চুকিয়ে দিয়ে।

গিরীন বললে, কেন, আবার নতুন কথা বলছ কেন ?কি শিখিয়ে দিয়েছিলাম ?

—সে বাপু হবে না। ও বেজায় একগুঁয়ে মেয়ে। আগে যা ভেবেছিলাম তা নয়—ও শুধু বুঝতে পারেনি তাই এখানে রয়ে গেল। নইলে রসাতল বাধাত এতক্ষণ। আর একটা কথা কি, কিছুতেই খাচ্ছে না, এত করে বলছি, নানারকম ছুতো করছে, পাড়াগাঁয়ের বিধবা মানুষ, ছুঁচিবাই গো, ছুঁচিবাই। কেন খাচ্ছে না আমি আর ওসব বুঝি নে ?আমি মানুষ চরিয়ে খাই—

অরুণ বললে, মানুষ চরাওনি কখনো হেনা বিবি, ভেড়া চরিয়েছ। এবার মানুষ পেয়েছ, চরাও না দেখি। বুঝলে ?

ওরা দুজনে নিচে নেমে গেল।

চাটুজ্যে মশায়ের বাড়ির গানের আসর ভাঙল রাত এগারোটায়। তার পরে খাওয়ার জায়গা হল, প্রায় ত্রিশজন লোক নিমন্ত্রিত, আহারের ব্যবস্থাও চমৎকার। যেমন আয়োজন, তেমনি রান্না। কেদার একসময়ে খেতে পারতেন ভালোই, আজকাল বয়স হয়ে আসছে, তেমন আর পারেননা—তবুও এখনো যা খান, তা একজন ওই বয়সের কলকাতার ভদ্রলোকের বিস্ময় ও ঈর্ষার বিষয়।

বাড়ির কর্তা চাটুজ্যে মশায় কেদারের পাতের কাছে দাঁড়িয়ে তদারক করে তাঁকে খাওয়ালেন। আহারাদির পরেবিদায় চাইলে বললেন, আবার আসবেন কেদারবাবু, পাশেই আছি—আমরা তো প্রতিবেশী। আপনার বাজনার হাত ভারি মিঠে, আমার স্ত্রী বলছিলেন উনি কে ?আমি বললাম, আমাদের পাশের বাগানেই থাকেন—এসেছেন বেড়াতে। আহা, আজ যদি আপনার মেয়েটিকে আনতেন—বড় ভালো হত, আমার স্ত্রী বলছিলেন—

—আজ্ঞে হ্যাঁ—তা তো বটেই। তার এক দাদা এসে তাকে নিয়ে গেল বেড়াতে কিনা ?মানে গ্রাম-সম্পর্কের দাদা হলেও খুব আপনা-আপনি মতো। কলকাতায় তাদের বাড়ি আছে—সেখানেই নিয়ে গেল। মটোর গাড়ি নিয়ে এসেছিল, তা আর একদিন নিয়ে আসব—

—আনবেন বৈকি, মাকে আনবেন বৈকি,—বলা রইল, নিশ্চয় আনবেন—আচ্ছা নমস্কার কেদারবাবু—

কেদারের সঙ্গে চাটুজ্যে মশায় একজন লোক দিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু কেদার তা নিতে চাননি। তিনি গানের আসরের শেষ দিকে একটু ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন, মেয়ে এসে একা থাকবে বাগানবাড়িতে। গাঁয়ে গড়বাড়ির বনের মধ্যে মেয়েকে ফেলে রেখে যেতেন প্রায় প্রতি রাত্রেই, সে কথা ভেবে এখন তাঁর কষ্ট হল। তবুও সে নিজের গ্রাম, পূর্বপুরুষের ভিটে, সেখানকার কথা স্বতন্ত্র।

গেট দিয়ে ঢোকবার সময় কেদার দেখলেন, কোনো ঘরে আলো জ্বলছে না। শরৎ তা হলে হয়তো সারাদিন ঘুরেফিরে এসে ক্লান্ত অবস্থায় ঘুমিয়ে পড়েছে ! আহা, কত আর ওর বয়স, কালতো এতটুকু দেখলেন ওকে—দেখুন শুনুক, আমোদ করুক না !

বাড়ির রোয়াকে উঠে ডাকলেন, ও শরৎ—মা শরৎ উঠে দোরটা খোলো, আলোটা জ্বালো—

সাড়া পাওয়া গেল না।

কেদার ভাবলেন—বেশ ঘুমিয়ে পড়েছে দেখছি—বড্ড ঘুমকাতুরে, গড়শিবপুরে এক-একদিন এমন ঘুমিয়ে পড়ত—ছেলেমানুষ তো হাজার হোক্—হুঁ—

পুনরায় ডাক দিলেন—ও মা শরৎ, ওঠো, আলো জ্বালো—

ডাকাডাকিতে ঝি উঠে আলো জ্বেলে রান্নাঘরের বারান্দা থেকে এসে বললে, কে—বাবু ?কই দিদিমণি তো আসেননি এখনো—

কেদার বিস্ময়ের সুরে বললেন, আসেনি ?বাড়ি আসেনি ?তুই ঘুমিয়ে পড়েছিলি, জানিস্ নে হয়তো—দ্যাখ্—সে হয়তো আর ডাকেনি—চল্ ঘর, আলো জ্বাল্—

ঝি বললে, চাবি দেওয়া রয়েছে যে বাবু, এই আমার কাছে চাবি। দোর খুলবে, আমার কাছ থেকে চাবি নেবে, তবে তো ঢুকবে ঘরে ! কি যে বলো বাবু !

তাই তো, কেদার সে কথাটা ভেবে দেখেননি। চাবি রয়েছে যখন ঝিয়ের কাছে, তখন শরৎ দোর খুলবে কি করে !

ঝি বললে, আমি সন্দে থেকে বসে ছিনু এই রোয়াকে, এই আসে এই আসে—বলি মেয়েমানুষ একা থাকবে ?এসব জায়গা আবার ভালো না। বাগানবাড়ি, লোকজনের গতাগম্যি নেই—রাত্তির কাল ! আমি শুয়ে থাকব'খন দিদিমণির ঘরে—রান্নাঘরে আটা এনে রেখেছি, ঘি এনে রেখেছি, যদি এসে খাবার করে খায়—

কেদার অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলেন—ঝিয়ের দীর্ঘ উক্তির খুব সামান্য অংশই তাঁর কর্ণগোচর হল। ঝিয়ের কথার শেষের দিকে প্রশ্ন করলেন—কে খাবার করে খেয়েছে বললে ?

—খায়নি গো খায়নি, যদি খায় তাই এনে রাখনু সব গুছিয়ে। আটা ঘি—

কেদার বললেন, তাই তো ঝি, এখনো এল না কেন বল্ দেখি ?বারোটা বাজে—কি তার বেশিও হয়েছে—

—তা কি করে বলি বাবু !

—হ্যাঁ ঝি, থিয়েটার দেখতে যায়নি তো ?তা হলে কিন্তু অনেক রাত হবে। না ?

—তা জানি নে বাবু।

রাত একটা বেজে গেল—দুটো। কেদারের ঘুম নেই, বিছানায় শুয়ে উৎকর্ণ হয়ে আছেন। বাগানবাড়ির সামনের রাস্তা দিয়ে অত রাতেও দু-একখানা মোটর বা মাল-লরির যাতায়াতের আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে। কেদার অমনি বিছানার ওপর উঠে বসেন। এই এতক্ষণে এল প্রভাসের গাড়ি ! কিছুই না।

আবার শুয়ে পড়েন।

নয়তো উঠে তামাক সাজেন বসে বসে, তবুও একটু সময় কাটে।

হলের ঘড়িটায় টং টং করে তিনটে বাজল।

কত রাত্রে কলকাতার থিয়েটার ভাঙে। কারণ এতক্ষণে তিনি ঠিক করেই নিয়েছেন যে প্রভাস ওকে থিয়েটার দেখাতে নিয়ে গিয়েছে, প্রভাস এবং অরুণের বাড়ির সবাই গিয়েছে, মানে মেয়েরা। তাদের সঙ্গেই—তা তো সব বুঝলেন তিনি, কিন্তু থিয়েটার ভাঙে কত রাত্রে ?কাকে জিজ্ঞেস করেন এত রাত্রে কথাটা ! আবার শুয়ে পড়লেন। একবার ভাবলেন, গেটের কাছে দাঁড়িয়ে কি দেখবেন ?শেষ রাত্রে কখন ঘুম এসে গিয়েছিল চোখে তাঁর অজ্ঞাতসারে, যখন কেদার ধড়মড় করে বিছানা ছেড়ে উঠলেন, উঃ, এ যে দেখছি রোদ উঠে বেশ বেলা হয়ে গিয়েছে !

ডাকলেন—ও ঝি—ঝি—

ঝি এসে বললে, আমি বাজারে চননু বাবু, এর পর মাছ মিলবে না, ওই মুখপোড়া ইটের কলের বাবুগুনো হন্নে শেয়ালের মতো—

—হ্যাঁরে, শরৎ আসেনি ?

—না বাবু, কই ?এলে তো তখুনি উঠে দরজা খুলে দিতাম বাবু। আমার ঘুম বড্ড সজাগঘুম।

ঝি বাজারে চলে গেল। কেদারের মনে এখন আর ততটা উদ্বেগ নেই। তিনি এইবার ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছেন। অনেক রাত্রে থিয়েটার ভেঙে গেলে প্রভাসের বাড়ির মেয়েদের সঙ্গে শরৎ তাদের বাড়িতে গিয়ে শুয়েছে—এ তো সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ব্যাপার। রাত্রের অন্ধকার মানুষের মনে ভয় ও উদ্বেগ আনে, দিনের আলোয় তাঁর মনের দুশ্চিন্তা কেটে গিয়েছে। মিছিমিছি ব্যস্ত হওয়ার কিছু নেই এর মধ্যে। কলকাতার জীবনযাত্রা-প্রণালী গড়শিবপুরের সঙ্গে এক নয়—এ তাঁর আগেই বোঝা উচিত ছিল।

কেদার নিজেই জল ফুটিয়ে চা করে খেলেন, ঝি দোকান থেকে খাবার নিয়ে এল—আটটা ন'টা দশটা বাজল, কেদার ঝিকে বলে দিয়েছিলেন কি কি আনতে হবে, মেয়ে এসে মাছ রাঁধবে বলে ভালো মাছও আনতে দিয়েছেন—ঝি-বাজার থেকে ফিরে এল, অথচ এখনো শরতের সঙ্গে দেখা নেই। বাজার পড়ে রইল, ঝি জিজ্ঞেস করল—দিদিমণি তো এখনো এল না, মাছ কি কুটে রাখব ?

—রেখে দে। হয়তো গঙ্গাচ্চান করে আসবে।

যখন বারোটা বেজে গেল, তখন ঝি এসে বললে, বাবু, রান্নাটা আপনিই চড়িয়ে দিন না কেন ?আমার বোধ হয় দিদিমণি এবেলা আর এলেন না। না খেয়ে কতক্ষণ বসে থাকবেন।

কিন্তু কেদার বড় উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিলেন।

আজ একটা ব্যাপার তাঁর কাছে আশ্চর্য ঠেকেছিল, সেটা এই, শরৎ যত আমোদের মধ্যেই থাকুক কেন না, বাবাকে ভুলে—তাঁর জন্যে রান্নার কথা ভুলে—সে কোথাও থাকবে না। জীবনে সে কখনো তা করেনি। যতই কালীঘাটেই যাক আর গঙ্গাস্নানই করুক, বাবার খাওয়া হবে না দুপুরে, এ চিন্তা তাকেবৈকুণ্ঠের দোর থেকেও ফিরিয়ে আনবে।

অথচ এ কি রকম হল !

মহা মুশকিলে পড়ে গেলেন কেদার।

প্রভাসের বাড়ির ঠিকানা জানেন না তিনি যে খোঁজ নেবেন। এমন তো হতে পারে কোনো অসুখ করেছে শরতের। কিন্তু প্রভাসও খবর দিতে এল না একবার, এই বা কেমন কথা !

ঝি এসে দাঁড়াল, আবার ভাত চড়াবার কথাটা বলতে।

একটু ইতস্তত করে বলল, বাবু, একটা কথা বলব কিছু মনে কোরোনি, দিদিমণি যেনার সঙ্গে গিয়েছেন, তিনি কি রকম দাদা !

ঝিয়ের কথার সুর ও বলবার ধরন কেদারের মনের মধ্যে হঠাৎ যেন একটা ধারালো অস্ত্রেরবিষম ও নিষ্ঠুর খোঁচা দিয়ে তার সরল মনকে জাগিয়ে তুলবার চেষ্টা করলে।

তিনি পাংশুমুখে ঝিয়ের দিকে চেয়ে বললেন, কেন মেয়ে ?কেন বলো তো ?

—না বাবু, তাই বলছি। বলি, যেনার সঙ্গে তিনি গিয়েছেন, তিনি নোক ভালো তো ?শহর-বাজার জায়গা, এখানে মানুষ সব বদমাইশ কিনা, দিদিমণি সোমত্ত মেয়ে, তাই বলছি। তবে আপনি বলছিলে দাদার সঙ্গে গিয়েছে, তবে আর ভয় কি ! তা বাবু, ভাতটা চড়িয়ে—

কেদার রান্না চড়াবেন কি, ঝির কথা শুনে তাঁর কেমন একটা ভয়ে সমস্ত শরীর ঝিম্‌ঝিম্‌ করে উঠল, হাতে পায়ে যেন বল নেই। এসব কথা তাঁর মনেও আসেনি। ঝি নিতান্ত অন্যায় কথা তো বলেনি। প্রভাসকে তিনি কতটুকু জানেন ?তাঁর সঙ্গে মেয়েকে যেতে দেওয়া হয়তো তাঁর উচিত হয়নি।

হঠাৎ মনে পড়ল, পাশের বাগানে গিয়ে চাটুজ্যে মশাইকে সব জানিয়ে এ বিপদে তাঁর পরামর্শ নেওয়া দরকার—বিশাল কলকাতা শহরের মধ্যে তিনি আর কাউকে জানেন না, চেনেন না। ঝিকে বসিয়ে রেখে বাড়িতে তিনি চাটুজ্যে মশায়ের বাগানবাড়িতে গেলেন। চাটুজ্যে মশায়কে সামনের চাতালেই চাকরে তেল মাখাচ্ছিল, কেদারকে এমন অসময়ে আসতে দেখে তিনি একটু বিস্মিত হয়ে কাপড় গুছিয়ে পরে উঠে বসলেন। হাত তুলে নমস্কার করে বললেন, আসুন কেদারবাবু, ওরে বাবুকে টুলটা এগিয়ে দে—

কেদার বললেন, বড় বিপদে পড়ে এসেছি চাটুজ্যে মশায়—আপনি ছাড়া আমি তো আর কাউকে জানি নে চিনিও নে—কার কাছেই বা যাব—

চাটুজ্যে মশায় সোজা হয়ে বসে বিস্ময়ের সুরে বললেন, কি বলুন দিকি ?কি হয়েছে ?

কেদার ব্যাপার সব খুলে বললেন।

চাটুজ্যে মশাই শুনে একটু চুপ করে ভাবলেন। তার পর বললেন, আপনি ঠিকানা জানেন না ?

—আজ্ঞে না—

—প্রভাস কি ?

—দাস—ওরা কর্মকার !

—আহা দাঁড়ান, টেলিফোন গাইডটা দেখি। কিন্তু আপনি তো বলছেন ঠিকানা জানেন না, তবে তাতে কি হবে ?ওই নামে পঞ্চাশ জন মানুষ বেরুবে—আচ্ছা, আপনি দয়া করে একটু অপেক্ষা করুন, আমি স্নানটা সেরেনি চট্‌ করে, বেলা হয়েছে। আপনাকে নিয়ে একবার থানায় যাব কি না ভেবে দেখি। পুলিশের সঙ্গে একবার পরামর্শ করা দরকার।

পুলিশের নাম শুনে নির্বিরোধী কেদার ভয় পেয়ে গেলেন। পুলিশে যেতে হবে, ব্যাপারটা গুরুতর দাঁড়াবে কি ?নাঃ, হয়তো মন্দির-টন্দির দেখতে বেরিয়েছে মেয়ে, ফিরে আসতে একটু বেলা হচ্ছে। একেবারে পুলিশে যাওয়াটা ঠিক হবে না।

কেদার বললেন, আচ্ছা, আপনি স্নানাহার সেরে নিন—আমি ততক্ষণ একবার দেখে আসি এল কিনা। আপনি খেয়ে একটু বিশ্রাম করুন। আমি আসছি—

বাগানবাড়িতে ফিরে কেদার এঘর ওঘর খুঁজলেন, ঝিকে ডাকলেন, শরৎ আসেনি। ঘড়িতে বেলা দুটো। কিছুক্ষণ চুপ করে বিছানায় শুয়ে মন শান্ত করার চেষ্টা করলেন—পুলিশে খবর দেবার আগে বরং একটু দেরি করা ভালো। ঘড়িতে আড়াইটে বাজল।

এমন সময়ে ফটকের কাছে মোটরের হর্ন শোনা গেল। কেদার উৎকর্ণ হয়ে রইলেন— সকাল থেকে একশো মোটর গাড়ির বাঁশি শুনেছেন তিনি। কিন্তু মনে হল—না, এই তো, গাড়ির শব্দ একেবারে বাগানের লাল কাঁকরের পথে। বাবাঃ, বাঁচা গেল। সমস্ত শরীর দিয়ে যেন ঝাল বেরিয়ে গেল কেদারের।

ঝি ছুটে এসে বললে, বাবু মোটর ঢুকছে ফটক দিয়ে—দিদিমণি এসেছে—

কেদার প্রায় ছুটেই বাইরে গেলেন। মোটর সামনে এসে দাঁড়াল—তা থেকে নামল প্রভাস ও গিরীন। শরৎ তো গাড়িতে নেই !

ওরা এগিয়ে এলো।

কেদার ব্যস্ত ভাবে বললে, এসো বাবা প্রভাস—শরৎ আসেনি ?এত দেরি করলে, তাকে কি বাড়িতে—

প্রভাস ও গিরীনের মুখ গম্ভীর। পাশেই ঝিকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে গিরীন বললে, শুনুন, আপনার সঙ্গে একটা কথা আছে। ওদিকে চলুন—

ঝি হঠাৎ বলে উঠল, হ্যাঁগা বাবু, দিদিমণি ভালো আছে তো ?

গিরীন নামতা মুখস্ত বলার মতো বললে, হ্যাঁ, আছে আছে—আসুন, চলুন ওই ওদিকে। তুই যা না কেন, হাঁ করে এখানে দাঁড়িয়ে কি—

ওদের রকম-সকম দেখে কেদার উদ্বিগ্ন মুখে প্রশ্ন করলেন, কি—কি হয়েছে ?শরৎ ভালো আছে তো ?

প্রভাস বললে, হ্যাঁ, ভালো আছে। সেজন্য কিছু নয়, তবে একটা ব্যাপার হয়েছে, তাই আপনার কাছে—

কেদার জিনিসটা ভালো বুঝতে না পেরে বললেন, তা শরৎকে সঙ্গে নিয়ে এলেই হত বাবাজি—তাকে আর কেন বাড়িতে রেখে এলে ?

গিরীন বললে, আজ্ঞে না, তাঁকে নিয়েই তো ব্যাপার—সেই বলতেই তো—

কেদারের প্রাণ উড়ে গেল—শরতের নিশ্চয় অসুখ-বিসুখ হয়েছে, এরা গোপন করছে— তা ছাড়া আর কি হওয়া সম্ভব ?তিনি অধীর ভাবে কি একটা বলতে যাচ্ছিলেন, গিরীন এগিয়ে এসে গম্ভীর মুখে বললে, আপনাকে বলতেই তো আমাদের আসা। কিন্তু কি করে যে বলি, তাই বুঝতে পারছি নে। আসলে কথাটা কি জানেন, আপনার মেয়েকে কাল থেকে পাওয়া যাচ্ছে না—মানে এখন পাওয়া গিয়েছে। তবে—

এদের কথাবার্তার গতি কেদার বুঝতে পারলেন না, একবার বলে মেয়েকে পাওয়া যাচ্ছে না, আবার বলে পাওয়া গিয়েছে—গিয়ে যদি থাকে, তবে কি তাকে সাংঘাতিক আহত অবস্থায় পাওয়া গিয়েছে ?নইলে এরা তার পরে আবার 'কিন্তু' বলে কেন ?মুহূর্তের মধ্যে কেদারের মনে এই কথাগুলো খেলে গেল—কিন্তু তাঁর হতবুদ্ধি ওষ্ঠাধর বাক্যে এর রূপ দেওয়ার পূর্বেই গিরীন আবার বললে—হয়েছিল কি জানেন, আপনার মেয়ে—বলো না হে প্রভাস !

প্রভাস বললে, বলব কি, আমারও হাত-পা আসছে না আপনার সামনে একথা বলতে, অরুণের সঙ্গে কাল শরৎদি কোথায় চলে গিয়েছিল—কাল রাত্রে তারা সারারাত আসেনি। আজ সকালে—মানে—

গিরীন ওর কাছ থেকে কথা লুফে নিয়ে বললে, মানে আমরা কাল সারারাত খোঁজাখুঁজি করেছি—পাইনি। আপনার কাছেই বা কি বলি, কার কাছেই বা কি বলি—তার পর আজ সকালে একটা কুশ্রেণীর মেয়ের বাড়িতে এদের দুজনকে পাওয়া গিয়েছে। এসব কথা বলতে আমাদের মাথা কাটা যাচ্ছে লজ্জায়। প্রভাস তো বলছিল, আমি কাকাবাবুর কাছে গিয়ে এসব বলতে পারব না। আমি বললাম—না চলো, বলতেই যখন হবে আমিই বলব এখন। তিনিও তো ভাববেন। তাই ও এল, নইলে ও আসতে চাইছিল না।

কেদার নির্বোধের মতো ওদের মুখের দিকে চেয়ে সব কথা শুনছিলেন—কিন্তু কথাগুলোর অর্থ তাঁর তেমন বোধগম্য হয়নি বোধ হয়—কারণ কিছুমাত্র না ভেবেই তিনি প্রশ্ন করলেন, তাকে তোমরা আনলে না কেন ?তার অসুখ-বিসুখ হয়নি তো ?

গিরীন হাত নেড়ে একটা হতাশাসূচক ভঙ্গি করে বললে, সে চেষ্টা করতে কি আর আমরা বাকি রেখেছিলাম ?আসতে চাইলেন না।

কেদার বিস্ময়ের সুরে বললেন, আসতে চাইলে না ?

—তবে আর বলছি কি ছাই আপনাকে ! আমি আর প্রভাস গিয়ে আজ সকাল থেকে কতখোশামোদ, তা বললেন, আমি যাব না। এখানে বেশ আছি। কুশ্রেণীর দুটো মেয়ে আছে সে বাড়িতে, দিব্যি দেখলুম সাজিয়েছে। আমায় বললেন, দেশে আর সে জঙ্গলে ফেরবার আমার ইচ্ছে নেই। এই বেশ আছি। অরুণ তাঁকে সুখে রাখবে বলেছে। কলকাতা শহর ফেলে তিনি আর জঙ্গলে ফিরতে চান না, এই গেল আসল কথা। বললেন, আমি সাবালিকা, আমার বয়স হয়েছে, আমি এখন যা খুশি করতে পারি। আমি যাব না। এখন যেমন ব্যাপার বুঝছি অরুণের সঙ্গে ওর—মানে মনের মিল হয়ে গিয়েছে—বয়েসও তো এখনো— বুঝলাম যতদূর তাতে—

কেদার অধীর ভাবে বললেন, আমার কথা বলেছিলে ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, এই জিজ্ঞেস করুন না প্রভাসকে। সকাল থেকে ঝুলোঝুলি করেছি আমরা। কিছু কি আর বাদ রেখেছি—কাল থেকে কলকাতা শহর তোলপাড় করে বেড়িয়েছি। ওদিকে অরুণের সঙ্গে ওখানে গিয়ে উঠেছেন তা কি করে জানব ?তা আপনার কথা বলতে বললেন, বাবাকে দেশে ফিরে যেতে বলুন। আমার এখন সেখানে যাবার ইচ্ছে নেই—এই জিজ্ঞেস করুন না প্রভাসকে ?

প্রভাস বিষণ্ণ মুখে বললে, সে-সব কথা আর কি বলি ?কত রকম করে বোঝালুম, তা ওই এক বুলি মুখে ! আমি আর ফিরব না দেশে, বাবাকে গিয়ে বলো গে যাও। আমি এখানে বেশ আছি। এসব কথা কি আপনার কাছে বলবার কথা, লজ্জায় মাথা কাটা যায়—কি করি বাধ্য হয়ে বলতে হচ্ছে। আমি কি চেষ্টার ত্রুটি করেছি কাকাবাবু ?এখন এক উপায় আছে পুলিশে খবর দেওয়া। আপনার সঙ্গে সেই পরামর্শ করতেই আসা। আপনিও চলুন আমাদের সঙ্গে, জোড়াসাঁকো থানায় গিয়ে পুলিশের কাছে এজাহার করে দেওয়া যাক—

গিরীন চিন্তিত মুখে বললে, তাতেই বা কি হবে, সেই ভাবছি। ছেলেমানুষ নয়, বয়েস হয়েছে ছাব্বিশ-সাতাশ, বিধবা—সে মেয়ে যা খুশি করতে পারে। পুলিশ হস্তক্ষেপ করতে চাইবে না।তার ওপরে ওঁদের মানী বংশ, পুলিশে কেস করতে গেলেই এ নিয়ে খবরের কাগজে একটা লেখালেখি হবে, ওঁদের ছবি বেরুবে, একটা কেলেঙ্কারির কথা—ভালো কথা তো নয় ?চারিদিকে ছি ছি পড়ে যাবে। এ সবই ভাবছি কিনা ! তা উনি যে-রকম বলেন সে-রকম করতে হবে। চলুন না হয় এখুনি তবে পুলিশে যাই—পুলিশে খবর দিলেই এখুনি প্রথম তো ওঁর মেয়েকে বেঁধে চালান দেবে—যদি অবিশ্যি পুলিশে এ কেস্ নেয়। তাকেই আসামী করবে—

—গিরীন ধীরে ধীরে যে চিত্রপট কেদারের সামনে খুলে ধরলে, নিরীহ কেদার তাতে শিউরে উঠলেন। তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, না না—পুলিশে যাওয়ার দরকার নেই।

গিরীন বললে, না কেন ?আমার মনে হয় পুলিশে একবার যাওয়া উচিত। আমাদের মোটরে আসুন জোড়াসাঁকো থানায়।আপনি গিয়ে এজাহার করুন। আদালতে আপনাকে সব খুলে বলতে হবে এর পর। হয় কেস্ হোক। আপনার মেয়ে যখন এ পথে গিয়ে পড়েছেন, তখন তাঁরও একটু শিক্ষা হয়ে যাক না ! তিনটি বছর জেল ঠুকে দেবে এখন। ও অরুণকেও ছাড়বে না—আপনার মেয়েকেও ছাড়বে না। যা হয় হবে, আপনি আসুন আমাদের সঙ্গে জোড়াসাঁকো থানায়। চলুন—কি বলো প্রভাস ?

প্রভাস বললে, হ্যাঁ, তা যেতে হবে বৈকি। যা থাকে কপালে। শরৎদিকে আসামী হয়ে ডকে দাঁড়াতে হবে বলে আর কি করা, চলুন আপনি। আমার গ্রামের লোক আপনি। আমি এর একটা বিহিত না করে—

গিরীন বললে, না, বিহিত করাই উচিত। খারাপ পথে যখন পা দিয়েছে, তখন ওদের শাস্তি হয়ে যাওয়াই উচিত। জেল হলেই বা আপনি করবেন কি ?আসুন, উঠুন গাড়িতে, আপনার আহারাদি হয়েছে ?

কেদার যেন অকূলে কূল পেয়ে বললেন, না, এখনো হয়নি। ভাত চড়াতে যাচ্ছিলাম—

—কি সর্বনাশ ! খাওয়া হয়নি এখনো ?আপনি রান্নাখাওয়া করে নিন—আমরা ততক্ষণ একটু অন্য কাজ সেরে আসি।

গিরীন বললে, আপনি না থাকলে তো পুলিশে এজাহার করাই হবে না। আমরা কে—আপনিই তো ফরিয়াদী—আপনার মেয়ে, আমরা বাইরের লোক—আমাদের কথা নেবেই না পুলিশ। আপনাকে না নিয়ে গেলে তো কাজই হবে না। আপনি খাওয়া-দাওয়া করুন, আমরা বেলা চারটের মধ্যে আসব।

প্রভাস ও গিরীন মোটর নিয়ে চলে গেলে কেদার খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে কি ভাবলেন। ঠিকমতো ভাববার শক্তিও তখন তাঁর নেই—মাথার মধ্যে কেমন যেন সব গোলমাল হয়ে গিয়েছে। জীবনে কখনো এ ধরনের ভাবনা ভাবেননি তিনি— নির্বিরোধী নিরীহ মানুষ কেদার—শখের যাত্রাদলে গানের তালিম দিয়ে আর গ্রাম্য মুদির দোকানে বসে হাসিগল্প করেই চিরদিন কাটিয়ে এসেছেন।এমন জটিল ঘটনাজালের মধ্যে কখনো পড়েননি, এমন ধরনের চিন্তায় তার মস্তিষ্ক অভ্যস্ত নয়।

একটা কথাই শুধু বার বার তাঁর মাথায় খেলতে লাগল—পুলিশে গেলে তাঁকে মেয়ের বিরুদ্ধে এজাহার করতে হবে, তাতে তাঁর মেয়ের জেল হয়ে যেতে পারে !

শরতের জেল হয়ে যেতে পারে !

আর এ মোকদ্দমার তিনিই হবেন ফরিয়াদী। আদালতে দাঁড়িয়ে মেয়ের বিরুদ্ধে সাক্ষী দিতে হবে তাঁকে !

ঝি এসে বললে, বাবু ওনারা চলে গেল। দিদিমণির কথা কি বলে গেল বাবু ?কখন আসবেন তিনি ?

কেদারের চমক ভাঙল ঝিয়ের কথায়। বললেন, হ্যাঁ—এই—কি বললে ?ও, শরৎ—না, তার এখন আসবার দেরি আছে।

—তা আপনি আজ ভাত চড়াবেন না বাবু ?দিদিমণির খবর তো পাওয়া গেল—এখন দুটো ভাতে ভাত যা হয় চড়িয়ে—

—না মেয়ে, এখন অবেলায় আর ভাত—দুটো চিঁড়ে এনে দেবে ?

—ওমা, চিঁড়ে খেয়ে থাকবেন আপনি ?তা দেন, পয়সা দেন—নিয়ে আসি।

বাগানের পথে দিব্যি বাঙালিলেবু গাছের ছায়া পড়েছে, প্রায় বিকেল হতে চলল।

ঘণ্টা দুই পরে প্রভাস ও গিরীন মোটর নিয়ে ফিরে এসে দেখলে ঝি গাড়িবারান্দার সামনের রোয়াকে বসে। তাকে জিজ্ঞেস করে জানা গেল কেদার কোথায় চলে গিয়েছেন, বাজার থেকে চিঁড়ে কিনে নিয়ে এসে সে আর তাঁকে দেখতে পায়নি। কেদারের কাপড়-চোপড়ের পুঁটুলিটাও সেই সঙ্গে দেখা গেল নেই।

গিরীন বাগানের বাইরে এসে হো হো করে হেসে গড়িয়ে পড়ে আর কি !

—কেমন বাবাঃ, বললাম যে সব আমার হাতে ছেড়ে দাও—গিরীন কুণ্ডুর মাথার দাম লাখ টাকা বাবা ! ও পাড়াগেঁয়ে বুড়োর কানে এমন মন্তর ঝেড়েছি যে, এ-পথে আর কোনো দিন হাঁটবে, বলিনি তোমায় ?

—আচ্ছা বুড়োটা গেল কোথায় ?

—কোথায় আর যাবে ?গিয়ে দেখ গে যাও তোমাদের সেই কি পুর বলে, তার জঙ্গলের মধ্যে গিয়ে কাল সকাল নাগাত ঠেলে উঠেছে। লজ্জায় এ-কথা কারো কাছে এমনিই বলতে পারত না—তার ওপর যে পুলিশের ভয় দিইছি ঢুকিয়ে বুড়োর মাথায়—দেখবে যে রা কাটবে না কারো কাছে। এক ঢিলে দুই পাখি সাবাড়।

দমদমার বাগানবাড়ি থেকে বার হয়ে কেদার পুঁটুলি হাতে হন্‌হন্ করে পথে চলতে লাগলেন। হাতে পয়সার সচ্ছলতা নেই—খরচের দরুন যা কিছু ছিল, তা নিতান্তই সামান্য। তা ছাড়া কেদার এখনো কোথায় যাবেন না যাবেন ঠিক করে উঠতে পারেননি—এখন তাঁর প্রথম ও প্রধান লক্ষ্য, তাঁর ও কলকাতা শহরের মধ্যে অতিদ্রুত ও অতি বিস্তৃত একটি ব্যবধান সৃষ্টি করা। এই ব্যবধান যত বড় হবে, যত দূরে গিয়ে তিনি পড়তে পারবেন—তাঁর মেয়ে তত নিরাপদ।

সুতরাং পিছন ফিরে না চেয়ে এখন শুধু হেঁটেই যেতে হবে...হেঁটেই যেতে হবে। মেয়ের বিপদ না ঘটে...শুধু হাঁটতেই হবে। কিসের বিপদ মেয়ের, তা কেদারের ভাবার সময় বা অবসর নেই। মেয়ে যে খুব নিরাপদ আছে কি নেই—সে-সব ভাবনারও সময় নেই এখন। শুধু হাঁটতে হবে, কলকাতা থেকে দূরে গিয়ে পড়তে হবে। প্রভাস ও গিরীন যেমন রেগে গিয়েছে, ওরা শোধ তুলে হয়তো ছাড়বে অরুণের ওপর। মোটরে করে এসে তাঁকে রাস্তা থেকে জোর করে নিয়ে না যায় !

ক্ষুধা নেই, তৃষ্ণা নেই, ক্লান্তি নেই, পরিশ্রম নেই, শুধু পথ বেয়ে চলা—যতদূর যাওয়া যায়।

সন্ধ্যার সময় দমদমা থেকে সাত মাইল দূর যশোর রোডের ধারে গাছতলায় বসে একটি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে হাউ হাউ করে কাঁদতে দেখে দু-চারজন পথিকের ভিড় জমে গেল।

একজন বললে, কি হয়েছে মশায় ?

আর একজন বললে, বাড়ি কোথায় আপনার ?কি হয়েছে ?

লোকজনের মধ্যে বেশির ভাগ চাষী লোক, দুজন দমদমায় এইচ-এম-ভি গ্রামোফোন কোম্পানির কারখানায় কাজ করে, ছুটির পর সাইকেলে গ্রামে ফিরছিল। তাদের একজন এগিয়ে এসে বললে—কি হয়েছে মশাই ?আমিও ব্রাহ্মণ, আসুন আমার বাড়ি—এই কাঁচা রাস্তা দিয়ে নেমে গিয়ে গরানহাটি কেশবপুরে আমার বাড়ি—

কেদার বললেন, না, ও কিছু না—আমি এখন হেঁটে যাব—

—কাঁদছেন কেন, কি হয়েছে আপনার বলতেই হবে—আসুন আপনি দয়া করে। এ অন্ধকার রাত্রে একা যাবেন কোথায় ?

কেদার কাকুতি মিনতির সুরে বললেন, না বাবু, আমি যাব না। আমার কিছুই হয়নি—এই গিয়ে মাঝে মাঝে পেটে ফিক্‌ব্যথা ধরে কিনা। ও কিছু নয়, এক্ষুনি সেরে যাবে—সেরে গিয়েছে অনেকটা।

কেদার পুঁটুলি নিয়ে অন্ধকারের মধ্যে উঠে বারাসাতের দিকে রওনা দিলেন পথ ধরে।

সকলে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলে।

ওদের মধ্যে একজন মুচকি হেসে বললে, পাগল—পাগল ও, দেখেই চেনা যায়। পাগল—

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে পথে রাত এল। অন্ধকার রাত। কেদারের দৃক্‌পাত নেই—কোথায় যাচ্ছেন তা তিনি এখনো জানেন না। মাঝে মাঝে মোটরের হর্ন বাজে পেছন থেকে, মালবোঝাই লরি যশোর রোড বেয়ে বারাসাত কি বনগাঁয়ে মাল নিয়ে চলেছে—কেদার হর্ন শুনলেই পথের ধারের গাছের গুঁড়ির আড়ালে লুকিয়ে পড়েন, প্রভাসদের মোটর তাঁর সন্ধানে পুলিশ নিয়ে বেরিয়েছে কিনা কে জানে ! সারাদিন পেটে কিছু যায়নি, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় কেদার এখন আহারের কোনো প্রয়োজন পর্যন্ত অনুভব করছেন না। শরীর এবং মন যেন তাদের সমস্ত অনুভূতি হারিয়ে একটিমাত্র অনুভূতিতে পর্যবসিত হয়েছে, সেটা সময় যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশ তীক্ষ্ণ ও স্পষ্ট হয়ে উঠছে। অন্য কিছু নয়—কন্যার উপর তাঁর গভীর স্নেহ ও একটি অদ্ভুত করুণা। শরৎ যেন ছাব্বিশ বছরের যুবতী নেই, তাঁর মনোরাজ্যে সে কখন শিশু মেয়েটি হয়ে ফিরে এসেছে, যে গড়শিবপুরের বাড়িতে জঙ্গলের ধারে কুচফল তুলে খেলা করত—তার খেলাঘরে ধুলোর ভাত ও পাথরকুচি পাতা মাছ খেতে হয়েছে বসে বসে। তার এখনো কি বুদ্ধিই বা হয়েছিল, চিরকাল পাড়াগাঁয়ে কাটানোর ফলে শহরের ব্যাপারে কি বা সে বোঝে !

একবার ভাবলেন, কলকাতায় ফিরে গিয়ে পাশের বাগানের চাটুজ্যে মশায়ের কাছে সব কথা ভেঙে বলে তাঁর সাহায্য চাইলে কেমন হয় ?কিন্তু পুলিশের আইন বড় কড়া। সেখানে চাটুজ্যেমশায় কতটুকু সাহায্য করতে পারবেন ?বিশেষ করে এমন একটা কথা তিনি কি চাটুজ্যে মশায়কে খুলে বলতে পারবেন ?তবে কথা গোপন থাকবে না। ওই ঝিটা এতক্ষণ কথাটা পাড়াময় রাষ্ট্র করেছে—ঝি কি আর এতক্ষণ এ কথা না জেনেছে ! ওই

প্রভাস ও গিরীনই তাকে সব কথা প্রকাশ করে বলেছে এতক্ষণ। না, সেখানে আর ফিরবার উপায় নেই—এখন তো নয়ই, এর পর—কত পরে তা তিনি এখনো জানেন না—যা হয় একটা কিছু করবেন তিনি।

বারাসাতের বাজারে পৌঁছে কেদারের ইচ্ছে হল এখানে চা কিনে খান দোকান বেছে— রাস্তার ধারেই অনেকগুলো চায়ের দোকান। আজ শরৎ নেই সঙ্গে যে তাঁকে দোকানের চা খেতে বাধা দেবে, যে তাঁকে ইহকালের অনাচার থেকে সন্তর্পণে বাঁচিয়ে রেখে তাঁর পরকালের মুক্তির পথ খোলসা করবার জন্যে সচেষ্ট ছিল চিরদিন—আজ সে নির্মমভাবে সমস্ত অনাচারের স্বাধীনতা দিয়ে তাঁকে ছেড়ে চলে গিয়েছে—সুতরাং অনাচার তিনি করবেনই। যা হয় হবে, পরকাল তিনি মানেন না।আরো জোর করে, ইচ্ছে করে তিনি যা খুশি অনাচার করবেন। কে দেখবার আছে তাঁর ?

রাস্তার ধারের দোকান থেকে এক পেয়ালা চা খেয়ে কেদার আবার হন্‌হন্‌ করে রাস্তা হাঁটতে লাগলেন—সারারাত ধরে পথ চলে সকালের দিকে দত্তপুকুর থেকে কিছু দূরে একটা গ্রামে এসে পথের ধারেই বসে পড়লেন। আর তিনি ক্ষুধা ও পথশ্রম-ক্লান্ত দেহটাকে টেনে নিয়ে যেতে পারছেন না।

জনৈক গ্রাম্য লোক সকালে গাড়ু হাতে মাঠ থেকে ফিরে আসছিল, তাঁকে এ অবস্থায় দেখে বললে—কোথা থেকে আসা হচ্ছে ?

—আজ্ঞে বারাসাত থেকে।

কেদার একটু মিথ্যে কথার আমদানি করলেন, লোককে সন্ধান দেওয়ার দরকার কি, তিনি কোথা থেকে আসছেন ?

লোকটি আবার বললে, তা এখানে বসে এমনভাবে ?

—একটু বসে আছি, এইবার উঠি।

—আপনারা ?

—ব্রাহ্মণ।

—আজ্ঞে প্রাতঃপ্রণাম। আমার নাম হরিহর ঘোষ, কায়স্থ—আপনি যদি কিছু না মনে করেন, একটা কথা বলি। আমার বাড়ি এবেলা দয়া করে পায়ের ধুলো দিয়ে দুটি সেবা করে যান। আমরাও প্রসাদ পাব এখন। চলুন উঠুন।

কেদার কিছুতেই প্রথমটা রাজী হননি—কিন্তু তাঁর চেহারা দেখে লোকটার কেমন দয়া ও সহানুভূতির উদ্রেক হয়েছিল, সে পীড়াপীড়ি করে তাঁকে নিজের বাড়িতে নিয়ে গেল। কেদার দেখলেন লোকটি সম্পন্ন অবস্থার গ্রাম্য গৃহস্থ, বাইরে বড় চণ্ডীমণ্ডপ, অনেকগুলো ধানের মরাই, বাড়ির সামনে একটা পানাভরা ডোবা। সেই ছোট পানাভরা ডোবার আবার একটা ঘাট বাঁধানো দেখে দুঃখের মধ্যেও কেদার ভাবলেন—এদের দেশে এর নাম পুকুর, এর আবার বাঁধা ঘাট ! এদের নিয়ে গিয়ে গড়ের কালো পায়রার দীঘিটা একবার দেখিয়ে দিতে হয়—

ভালো লাগল জায়গাটা তবুও। কেদার সারাদিন রইলেন, সন্ধ্যার সময় বিদায় নিতে চাইলে গৃহস্বামী আপত্তি করে বললে—তা হবে না ঠাকুরমশায়। সামনে অন্ধকার রাত, আপনাকে কি ছেড়ে দিতে পারি এখন ?থাকুন না এখানে দুদিন।

ইতিমধ্যে কেদার নিজের একটা মিথ্যা পরিচয় দিয়েছিলেন। তিনি গরিব ব্রাহ্মণ। গোবরডাঙার জমিদারবাড়িতে কিছু সাহায্য প্রার্থনা করতে চলেছেন।

লোকটা তাই বললে, দুদিন থাকুন, দেখি যদি আমাদের এখান থেকে আপনাকে কিছু সাহায্য করতে পারি। আমি দুপুরবেলা দু-একজনকে আপনার কথা বলেছি—সকলেই কিছু কিছু দিতে রাজী হয়েছে।

কেদার বিপদে পড়লেন। তিনি গড়শিবপুরের রাজবংশের লোক, কারো কাছে হাত পেতে কখনো কিছু নিতে পারবেন না ওভাবে—যতই অভাব থাকুক। নিজেকে গরিব ব্রাহ্মণ বলে তিনি যে মহা মুশকিলে পড়ে গেলেন।

রাত্রিটা অগত্যা থেকে যেতে হল। পরদিন সকালে তিনি যখন আবার বিদায় চাইলেন, গৃহস্বামী তিনটি টাকা তাঁর হাতে দিতে গেল। বললে—এই উঠেছে ঠাকুরমশায়, মিত্তির মশায় দিয়েছেন এক টাকা আর আমি সামান্য কিছু—এই নিয়ে যান—

কেদার বিনীতভাবে বললেন, আমি ও নিতে পারব না—

ঘোষ মশায় আশ্চর্য হয়ে বললে, নেবেন না ?কেন ?

—আজ্ঞে—ইয়ে—ও আমার দরকার নেই।

ঘোষ মশায় তাঁর মুখের দিকে চেয়ে বললে, এর চেয়ে বেশি উঠল না যে ঠাকুর মশায়। না হয় আমি আর একটা টাকা—

কেদার বললেন, না—না—আপনি অতি মহৎ লোক, যা করেছেন তা কেউ করে না। কিন্তু আমি—আমি নিতে পারব না। আমি আপনাকে এমনিই আশীর্বাদ করছি—আপনি ধনেপুত্রে লক্ষ্মীশ্বর হোন—ভগবান আপনাদের সুখে রাখুন—

কেদারের চোখে জল দেখে গৃহস্বামী বিস্মিত হয়ে তাঁর দিকে চেয়ে রইল, তার পরে উঠে তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে বললে—আচ্ছা, আপনি ঠিকমতো পরিচয় দেননি বোধ হয়। এ বাজারে চার টাকা ছেড়ে দেয় এমন লোক আমি দেখিনি—বলুন আপনি কে—কি হয়েছে আপনার—

কেদার উদ্গত অশ্রু কোনোমতে চেপে তাড়াতাড়ি সেখান থেকে বিদায় নিয়ে রাস্তায় উঠতে উঠতে বললেন—কিছু হয়নি, কিছু হয়নি। আমি আসি, আমার বিশেষ দরকার আছে কিছু মনে করবেন না—

গৃহস্বামী টাকাটা হাতে করে অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

সেদিন সারাদিন অনবরত পায়ে হেঁটে সন্ধ্যার পর কেদার গড়শিবপুর থেকে ছয় ক্রোশ দূরে হলুদপুরের বাজারে পৌঁছলেন। এখানে কেউ তাঁকে চিনত না—চার ক্রোশ দূরের এ বাজারে তাঁর যাতায়াত বিশেষ ছিল না। না চেনে সে খুব ভালো।একটা পুকুরের বাঁধা ঘাটের চাতালে এসে বসলেন, এতদূর পর্যন্ত চলে এসেছেন কিসের ঝোঁকে, কিছু বিবেচনা না করেই, এইবার তাঁর মনে প্রশ্ন জাগল—কোথায় যাবেন তিনি ?গাঁয়ে ফেরা কি উচিত হবে ?মেয়ের কথা লোকে জিজ্ঞেস করলে কি উত্তর দেবেন তিনি ?কেদারের উদ্‌ভ্রান্ত মন এ দু-দিন এসব কথা ভাববার অবকাশ পায়নি।

ছয়

রাত্রে শরতের ভালো ঘুম হল না, অচেনা জায়গা, ভালো ঘুম হবার কথা নয়, দেশের বাড়ি ছেড়ে এসে পর্যন্তই তার ঘুম তেমন হয় না। কিন্তু কাল রাত্রে কি জানি কেমন হল, বাবার কথা মনে হয়েই হোক্ বা অন্য যে কারণেই হোক্—শরৎ প্রথম দিকে তো চোখের পাতা একটুও বোজাতে পারেনি।

প্রভাসের বউদিদি তার পাশে শুয়ে দিব্যি ঘুমিয়ে পড়ল। এত শব্দ এত আওয়াজের মধ্যে মানুষ পারে ঘুমুতে ?মোটরগাড়ি যাচ্ছে, লোকজনের কথাবার্তা চলছে—ভালো রকম অন্ধকার হয় না, জানলা দিয়ে কোথা থেকে আলো এসে পড়েছে দেওয়ালের গায়ে—আর সারারাতই কি লোক-চলাচল করবে আর গান-বাজনা চলবে ?এখানে এতও গানবাজনা হয় ! ডুগি-তবলার শব্দ, হারমোনিয়মের আওয়াজ, মেয়ে-গলার গান চলেছে আশেপাশের সব বাড়ি থেকে। দমদমার বাগানবাড়িতে থাকতে সে বুঝতে পারেনি আসল কলকাতা শহর কি। এখন দেখা যাচ্ছে এখানকার তুলনায় দমদমার বাগানবাড়ি তাদের গড়শিবপুরের জঙ্গলের সমান।

ভোরে উঠে সে গঙ্গাস্নান করে আসবে—এখান থেকে গঙ্গা কতদূর কে জানে ?প্রভাসদাকেবললে মোটরে নিয়ে যাবে এখন। সকালে প্রভাসের বউদিদির ডাকে তার ঘুম ভাঙল। জানলা দিয়ে রোদ এসে পড়েছে বিছানায়। অনেক বেলা পর্যন্ত ঘুমিয়েছে নাকি তবে ?ওর মুখে কেমন ধরনের ভয় ও উৎকণ্ঠার চিহ্ন প্রভাসের বউদিদির চোখ এড়াল না।

সে বললে, ভাবনা কি দিদি, দেরিতে উঠেছ, তাই কি—তোমায় উঠে আপিস করতে হচ্ছে না তো আর। মুখ ধুয়ে নাও, চা হয়ে গিয়েছে—

শরৎ লজ্জিত মুখে জানালে এত সকালে সে চা খায় না। তার চা খাওয়ায় কতকগুলো বাধা আছে—স্নান করতে হবে, কাপড় ছাড়তে হবে—সে-সব হাঙ্গামায় এখন কোনো দরকার নেই, থাকগে। গঙ্গা এখান থেকে কতদূর ?একবার গঙ্গায় নাইতে যাবার বড় ইচ্ছে তার। প্রভাসদা কখন আসবে ?

প্রভাসের বউদি বললে, গঙ্গা নাইবে ?চল না আমাদের—আচ্ছা, দেখি বোসো। ওরা আসুক সব—

—কখন আসবে ?আসতে বেশি দেরি করবে না তো প্রভাসদা ?

—কি জানি ভাই ! তবে দেরি হওয়ার কথা নয় তো, এখুনি আসবে—

—গঙ্গা নেয়ে এসে আমি বাবার কাছে যাব—আমায় রেখে আসুক—

—সে কি ভাই ?এ-বেলাটা থাকবে না এখানে ?থেকে খাওয়াদাওয়া করে ওবেলা—

শরৎ চিন্তিত মুখে বললে, কাল রাতে গেলাম না, বাবা কত ভেবেছেন। আমার কি থাকবার জো আছে যে থাকব ?

প্রভাসের বউদিদি বললে, ওবেলা চলো ভাই সিনেমা দেখে দুজনে—

—কি দেখে ?

—সিনেমা—মানে বায়োস্কোপ টকি—

—ও—

—দেখে চলো আমরা যশোর রোড দিয়ে মটোরে বেড়িয়ে আসব। চাঁদের আলো আছে—

শরৎ হেসে বললে, মোটে একাদশী গেল বুধবারে, এরই মধ্যে চাঁদের আলো কোথায় পাবেন ?আপনারা কলকাতার লোক, আপনাদের সে খবরে কোনো দরকার নেই—ওখানে সারারাতই গ্যাসের আলো—ইলেক্‌ট্রিক আলো—

ঈষৎ অপ্রতিভের সুরে প্রভাসের বউদিদি বললে, তা বটে ভাই, যা বলেছ। ওসব খেয়াল থাকে না।

এমন সময় পাশে কমলাদের ঘর থেকে জড়িত স্বরে কে বলে উঠল—আরে ও হেনা বিবি, এদিকে এসো না চাঁদ, আলোর সুইচটা যে খুঁজে পাচ্ছি নে—ও হেনা বিবি—

প্রভাসের বউদিদি হঠাৎ খিল্‌খিল্‌ করে হেসে উঠে বললে, আ মরণ, বেলা সাড়ে সাতটা বাজে—উনি আলোর সুইচ খুঁজে বেড়াচ্ছেন এখন—

শরৎ বললে, কি হয়েছে, কে উনি ?

—কে জানে কে ?মাতালের মরণ যত—পাশের বাড়ির এক বুড়ো। রোজ ভাই অমনি করে—

শরৎও হেসে ফেললে মাতাল বুড়োটার কথা ভেবে। বললে, ডাকছে কাকে ?ও যেন পাশের ঘর থেকে কথা বললে বলে মনে হল—না ?

—ওই পাশের বাড়ি, দোতলার জানালাটা খোলা রয়েছে দেখছ তো, ওই ঘর। দাঁড়াও আসছি—

শরৎ শুনলে বুড়ো মাতালটা হঠাৎ ‘এই যে হেনা বিবি, বলিহারি যাই ! বলি শার্সি জানলা বন্ধ করে’—এই পর্যন্ত চেঁচিয়ে বলে উঠেই চুপ করে গেল। কে যেন তার মুখে থাবা দিয়ে চুপ করিয়ে দিলে। কিছুক্ষণ পরে কমলাও ঘরে ঢুকল। শরৎ হাসিমুখে বলে উঠল—এসো ভাই গঙ্গাজল এসো—তোমাকেই খুঁজছি—গঙ্গা নাইতে চলো না কেন যাই সবাই মিলে ?

কমলা সত্যিই সুন্দরী মেয়ে। ঘুম ভেঙে সদ্য উঠে এসেছে, আলুথালু চুলের রাশ খোঁপার বাঁধন ভেঙে ঘাড়ে পিঠে এলিয়ে পড়েছে, বড় বড় চোখে অলস দৃষ্টি, মুখের ভাবেও জড়তা কাটেনি—বেশ ফর্সা নিটোল হাত দুটি কেমন চমৎকার ভঙ্গিতে ঘাড়ের পেছনে তুলে ধরে এলোচুল বাঁধবার চেষ্টা করছে। আসলে বাঁধার ছলে একটা কায়দা মাত্র, চুল বাঁধবার চেয়ে ওই ভঙ্গিটা দেখাবার আগ্রহটাই ওখানে বেশি। শরতের হাসি পায়—ছেলেমানুষ কমলা।

শরৎ এসব বোঝে। সে-ও এক সময়ে সুন্দরী কিশোরী ছিল, ওই কমলার মতো বয়সে, সে জানে, নিজেকে ভালো দেখানোর কত খুঁটিনাটি আগ্রহ অকারণে মেয়েদের মনে জাগে। তারও জাগত। এসব শিখিয়ে দিতে হয় না, বলে দিতে হয় না মেয়েদের। আপনিই জাগে। শরতের কেমন স্নেহ হয় কমলার ওপর। স্নেহের সুরেই বলে—ভাই, চমৎকার দেখাচ্ছে তোমায় গঙ্গাজল—

—সত্যি ?

—সত্যি বলছি।

কমলার মুখে লজ্জার আভাস নেই, সে যে পথে পা দিয়েছে, সে পথের পথচারিণীরা লজ্জাবতী লতা নয়, বনচাঁড়ালের পাতা—টুসি দিলে নাচে। কমলা হেসে বললে, আপনার ভালো লাগে ?

—খুব ভাই—খুব—

—তবে তো আমার ভবিষ্যতের পক্ষে ভালো—এদিকে আবার গঙ্গাজল পাতিয়েছি—

কমলার কথার নির্লজ্জ সুর শরতের কানে বাজল। সে মনে মনে ভাবলে, মেয়েটি ভালো, কিন্তু অল্পবয়সে একটু বেশি ফাজিল হয়ে পড়েছে। আমি ওর চেয়ে কত বড়, মা না হলেও কাকি-খুড়ির বয়সী—আমার সঙ্গে কেমন ধরনের কথা বলছে দ্যাখো—

কমলা বললে, আপনি চা খেয়েছেন ?

শরৎ হেসে বললে, না ভাই, আমি বিধবা মানুষ, নাইনি, ধুইনি—এখুনি চা খাব কি করে ?চা খাওয়ার কোনো তাড়াতাড়ি নেই আমার। এখন গঙ্গা নাইবার কি ব্যবস্থা হয় বলো তো ?

—চলুন হেঁটে গিয়ে নেয়ে আসি। এই তো আহিরিটোলা দিয়ে গেলে সামনেই গঙ্গা—

প্রভাসের বউদিদি ওদের ঘরের মধ্যে ঢুকতে যাচ্ছিল, এমন সময়ে পেছন থেকে গিরীন ডাকলে—ও হেনা বিবি—

হেনা দাঁড়িয়ে গিয়ে পেছন ফিরে বললে, কখন এলে ?কি ব্যাপার ?ওদিকে—

গিরীন চোখ টিপে বললে, আস্তে।

হেনা এবার গলার সুর নিচু করে বললে, কি হল ?

—এখনো হয়নি কিছু। আমরা এখনো বুড়োর কাছে যাইনি। বেশি বেলা হলে যাব। এদিকের খবর কি ?

হেনা রাগের সুরে বললে, তোমরা আমায় মজাবে দেখছি। এখনো সে কিছু খায়নি, এ বাড়ি এসে পর্যন্ত দাঁতে কুটো কাটেনি। না খেয়ে ও কতক্ষণ থাকবে, ও আপদ যেখানে পারো বাপু তোমরা নিয়ে যাও। আমার টাকা আমায় চুকিয়ে দাও, মিটে গেল গোলমাল। না খেয়ে মরবে নাকি শেষটা—তার পর এদিকে হরি সা যা কাণ্ড বাধিয়েছিল। হেনা বিবি বলে ডাকাডাকি। সারারাত কমলির ঘরে বসে মদ খেয়েছে—এই একটু আগে কি চেঁচামেচি। মেয়েটা যাই একটু সরল গোছের, কোনোরকমে তাকে বুঝিয়ে দিলাম, পাশের বাড়িতে একটা মাতাল আছে তারই কাণ্ড, বিশ্বাস করেছে কিনা কে জানে—

গিরীন হাসিমুখে বললে, ভয় কি তোমার হেনা বিবি, রাত যখন এখানে কাটিয়েছে তখন ওর পরকাল ঝরঝরে হয়ে গিয়েছে। ওর সমাজ গিয়েছে, ধর্ম গিয়েছে। ওর বাবার কাছে সেই কথাই বলতে যাচ্ছি—

—কি বলবে ?

—সে-সব বুদ্ধি কি তোমাদের আছে ?গিরীনের কাছ থেকে বুদ্ধি ধার করে চলতে হয় সব ব্যাটাকে।

—গালাগাল দিয়ো না বলছি—

—গালাগাল তোমাকে তো দিইনি হেনা বিবি, চটো কেন ?তার পর শোনো। সন্দে অবধি রেখে দাও। সন্দের আগে আবার আমরা আসব।

—টাকা নিয়ে এসো যেন।

—অত অবিশ্বাস কিসের হেনা বিবি ?নতুন খদ্দেরের কাছে তাগাদা করো, আমাদের কাছে নয়।

—আচ্ছা, কথায় দরকার নেই—যাও এখন। আমি দেখি গে, কমলিটা ছেলেমানুষ—কি বলতে কি বলে বসে—ওকে সামলে নিয়ে চলতে হচ্ছে আবার—

হেনা ঘরে ঢুকে দেখলে শরৎ ও কমলা চুল খুলে তেল মাখতে বসেছে। বললে—ও কি ?নাইতে যাবে নাকি ভাই ?

কমলা বললে, গঙ্গাজলকে নিয়ে নেয়ে আসি—

হেনা প্রশংসার দৃষ্টিতে শরতের সুদীর্ঘ কালো কেশপাশের দিকে চেয়ে বললে, কি সুন্দর চুল ভাই তোমার মাথায়। এমন চুল যদি আমাদের মাথায় থাকত—

কমলা বললে, আমিও তাই বলছিলাম গঙ্গাজলকে—

শরৎ সলজ্জ স্বরে বললে, যান, কি যে সব বলেন ! গঙ্গাজলের মাথায় চুল কি কম সুন্দর ?দেখুন দিকি তাকিয়ে ?তা ছাড়া আমার লম্বা চুলের কি দরকার আছে ভাই ?বাবা কিছু পাছে মনে করেন তাই—নইলে ও চুল আমি এতদিন বঁটি দিয়ে কেটে ফেলতাম। শুধু বাবার মুখের দিকে চেয়ে পারি নে। তাঁর চোখ দিয়ে যাতে জল পড়ে, তাতে আমার ধর্ম নেই।

হেনা এ পথের পুরাতন পথিক, তার মন কোমল হৃদয়-বৃত্তির ধার ধারে না অনেক দিন থেকে—যা কিছু ছিল তাও পাষাণ হয়ে গিয়েচে চর্চার অভাবে, শরতের কথায় তার মনে বিন্দুমাত্র রেখাপাত হল না—কিন্তু কমলা মুগ্ধ দৃষ্টিতে ওর মুখের দিকে চেয়ে রইল।

হেনা বললে, কমলা, এঁকে গঙ্গায় নিয়ে যাবি ?কেন, বাড়িতে চান করে না ?বেলা হয়ে যাবে !

শরতের দিকে চেয়ে বললে, সে তুমি যেয়ো না ভাই, ও ছেলেমানুষ, পথ চেনে না—কোথায় যেতে কোথায় নিয়ে যাবে !

কমলা বললে, বা রে, আমি বুঝি আর—সেবার তো আমি—

হেনা কমলাকে চোখ টিপে বললে, থাম বাপু তুই। তুই ভারি জানিস রাস্তা-ঘাট। তার পর দিদিকে নিয়ে যেতে একটা বিপদ হোক রাস্তায়। যে গুণ্ডা আর বদমাইশের ভিড়—

শরৎ বললে, সত্যি নাকি ভাই, বলুন না ?

—আমি কি আর মিথ্যে কথা বলছি—ও ছেলেমানুষ, কি জানে ?

এইবার কমলা বললে, না—তা—হ্যাঁ আছে বটে।

—কি আছে ভাই গঙ্গাজল ?

কমলাকে উত্তর দেওয়ার সুযোগ না দিয়েই বললে, কি নেই কলকাতা শহরে বলতে পারো ?সব আছে। আজকাল আবার সোলজারগুলো ঘুরে বেড়ায় সর্ব জায়গায়।

—সে আবার কি ?

—সোলজার মানে গোরা সৈন্য। এরা যে অঞ্চলে আছে, তার ত্রিসীমানায় মেয়েমানুষের যাওয়া উচিত নয়। না, তুমি যেয়ো না ভাই। আমি তোমায় যেতে দিতে পারি নে। তোমার ভালো-মন্দর জন্যে আমি দায়ী যখন। প্রভাস-ঠাকুরপো আমার হাতে তোমায় যখন সঁপে দিয়ে গিয়েছে।

কমলা বললে, আমরা তেল মাখলাম যে !

—তেল মেখে বাড়ির বাথরুমে ওঁকে নিয়ে চান করো। মিছিমিছি কেন ওঁকে বিপদের মধ্যে নিয়ে যাওয়া ?

আড়ালে নিয়ে গিয়ে কমলাকে হেনা খুব বকলে। প্রভাসের কাছ থেকে সে-ও টাকা নেবে যখন, তখন এতটুকু বুদ্ধি নিয়ে কাজ করলে কি চলে না ?বাড়ির মধ্যেই ওকে ধরে রাখা যাচ্ছে না, একবার বাইরের রাস্তায় পা দিলে আর সামলানো যাবে না ওকে। এত কম বুদ্ধি কেন কমলার ! হরি সা লোকটাকে কাল রাত্রে ঘর থেকে তাড়িয়ে দিলে কি কোম্পানির রাজ্য অচল হত ?সামলে নানিলে সব কথা ফাঁস হয়ে যেত যে আর একটু হলে ! ঘটে বুদ্ধি হবে কবে তার ?...ইত্যাদি।

কমলা গুরুজন-কর্তৃক-তিরস্কৃতা-বালিকার ন্যায় চুপ করে রইল।

হেনা বললে, তুমি আর ওঘরে যেয়ো না। আমি করছি যা করবার—তুমি যাও। হরি সা যেন এখন আর না ঢোকে—

হেনা ঘরে ঢুকে শরৎকে বললে, গঙ্গায় যাওয়া হবে না ভাই। পথে আজকাল বড় গোলমাল, তুমি বাথরুমে নেয়ে নাও, আমি সব জোগাড় করে রেখে এলাম—

স্নান করে আসবার কিছু পরে হেনা শরৎকে বললে, তোমার খাওয়ার কি করব ভাই ?আমাদের রান্না চলবে না তো ?

—আমার খাওয়ার জন্যে কি ভাই ! দুটো আলোচাল আনুন, ফুটিয়ে নেব।

—মাছমাংস চলে না—না ?গাঁ থেকে এসেছ, এখন চলুক না, কে আর দেখতে আসছে ভাই ?

প্রভাসের বউদিদির এ কথায় শরৎ বিস্মিত হয়ে ওর মুখের দিকে চেয়ে রইল। ব্রাহ্মণের ঘরের মেয়ে নয় বটে, কিন্তু হিন্দু তো—সে একজন ব্রাহ্মণের বিধবাকে একথা বলতে পারলে কি করে ?অন্য জায়গায় এ ধরনের কথা বললে শরৎ নিজেকে অপমানিতা বিবেচনা করত, তবে এরা কলকাতার লোক, এদের কথা স্বতন্ত্র।

শরৎ গম্ভীর মুখে বললে, না, ও-সব চলে না। ও কথাই বলবেন না আর—

হেনা মনে মনে বললে, বাপ রে, দেমাক দ্যাখো আবার ! কথা বলেছি তো ওঁর গায়ে ফোস্কা পড়েছে ! তোমার দেমাক আমি ভাঙব, যদি দিন পাই—কত দেখলাম ওরকম, শেষ পর্যন্ত টিকল না কোনোটা !

শরৎ বিকেল থেকে কেবল দমদমায় ফেরবার জন্যে তাগাদা করতে লাগল। হেনা ক্রমাগত বুঝিয়ে রাখে, ওরা এখনো আসছে না, এলেই পাঠিয়ে দেবে। শরৎ তো জলে পড়ে নেই—এর জন্যে ব্যস্ত কি ?

কমলার দেখা নেই অনেকক্ষণ ধরে। শরৎ বললে, গঙ্গাজল কই, তাকে দেখছি নে—

হেনা কমলাকে সরিয়ে দিয়েছিল, কাঁচা লোক, কখন কি বলে বসবে, করে বসবে—সব মাটি হবে। তা ছাড়া কমলার ঘরে এমন সব জিনিসপত্র আছে, যা দেখলে শরতের মনে সন্দেহ হতে পারে। হরি সা'র একটা বিছানা, আলমারিতে তার দাড়ি কামানোর আসবাব, বড় নল লাগানো গড়গড়া ইত্যাদি। মদের বোতলগুলো না হয় পাড়াগাঁয়ের মেয়ে না বুঝতে পারলে—কিন্তু পুরুষের বাসের এসব চিহ্নের জবাবদিহি দিয়ে মরতে হবে হেনাকে !

বিকেলের দিকে হেনা বললে, চলো ভাই, টকি দেখে আসি—

—সে কোথায় ?

—চৌরঙ্গীতে চলো, শ্যামবাজারে চলো—

—বাবার কাছে কখন যাবে ?ওরা কখন আসবে ?

—চলো, টকি দেখে দমদমায় তোমায় রেখে আসব—

শরৎ তখুনি রাজী হয়ে গেল। টকি দেখবার লোভ যে তার না হয়েছিল তা নয়। বিশেষ করে টকি দেখেই যখন বাবার কাছে যাওয়া হচ্ছে তখন আর গোলমাল নেই এর ভেতর।

কিন্তু হেনার আসল উদ্দেশ্য কোনো রকমে ওকে ভুলিয়ে রাখা। টকি দেখবার জন্যে গাড়ি ডাকতে গিয়েছে বলে দেরি করিয়ে সে প্রায় সন্ধ্যা করে ফেললে। শরৎ ব্যস্ত হয়ে কেবলই তাগাদা দিতে লাগল—কখন গাড়ি আসবে, কখন যাওয়া হবে। হেনাও উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ল, এদের কারো দেখা নেই—পোড়ারমুখো গিরীনটা লম্বা লম্বা কথা বলে, তারও তো চুলের টিকি দেখা যাচ্ছে না, গিয়েছে সেই সকালবেলা। যা করবি করগে বাপু, টাকাটা মিটিয়ে দিয়ে এ আপদ তোরা যেখানেপারিস্ নিয়ে যা, তার এত ঝঞ্ঝাটে দরকার কি ?এদিকে ওকে আর বুঝিয়ে রাখা যায় না।

সন্ধ্যার পরে গিরীন এসে নিচের তলায় হেনাকে ডেকে পাঠালে।

হেনা তাড়াতাড়ি নেমে এসে বললে, কি ব্যাপার জিজ্ঞেস করি তোমাদের ?আমার ঘাড়ে যে চাপিয়ে দিয়ে গেলে এখন আমি করি কি ?ও যে থাকতে চাইছে না মোটে। কোথায় নেবে নিয়ে যাও না, আমি কতকাল ভুলিয়ে রাখব ?আমার থিয়েটার আছে কাল। কাল ওকে কার কাছে রাখব ?ওদিকে কদ্দূর করলে ?

গিরীন তুড়ি দিয়ে গর্বের সুরে বললে, সব ঠিক।

—কি হল ?

—বুড়োকে ভাগিয়েছি। সে বলব এখন পরে। সে পুঁটুলি নিয়ে বুঝলে—হি-হি-হি—

—কি বলো না ?

—পুঁটুলি নিয়ে ভেগেছে, হি-হি—ঝি চিঁড়ে আনতে গিয়েছে আর সেই ফাঁকে হি-হি—পুলিশের অ্যায়সা ভয় দেখিয়ে দিইছি, বুড়োটা আর এমুখো হবে না !

—বেশ, এখন নিয়ে যাও—

—দ্যাখো, ওকে একটু ভুলোও-টুলোও। পাড়াগাঁয়ে গরিব ঘরে থাকত, সুখ আমোদ-আহ্লাদের মুখ দেখেনি। গয়নাগাঁটি কাপড়-চোপড়ের লোভ দেখাবে—

—ওরে বাপ রে, বলেছি তো ও মেয়ে তেমন না। একটুখানি মাছমাংস খাওয়ার কথা বলেছিলাম তো অমনি ফোঁস করে উঠল—আর কেবল হা বাবা যো বাবা—

—তবে আর তোমার কাছে দিয়েছি কেন হেনা বিবি ?পাকা লোকের কাছে রেখেছি, আজ রাতটা রেখে দাও, রেখে যা পারো করো। আজ আর নিয়ে যাই কোথায় ?এখনো কিছু ঠিক করিনি। প্রভাসের বাবা হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছেন, প্রভাস বাড়ি থেকে বেরুতে পারছে না। অরুণ আজ নাইট-ডিউটি করবে আপিসে। আমি একা—

—কেন, তুমি একাই একশো বলে যে বড্ড গোমর করো ! লম্বা লম্বা কথা বলবার সময় হেন করেঙ্গা, তেন করেঙ্গা—এখন কাজের সময়ে হেনা বিবি তুমি করো। আরো টাকা চাই তা বলে দিচ্ছি—

—যা হোক, যা বললাম আজকার রাতটা তো রাখো—

—ও টকি দেখতে যাবে বলছিল, নিয়ে যাব ?

—দরকার নেই। বাড়ির বার করবার হ্যাঙ্গামা অনেক। ভুলিয়ে রাখো—

—কাল সকালে এসো বাপু। কাল আমার থিয়েটার, আমার দ্বারা কাল কোনো কাজ হবে না বলে দিচ্ছি।

হেনা মুখ চুন করে শরতের কাছে এসে দাঁড়িয়ে বললে, বড় মুশকিল ! প্রভাস-ঠাকুরপোর বাবার বড় অসুখ, এখন যান তখন যান। হঠাৎ অসুখ হয়ে পড়েছে—এই মাত্তর খবর দিয়ে পাঠিয়েছে।

শরৎ উদ্বেগের সুরে বললে, অসুখ ! তা বয়সও তো হয়েছে—বাবা বলেন তাঁর চেয়ে দশ-বারো বছরের বড় !

—তা তো বুঝলুম। এদিকে এখন উপায় !

—আজ কি দমদমা যাওয়া হবে না ?

—কি করে আর যাওয়া হচ্ছে বলো ভাই। প্রভাস-ঠাকুরপোর গাড়ি পাওয়া যাচ্ছে না তো—

—কেন ভাড়াটে গাড়ি ?

—কে নিয়ে যাবে ?তুমি আমি দুই মেয়েমানুষ, ভাড়াটে গাড়িতে ভরসা করে যাওয়া চলবে না। কাল সকালেই যা হয় ব্যবস্থা হবে।

শরৎ অগত্যা রাজী হল। না হয়ে উপায় যখন নেই।

সন্ধ্যার পরে শরৎকে সঙ্গে নিয়ে হেনা গিয়ে ছাদে উঠল। চারদিকে আলো কুরকুট্টি, নিচের রাস্তা দিয়ে সারবন্দী গাড়ি ঘোড়া, মোটর, কর্মব্যস্ত জনস্রোত, ফিরিওয়ালারা কত কি হেঁকে যাচ্ছে, বেলফুলের মালাওয়ালা 'চাই বেলফুলের গোড়ে' বলে রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে হাঁকছে, শরৎ মুগ্ধ চোখে চেয়ে চেয়ে দেখলে।

বললে, সত্যি শহর বটে কলকাতা ! জায়গার মতো জায়গা একথা ঠিক ! কি লোকজন, কি আলোর বাহার ! আমাদের গাঁ এতক্ষণ অন্ধকার হয়ে ঝিঁঝি ডাকছে জঙ্গলে।

হেনা অবসর বুঝে অমনি বললে, আমিও তো তাই বলি, এখানেই কেন থেকে যাও না ?সব বন্দোবস্ত করে দিচ্ছি, সুখে থাকবে, খাও-দাও, আমোদ-আহ্লাদ করে বেড়াও—

শরৎ হেসে বললে, তা তো বুঝলাম। আমার ইচ্ছে করে না যে তা নয়, কিন্তু চলবে কি করে ?বাবা গরিব মানুষ—

হেনা উৎসাহের সুরে বললে, সব বন্দোবস্ত হয়ে যাবে এখন। তুমি রাজী হয়ে যাও ভাই—

—কি বন্দোবস্ত হবে ?বাবার চাকরি করে দিতে পারা যায় যদি, তবে সব হয়। গড়শিবপুরের জঙ্গলে থেকে আমার প্রাণও হাঁপিয়ে উঠেছে—দুদিন এখানে থেকে বাঁচি—

—বেশ কথা তো ! কলকাতার মতো জায়গা আছে ভাই ?এখানে নিত্য আমোদ, লোকজন— ইচ্ছে হল আজ শিবপুরে কোম্পানির বাগানে বেড়াতে গেলাম—ইচ্ছে হল আজ জু'তেগেলাম—

—সে আবার কি ?

—মানে চিড়িয়াখানা। যখন যেখানে যেতে চাও গেলে, যা খাবার ইচ্ছে হয় খেলে, এই তোমার বয়েস, হেসে খেলে যদি এখন না বেড়ালে তবে কবে আর কি করবে ?মানব-জীবনে এই সবই তো আসল। জঙ্গলে থাকলাম আর আলোচাল খেলাম—এজন্যে কি আসা জগতে ?

—কি করব বলুন ! অল্প বয়সে কপাল পুড়েছে যখন, তখন কি আর উপায় আছে— ব্রাহ্মণের ঘরের মেয়ের ?বাবাও টাকার মানুষ নন যে কলকাতায় বাসা করে রাখবেন।

—তুমি ইচ্ছে করলেই সব হয়। কলকাতায় থাকতে চাও, বাসা কেন—খুব ভালোভাবে থাকতে পারবে এখন—স্টাইলে থাকবে। রেডিও রাখবে এখন বাড়িতে—

—সে কি ?

—বেতার। ওই শোনো বাজছে—ওই যে দোকানের সামনে লোক জমেছে ?গান গাইছে না ?তার পর গ্রামোফোন মানে কলের গান—

—জানি।

—সে কলের গান রাখো—মটর পর্যন্ত হয়ে যাবে। আজ এখানে বেড়াও, কাল ওখানে বেড়াও ইচ্ছে হল আজ কাশী বেড়াতে যাবে, কাল এলাহাবাদ কি দার্জিলিং বেড়াতে যাবে—

শরৎ হি-হি করে হেসে উঠে বললে, আপনি যে রূপকথার গল্প আরম্ভ করে দিলেন দেখছি ! আমি মুখে বললেই সব হবে—এ যেন সেই আরব্য উপন্যাসের দৈত্যের—যাক্ গে, সত্যি হোক না হোক—ভেবে তো নিলাম—বেশ লোক কিন্তু আপনি !

—আমি মোটেই গল্পকথা বলিনি ভাই। আপনি ইচ্ছে করলেই হয়—

—আমি কি আর ইচ্ছে করলে বাবার চাকরি করে দিতে পারি ?অবিশ্যি আমিও বুঝতে পারি, বাবার যদি থিয়েটারে চাকরি হয় তবে সব হয়। বাবা যে কি চমৎকার বেহালা বাজান, সেআপনি শোনেননি—কলকাতার থিয়েটারে সে-রকম পেলে লুফে নেয়। যেমনি বাজান, তেমনি গাইতে পারেন।

হেনার হাসি পাচ্ছিল। পাড়াগেঁয়ে একটা বুড়ো এমন বেহালা বাজায় যে তাকে কলকাতার বড় থিয়েটারে লুফে নিয়ে এত টাকা মাইনে দেবে যে তাতে ওদের বাড়ি, গাড়ি, জুড়ি, ঢাক, ঢোল সব হয়ে যাবে ! শোনো কথা ! বাঙাল কি আর গাছে ফলে ?

হেনা চুপ করে ভাবলে। আর বেশি বলা কি উচিত হবে একদিনে ?অনেকদূর সে এগিয়েছে—অনেক কথা বলে ফেলেছে। মাগী কি সত্যিই বোঝে না—না ঢং করছে ?কিন্তু যদি সত্যি ও বুঝতে পেরে থাকে তার কথার মর্ম—তবে আর না বলাই ভালো। ভয় করে বাবা, এখনি ফোঁস্ করে উঠে একটা কাণ্ড বাধিয়ে তুলতে পারে ! বাঙালনীকে বিশ্বাস নেই।

শরৎ বললে, কই বললেন না, আমি ইচ্ছে করলে কি করতে পারি ?

এ কথার জবাবে হেনা খপ্ করে বলে ফেললে, তুমি বুঝতে পারছ না ভাই, সত্যিই আমি কি বলছি ?

এই পর্যন্ত বলেই হেনার হঠাৎ বড় ভয় হল। চোখ বুজে সমুদ্রে ঝাঁপ দেওয়ার দরকার নেই—আপাতত সাহসও নেই তার। কথা সামলে নেবার জন্যে সঙ্গে সঙ্গে একই নিশ্বাসে সে কণ্ঠস্বরকে লঘু ও হাস্য-তরল করে এনে বললে, বুঝলে এবার ?একটু ঠাট্টা করছি তোমায়। তাই কি কখনো হয় ?তুমি আমি বললে কি হবে বলো—এমনি বলছিলাম। চলো নিচে যাই— রাত্রে কি খাবে ?

—কিছু না। আমি কিছু খাইনে রাত্রে।

—বেশ, একটু দুধ একটু মিষ্টি খেতে আপত্তি আছে ?

—আমি কিছুই খাব না, আপনি ব্যস্ত হবেন না।

হেনা মনে মনে বললে, তুমি না খেয়ে মরো না, আমার কি ?এমন একগুঁয়ে বালাই যদি আর কখনো দেখে থাকি ! যা বলবে তাই, 'না' বললে আর 'হাঁ' করাবার জো নেই !

এই সময় নিচের তলায় খুব একটা চেঁচামেচি শোনা গেল। কে জড়িত স্বরে চিৎকার করছে, কে গালাগালি করছে।

শরৎ ভীতমুখে বললে, ওকি ভাই ?কে চেঁচাচ্ছে ?আমাদের বাড়িতে না ?

হেনা পাংশুমুখে বললে, না, ও আমাদের বাড়ি নয়।

হরি সা মদ খেয়ে কমলার ঘরে ঢুকে নিত্যকার মতো উপদ্রব শুরু করেছে। সর্বনাশ !

এই সময় নিচে মারধরের শব্দ শোনা গেল। এও নতুন নয়, হরি সা মদ খেয়ে এসে কমলাকে ঠেঙায় মাঝে মাঝে—পয়সার খাতিরে গায়ের কালশিরে ঢেকে আবার হাসতে হয় কমলাকে। কিন্তু—

শরৎ ব্যস্ত হয়ে বললে, না, দেখুন, আমাদের বাড়িতে নিচের ঘরেই। কমলার ঘরের দিকে মনে হচ্ছে। যান যান, আপনি শিগগির যান—দেখুন—চলুন যাই আমরা। কে হয়তো বদমাইশ ঘরে ঢুকেছে—

চেঁচামেচি বাড়ল। আর রক্ষা হল না। হরি সা গর্দভের মতো চেঁচানি জুড়েছে। হরি সা যে একদিন মাটি করে দেবে সব, হেনা তা জানত। সেই লম্বা কথাওয়ালা গিরীন এই সময় আসুক না দেখা যাক।

কমলার গলার কান্না মেশানো আর্ত সুর শোনা গেল—ও দিদি, তোমরা এসো, আজ আমায় মেরে ফেললে মুখপোড়া—আর পারি নে দিদি—উঃ, আর রক্ষা হয় না।

তবুও অ্যাকট্রেস হেনা মরীয়া হয়ে শেষ চাল চাললে। মুখে দিব্যি শান্ত হাসি এনে বললে, ও আমাদের বাড়ি না, পাশের বাড়ির সেই বুড়ো মাতালটা। ছাদ থেকে মনে হয় যেন আমাদের বাড়ি। রোজই শুনছি। যাবেন না নিচে—জানলা দিয়ে ওদের ঘরটা দেখা যায় কিনা, আমাদের দেখলে আবার গালাগালি করবে। আমি তো এ সময় সিঁড়ি দিয়ে নামি নে—

সাত

ওদিকে কমলার চিৎকার তখনো শোনা যাচ্ছে।

শরৎ বললে, ও তো পষ্ট গঙ্গাজলের গলা—আপনি কি বলছেন ?

তার পর সে নিজে এগিয়ে গিয়ে কমলার ঘরে ঢুকল। গিয়ে যা দেখলে তাতে সে অবাক হয়ে গেল। কমলা মেঝেতে পড়ে কাঁদছে, একটা কালো মোটামতো লোক তক্তপোশের ওপর বসে, তার হাতে একখানা পাখা। পাখার বাঁটের দিকটা উঁচিয়ে বোধ হয় কিছুক্ষণ আগে সে কমলাকে মেরেছে, কারণ পাখাখানা উলটো করে ধরা রয়েছে লোকটার হাতে।

শরৎকে দেখে কমলা দিশাহারাভাবে বললে, আমায় মারছে গঙ্গাজল—আমায় বাঁচাও—

শরৎ কমলার হাত ধরে বললে, তুমি চলে এসো আমার সঙ্গে—

মোটামতো লোকটা গর্জন করে বলে উঠল, ও কোথায় যাবে ?

পরক্ষণেই সে শরতের দিকে ভালো করে চেয়ে, সুর নরম করে ইতরের মতো রসিকতার সুরে বললে, তুমি আবার কে চাঁদ ?

শরৎ সে কথার কোনো উত্তর না দিয়ে কমলার হাত ধরে তাকে ঘরের বাইরে আনতে গেল।

বুড়ো লোকটা বললে, ওকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছ চাঁদ ?ওকে আমার দরকার আছে—তুমি এখানে বসো না একটু—কোন্ ঘরে থাকো ?

পরে কমলার দিকে চেয়ে কড়া সুরে বললে, এই, যাবি নে। বোস বলছি !

শরৎ বললে, আপনি একে মারছেন কেন ?

—আমার ইচ্ছে—তুমি কে হে আমার কাজের কৈফিয়ৎ নিতে এসো ?আমার নাম হরি সা। বউবাজারে আমার দোকানে ছাপ্পান্ন হাজার টাকার জল বিক্রি হয় মাসে—শুধু জল, বুঝলে চাঁদ ! বোতলভরা জল—

শরৎ ততক্ষণে কমলার হাত ধরে ঘরের বাইরে এনেছে। কমলার পিঠের কাপড় তুলে দেখলে, পিঠেও অনেক জায়গায় লম্বা লম্বা মারের দাগ। হেনা কখন এসে নিঃশব্দে ওদের পেছনে দাঁড়িয়েছে। শরৎ তার দিকে চেয়ে বললে, দেখুন ওই কে একজন লোক কি রকম মার মেরেছে—কে ভাই উনি তোমার ?

কমলা চুপ করে রইল, তখন সে নিঃশব্দে কাঁপছে।

এ কথার উত্তর দিলে স্বয়ং হরি সা। কমলার পিছনে পিছনেই সে ঘরের বাইরে এসে বললে—আমি কে ওর ?শুধু ওকে জিজ্ঞেস করো ওর পেছনে কত টাকা খরচ করেছি আমি ! হাড়কাটা গলির দোকানখানাই উড়িয়ে দিয়েছি ওর পেছনে—আমার—আচ্ছা আমি বসছি গিয়ে ঘরের মধ্যে। ও পাঁচ মিনিটের মধ্যে ঘরে আসুক—

শরৎ এতক্ষণও খুব খারাপ কোনো সন্দেহ করেনি। কমলার কোনো গুরুজন হবে এতক্ষণ ভেবেছিল—যদিও লোকটার কথাবার্তার ধরনে সে রাগ করেছিল খুব। কিন্তু এবার তার বুকের মধ্যেটা হঠাৎ ধক্ করে উঠল, এ কোন্ সমাজে সে এসে পড়েছে যেখানে দাদামশায়ের বয়সি বৃদ্ধ নাতনীর বয়সি মেয়ের সম্বন্ধে এ ধরনের কথাবার্তা বলে ! সে কোথায় এসে পড়েছে ?বুড়ো লোকটার সঙ্গে কমলার সম্পর্ক কি ?

প্রভাসের বউদিদিই বা তাকে এত মিথ্যে বলতে গেল কেন ?

সে হেনার দিকে স্থিরদৃষ্টিতে চেয়ে বললে, আপনি জেনেশুনে আমায় কি সব কথা বলছিলেন এতক্ষণ ?আমায় আপনারা কোথায় এনেছেন ?এ সব কি কাণ্ড !

হেনা ঠোঁট উলটে বললে, ন্যাও ন্যাও গো রাইমণি ! অমন সতীপনা অনেককে করতে দেখেছি—প্রথম প্রথম যারা আসে, সবাই অমনি সতী থাকে ! কত দেখলুম, কত হল আমাদের এ চক্ষের সামনে—

শরৎ রাগের সুরে বললে, তার মানে ?কি বলছেন আপনি ?

—যা বলছি তা বলছি, ভেবে দ্যাখো। আর ঢং দেখাতে হবে না তোমাকে। বেরিয়ে এসেছ তো প্রভাসের আর গিরীনের সঙ্গে—কোথায় এসে পড়েছ বুঝতে পারছ না ?তোমার একুল ওকুল দুকুল গিয়েছে। এখন যেখানে এসে উঠেছ সেখানেই থাকো—সুখে থাকবে।তোমার বাবা এখানে নেই—চলে গিয়েছে কাল। তুমি এখানে ওদের সঙ্গে পালিয়ে এসে উঠেছ শুনে—

শরতের মুখ থেকে হঠাৎ সব রক্ত চলে গিয়ে সমস্ত মুখখানা ফ্যাকাশে হয়ে গেল। সে হাঁ করে হেনার মুখের দিকে চেয়ে রইল। মুখ দিয়ে কোনো কথা বার হল না, শুধু তার ঠোঁট দুটো কাঁপতে লাগল।

ওর অবস্থা দেখে হেনার ভয় হল।

বাঙালনীর ঢং দ্যাখো আবার ! ফিট-টিট হবে নাকি রে বাবা ! আঃ, কি ঝঞ্ঝাটেই তাকে ফেলে গেল ওই কথার ঝুড়ি গিরীনটা ! এসে সামলাক্ এখন তাল !

সে কাছে এসে বললে, তা ভাই তুমি তো আর জলে নেই ?ভয় কিসের ?আমি তো বলছিলাম তোমার সব হবে। থাকো না এখানে আমাদের এই বাড়িতে। তোমায় মাথায় করে রেখে দেবে এখন ওরা। মটোর বলো, কালই মটোর হবে। রেডিও হবে, কলের গান হবে—যা আমি বলেছি। আপাদমস্তক জড়োয়া দিয়ে মুড়ে দেবে—ভয় কিসের তোমার ?চাকর-চাকরানীর মাথায় পা দিয়ে বেড়াও, মুখের কথা খসাও, কাল থেকে সব ঠিক করে দেব—কি হবে সেই ধাব্ধাড়া গোবিন্দপুরের জঙ্গলে—

শরৎ এতক্ষণে যেন সম্বিৎ ফিরে পেল। বললে, এমন লোক আপনারা—তা আমি ভাবিনি। মাথার ওপর ভগবান আছেন, আমি জানতাম না, সরল বিশ্বাস করেছিলাম প্রভাসদাদার ওপর। ভাইয়ের মতো দেখতাম। আপনাদের ভেবেছিলাম ভদ্রঘরের মেয়ে। আমার বোকামির শাস্তি যথেষ্ট হয়েছে—

কান্নায় তার কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে গেল।

হেনার মন যে পথকে আশ্রয় করে পোক্ত হয়েছে, সেই পথেরই সংকীর্ণ দৃষ্টি ওর মনুষ্যত্বকে শৃঙ্খলিত করে রেখেছে। পাপের পথে যে মনে মনে ঝানু হয়ে পড়ে, পুণ্যের আলো প্রবেশ করবার বাতায়ন-পথ তার নিজের অজ্ঞাতসারে ধীরে ধীরে রুদ্ধ হয়ে যায়।

হেনার মন গলবার নয়।

সে বললে, কেন কান্নাকাটি করছ ভাই ?প্রথম প্রথম অবিশ্যি একটু কষ্ট হয়—কিন্তু জগতে এসে সুখের মুখ যদি না দেখলে তবে করলে কি ?এখানে দিব্যি সুখে থাকো—পায়ের ওপর পা দিয়ে বসে খাও—সব সয়ে যাবে।

শরৎ বললে, আপনি দয়া করে আর কিছু বলবেন না। আমি গরিব লোকের মেয়ে, বাসন মেজে ভাত রেঁধে কাঠ চ্যালা করে সংসার করে এসেছি এতকাল, এক দিনের জন্যেও ভাবিনি যে কষ্টে আছি। আপনাদের সুখ নিয়ে থাকুন আপনারা—

এই সময় অপ্রত্যাশিত ভাবে দুপ্ দুপ্ করে সিঁড়ি দিয়ে উঠে এল গিরীন।

তাকে দেখে হেনা যেন অকূলে কূল পেয়ে গেল। তার দিকে ফিরে বললে, এই যে ! বাপরে বাপ ! এত ঝক্কি পোয়াবার জন্যে আমি রাজী হইনি, তা বলে দিচ্ছি। ওই নাও, সব খুলে বলেছি— যা বোঝো করো।

গিরীন বললে, কি, ও বলে কি ?

—জিজ্ঞেস করো, তোমার সামনেই তো বিরাজ করছে সশরীরে—

গিরীন শরতের দিকে ফিরে বললে, কি ?বলছ কি তুমি ?তোমার বাবা তোমার কথা সব শুনে পালিয়েছে। এখানে থাকো, পরম সুখে থাকবে—

শরৎ বললে, আপনি আমায় কোনো কথা বলবেন না। আমায় ছেড়ে দিন দয়া করে—আমি গাঁয়ে চলে যাব বাবার কাছে—

গিরীন বুড়ো আঙুল দেখিয়ে বললে, সে গুড়ে বালি ! এতক্ষণ গাঁয়ে রটে গিয়েছে সব।কোথায় দু-দিন দুরাত কাটিয়েছ গাঁয়ের সবাই জেনে গিয়েছে। আর ঘরে জায়গা নেই তোমার— এখন যা বলছি তাতে রাজী হও চাঁদ—

শরৎ হঠাৎ তীব্র পরুষকণ্ঠে বলে উঠল, খবরদার, আমাকে যা তা বলবার কোনো এক্তার নেই আপনার জানবেন—সাবধানে কথা বলুন—

গিরীন কৃত্রিম ভয়ের ভান করে হেনার পেছনে লুকোবার অভিনয় করলে। বললে—ও বাবা, শুলে দেবার না ফাঁসিতে লটকাবার হুকুম হয়ে গেল বুঝি ! তাল সামলাও হেনা বিবি—

শরৎ বললে, সে দিন নেই, আজ আমার বাবা গরিব, আমরা গরিব—নইলে আপনাদের মতো ছোটলোককে শূলে ফাঁসে দেওয়া খুব বেশি কথা ছিল না গড়শিবপুরে—যাক, আমায় যেতে দিন, আমি চলে যাব—

গিরীন বললে, কোথায় যাবে চাঁদ ?সে পথ বন্ধ—আমি তো—

শরৎ বলে উঠল, আবার ওই ইতরের মতো কথা। আমি কোনো কথা শুনবার আগে আপনি আমার সামনে থেকে চলে যান—ভদ্রলোক বলে ভুল করে ঠকেছি—

শরতের কথাবার্তার ভঙ্গির মধ্যে ও কণ্ঠস্বরে এমন কি একটা জিনিস ছিল যাতে গিরীন কুণ্ডু যেন সাময়িকভাবে ভয় পেয়ে চুপ করল।

হেনা ওকে আড়ালে চুপি চুপি বললে, কেন ও বাঙালনীকে রাগাচ্ছ। রাগিয়ে কাজ পাবে না ওর কাছে !

—বাপরে, কেবলই যে ফোঁস ফোঁস করে। আজ ওকে এখানে রাখো—

—আমি পারব না, আমার থিয়েটার আজ—

—তুমি নিয়ে যাও কমলাকে। হরি সাকে আমি নিয়ে ফ্ল্যাটে তালা দিয়ে যাচ্ছি। থাকুক এখানে চাবি দেওয়া আটকানো—

হেনা ফিরে গিয়ে বললে, তোমার কথা হল। বাড়ি যাবে কোথায় ?সেখানে সব রটে গিয়েছে—গাঁয়ে যাবে কোন্ মুখে ?এখানে সুখে থাকবে।

—সে ভাবনা আপনি ভাববেন না। আমার যে দিকে দু-চক্ষু যায় চলে যাব। মা-গঙ্গা তো আছেন শেষ পর্যন্ত। এমন কি করেছি আমি যাতে মা আমায় কোলে স্থান দেবেন না ?

শরতের গলা আবার কান্নার বেগে আটকে গেল। বললে—লোককে বিশ্বাস করে আজ আমার এই দশা—কি করে জানব যে মানুষের পেটে এত থাকে !

হেনা বললে, আচ্ছা, তাই হবে। না হয় মোটরে করে তোমাকে ইস্টিশানে রেখে আসুক—দেখে আসি নীচে—

—সে চলে গেল। কমলাকে গিরীন কি বলতে নিয়ে গেল পাশে। শরৎ খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হেনার ওপরে উঠে আসবার অপেক্ষা করলে। তার পর তার দেরি হচ্ছে দেখে সিঁড়ি দিয়ে নামতে গিয়ে দেখলে বাইরের দরজা বন্ধ। বাইরে থেকে ওরা তালা দিয়েছে।

শরৎ এসে চুপ করে ওপরে অনেকক্ষণ বসে রইল।

বাড়ি নির্জন, নিস্তব্ধ। জলতেষ্টা পেয়েছে বড়, জল আছে কিন্তু এ বাড়িতে সে জলস্পর্শ করবে না, জলতেষ্টায় মরে গেলেও না। প্রভাসদার বাবার কি সত্যিই অসুখ ?হয়তো সব মিথ্যে কথা ওদের। কথাতে কথাতে বিশ্বাস করেই আজ তার এই দশা। প্রভাসও লোক ভালো নয় নিশ্চয়ই।

অনেকক্ষণ কেটে গেল। কেউ আসে না। শরৎ জানলা দিয়ে পাশের বাড়িতে উঁকি মেরে দেখবার চেষ্টা করলে। কোনো লোক দেখা গেল না। দু ঘণ্টা তিন ঘণ্টা কেটে গেল, শরৎ বসে বসে হাপুস নয়নে কাঁদতে লাগল। সম্পূর্ণ অসহায়, কেউ তাকে জানে না, কেউ চেনে না। কি সে এখন করে ?

শেষ পর্যন্ত সে ভাবলে, এও ভালো, দুষ্টু গরুর চেয়ে শূন্য গোয়ালও ভালো। ওরা নাআসুক, সে এখানে না খেয়ে মরবে—মরতে তার ভয় নেই। একবার আশা ছিল বাবার সঙ্গে দেখা করে সব কথা খুলে বলে—কিন্তু বাবার দর্শনলাভ অদৃষ্টে বোধ হয় নেই।

বিকেল হয়ে আসছে। পাশের বাড়ির গায়ে লম্বা ছায়া পড়েছে। শরৎ বসে বসে একটা উপায় ঠিক করলে। সে যেই দেখবে পাশের বাড়ির জানলায় লোক, তাকে সে নিজের অবস্থার কথাজানাবে। তার কথা শুনে দয়া হবে না কি ওদের ? বাড়ির চাবিটা খুলিয়ে দেবে না তারা ?

হঠাৎ সে দেখলে পাশের বাড়ির জানলায় একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে।

সে চেঁচিয়ে বললে, শুনুন, এই যে এদিকে—

মেয়েটি ওর দিকে বিস্ময়ের দৃষ্টিতে চেয়ে বললে, আমায় বলছ—কি ভাই ?

—আমায় এ বাড়িতে আটকে রেখেছে। আমি পাড়াগাঁ থেকে এসেছি—আমায় দোরটা খুলে দিন—দয়া করুন আমার ওপর।

—এ তো হেনা দিদির বাড়ি, হেনা নেই ?

—হেনা কে জানি নে। তবে কেউ এখন এ-বাড়িতে নেই। আমায় তালা দিয়ে বন্ধ করে রেখে চলে গিয়েছে—

—তোমার বাড়ি কোথায় ?

—অনেক দূরে। গড়শিবপুর বলে একটা গাঁ—যশোর জেলা—

—এখানে কার সঙ্গে এসেছ ?

—প্রভাস আর অরুণ বলে দুজন লোক—আমাদের গাঁয়ের—

মেয়েটি মুচকি হেসে বললে, তার পর ঝগড়া হয়েছে বুঝি ?থাকো ভাই, থাকো ! এসেছো যখন, তখন যাবে কোথায় ?

শরৎ ব্যগ্রস্বরে বললে, না না—আপনি বুঝতে পারছেন না। ওরা আমায় ঠকিয়ে এনেছে, আমি ভদ্রলোকের মেয়ে। আমার সব কথা শুনুন—

মেয়েটি ঠোঁট উলটে বললে, সবাই বলে ঠকিয়ে এনেছে ! তবে এসেছিলে কেন ?ওসব আমি কিছু করতে পারব না—কে হ্যাঙ্গামা পোয়াতে যাবে বাপু তোমার জন্যে ?যারা এনেছে, তাদের কাছে বোঝাপড়া করো গে—

কথা শেষ করে মেয়েটি জানলা থেকে সরে গেল। শরৎ জানত না যে এ পাড়ায় আশপাশের বাড়িতে যেসব স্ত্রীলোক বাস করে, তারা কেউ ভদ্রঘরের নয়, মনে, চরিত্রে, পেশায় তারা হেনারই সগোত্র। এদের কাছ থেকে সাহায্য ভিক্ষা নিষ্ফল।

কিছুক্ষণ কেটে গেল। বিকেল বেশ ঘনিয়ে এসেছে, এমন সময় সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শুনে শরৎ তাড়াতাড়ি ছুটে বাইরের বারান্দায় এসে দেখতে গেল। সিঁড়ি দিয়ে উঠে আসছে একা কমলা। ওর পেছনে কেউ নেই। ওকে দেখে কমলা হাসিমুখে বললে—কি ভাই গঙ্গাজল ?

তার পর তাড়াতাড়ি দু-তিনটে সিঁড়ি একলাফে ডিঙিয়ে এসে শরতের গলা জড়িয়ে ধরে বললে, গঙ্গাজল—কি কষ্ট ওরা তোমাকে দিলে ! কোনো ভয় নেই ভাই, আমি যখন এসে গিয়েছি। তুমি পালাও—আমি লুকিয়ে দেখতে এসেছিলাম তোমার কি দশা হচ্ছে—হয়তো এতক্ষণে একটা উপায় হয়েছে ভেবেছিলাম। তুমি চলে যাও—আমার কাছে এ বাড়ির একটা চাবি থাকে তাই রক্ষে।

এতক্ষণ শরৎ কথা বলবার অবকাশ পায়নি, এত তাড়াতাড়ি সব ব্যাপারটা ঘটল !

সে এইবার বললে, ভগবান আছেন গঙ্গাজল, তাই তোমায় পাঠিয়ে দিয়েছেন ভাই—

—আমার তো আর কেউ ছিল না—

কমলা বললে, তুমি ভাই তাড়াতাড়ি নেমে চলো, জিনিসপত্র কিছু এনেছিলে—সুটকেস কি পুঁটুলি নেই ?এসো নেমে, গিরীনরা এসে পড়তে পারে। আমায় দেখলে গোলমাল করবে। হেনাদি থিয়েটারে গিয়েছে—সে আজ এখুনি আসবে না।

শরৎ ওর সঙ্গে ফুটপাথে এসে দাঁড়াল।

কমলা বললে, ভাই, তুমি এখন কোথায় যাবে ?

—যেদিকে দু চোখ যায়—ভগবান আমার হাত ধরে যে পথে নিয়ে যাবেন। আমাদের গড়ের ভাঙা দেউলে সন্দে পিদিম দিয়েছি জ্ঞান হয়ে পর্যন্ত—তিনি পথ দেখিয়ে দেবেন আমায়। পথ না হয়, মা-গঙ্গা আর কোল থেকে ঠেলে ফেলবে না।

কমলার চোখ জলে ভরে উঠল। সে বললে, আমরা নরকের কীট ভাই, তোমার মত মেয়ের পায়ের ধুলো পড়ে আমাদের পাপের বাসা পবিত্র হয়ে গেল। একটু সাবধানে থেকো, তোমার রূপ যে কি তুমি নিজে জানো না। আমাদের মাথা ঘুরে যায়—পুরুষের দোষ কি দেব ?তার পর সে আঁচল খুলে পাঁচটা টাকা নিয়ে শরতের হাতে দিয়ে বললে—এই টাকা কটা সঙ্গে রাখো দিদি। দরকার হবে, ছোট বোনের কাছ থেকে নিতে লজ্জা নেই। সুসময় আসে, অনেক রকমের শোধ দিতে পারবে।

শরৎ বললে, তুমিও কেন চলো না আমার সঙ্গে ?এই কষ্ট সহ্য করে মার খেয়ে কেন এখানে পড়ে থাকো ?চলো দুই বোনে পথে বেরুই ভগবানের নাম করে। তিনি নিরুপায়ের উপায়, একটা কিছু করে দেবেনই তিনি—

কমলা বিষণ্ণ মুখে বলল—না দিদি, আমার তা হবার নয়। আমার মা এখানে—মার বয়েস হয়েছে—তাঁকে ফেলে যেতে পারব না। তা ছাড়া আরো অনেক কাল এই পথের পথিক-এক পুরুষে নয়, অনেক পুরুষে। আমাদের উদ্ধার নেই—আমি যাব বললেই যাওয়া হবে না।বাঁচি মরি এখানে থাকতে হবে। গোবরের গাদাতে জন্মেছি, গোবরের গাদাতেই মরতে হবে।

শরৎ কমলার চিবুক ধরে আদর করে বললে, না ভাই, গোবরের গাদায় তুমি পদ্মফুল—

কমলা অশ্রুসজল চোখে মাথা নিচু করে বললে, একটু পায়ের ধুলো দাও দিদি। ছোট বোন বলে মনে রেখো যেখানে থাকো—আমার আর দেরি করবার জো নেই—

কমলা বিদায় নিয়ে দ্রুতপদে চলে গেল।

কমলা চলে গেলে শরৎ বড় একা মনে করল নিজেকে। এতক্ষণ তবুও একটা অবলম্বন ছিল, তাও গেল। এখন থেকে সে সম্পূর্ণ একা, নিঃসহায়। কখনো এমন অবস্থায় পড়েনি জীবনে। কোথায় সে এখন যায় ?বেলা পড়ে এসেছে—এই বিশাল অপরিচিত শহর সামনে। সুনির্দিষ্ট পথে চিন্তাধারাকে চালিত করবার শিক্ষা ওর নেই—যারা এ বিষয়ে আনাড়ি, তাদের চিন্তা যেমন খাপছাড়া ধরনের, ওর বেলাতে তার ব্যতিক্রম হল না। শরৎ

ভাবলে—কালীঘাটে গিয়ে গঙ্গাস্নান করে শুদ্ধ হই—যা কিছু পাপ, যদি ঘটে থাকে কিছু, গঙ্গায় ডুব দিয়ে কেটে যাবে এখন—

একটা ঘোড়ার গাড়ি যাচ্ছিল পাশ দিয়ে। গাড়োয়ান এ পাড়াতেই থাকে, এ পাড়ার স্ত্রীলোকদের সে চেনে—সওয়ারি খুঁজবার চেষ্টায় বললে, গাড়ি চাই ?

শরৎ যেন অকূলে কূল পেলে। গাড়ি ডেকে নিজে চড়তে পারতো না—কি করে গাড়ি ডাকতে হয়, কি বলতে হয়, এসবে সে অনভ্যস্ত। সে বললে, আমায় কালীঘাটে নিয়ে যাবে ?

—কেন যাব না বিবিজান ?চলো—

—কত ভাড়া দিতে হবে ?

—তিন টাকা দিয়োতোমাদের এ পাড়ার ভাড়া তো বাঁধাই আছে। ওই খেঁদি বিবি যায়, বড় পারুল বিবি সেদিন গেল—তিন টাকা দিলে। আমি যাস্তি লেব না।

শরৎ দরদস্তুর করতে জানে না। দু টাকার জায়গায় তিন টাকা ভাড়ায় সওয়ারি পেয়ে গাড়োয়ান মনের আনন্দে গাড়ি ছুটিয়ে দিলে। গড়ের মাঠ দিয়ে যখন গাড়ি চলেছে, তখন শরতের মনে হল একটা বিশাল জনস্রোতের মধ্যে সে-ও একজন। প্রকাণ্ড মাঠটার মধ্যে দিয়ে কত রাস্তা, কত গাড়ি ঘোড়া, ট্রাম গাড়ি, লোকজন ছুটেছে, চলেছে—দূরে গঙ্গাবক্ষে বড় বড় জাহাজের মাস্তুল দেখা যাচ্ছে। সকলের ওপর উপুড় হওয়া নীল আকাশের কতটা দেখা যাচ্ছে, মুচকুন্দ চাঁপাগাছেরসারির নিচে সাহেবদের ছেলেমেয়েদের ঠেলে নিয়ে বেড়াচ্ছে ছোট ছোট ঠ্যালাগাড়িতে—জীবনটা ছোট নয়, সংকীর্ণ নয়—এত বড় জগতে যদি সবাই বেঁচে থাকে নিজের নিজের পথে—সে-ও থাকবে। ভগবান তাকে পথ দেখিয়ে দেবেন।

গাড়িতে বসে গতির বেগে মন যখন পুলকিত, তখন অনেক কথা এমন অল্প সময়ের জন্যে মাথায় আসে, শরীরের জড়তার সুদীর্ঘ অবসরে নিষ্প্রভ ও অলস মন যা কখনো কল্পনা করতেপারে না।

এই অল্প সময়টুকুর মধ্যেই শরৎ অনেক কথা ভেবে ঠিক করলে। সে আর গড়শিবপুরে ফিরবে না।

বাবা সেখানে গিয়ে আছেন, হয়তো তিনি গিয়ে বলেছেন মেয়ে তাঁর মারা গিয়েছে। সে গেলেই গ্রামে কলঙ্ক রটবে। সে কলঙ্কের হাত থেকে বাবাকে সে রক্ষা করবে।

কোথায় সে যাবে ?তা সে জানে না আজ, যদি কখনো কারো অনিষ্ট চিন্তা না করে থাকে জীবনে, কখনো অন্যায় না করে থাকে—তবে সে-সবের জোর নেই জীবনে ?

কালীঘাটে পৌঁছে সে গঙ্গায় ডুব দিলে, তার পর আর কোথাও যাওয়া নিরাপদ নয় ভেবে সে কালী-মন্দিরের সামনে চুপ করে বসে রইল।

সন্ধ্যার আরতি আরম্ভ হল। কত মেয়ে সাজগোজ করে আরতি দেখতে এল। তার মধ্যে ও চুপ করে বসে বসে সকলের দিকে চেয়ে দেখলে। কত বৃদ্ধা এসে দোরের কাছে ওর পাশে বসল। রাত্রি বেশি হল। ও ভাবলে কোথায় যাবে এখন। কোনো জায়গা নেই যাবার। এত বড় বিশাল শহরে অসহায় তরুণী নারীর পক্ষে নিরাপদ স্থান কোথায় এই দেবমন্দির ছাড়া। সুতরাং সে বসেই রইল। বসে বসে মনে পড়ল বাবার কথা। গড়শিবপুরের জঙ্গল-ঘেরা বাড়িতে বাবাকে একা হয়তো এতক্ষণ হাত পুড়িয়ে বেঁধে খেতে হচ্ছে। আনাড়ি মানুষ, কোনো দিন জীবনে কুটোটা ভেঙে দুখানা করার অভ্যেস নেই, বেহালা বাজিয়ে আর গান গেয়েই নিশ্চিন্তে দিনগুলো কাটিয়ে এসেছেন। বাবা—শরৎ তার গায়ে আঁচটুকুও লাগতে দেয়নি। আজ সে থেকেও নেই। বাবার কি কষ্টই হচ্ছে ! তার কথা মনে ভেবে বাবার কি শান্তি আছে ?

শরতের চোখে জল এল। বাবার কথা মনে পড়লে মন হু-হু করে। সে কিছুতেই চুপ করতে পারে না, ইচ্ছে হয় সে এখুনি ছুটে চলে যায় সেই গড়শিবপুরের ভাঙা বাড়িতে, বড় কাঁঠালকাঠের পিঁড়িখানা বাবাকে

পেতে দেয় রান্নাঘরের কোণে—একটা চটা-ওঠা কলাইকরা পেয়ালায় বাবাকে চা করে দিয়ে ছোট্ট খুকির মতো বাবার মুখের দিকে চেয়ে বসে বসে গল্প শোনে।

মন্দিরের সামনে নাটমন্দিরে একজন সন্ন্যাসিনী ধুনি জ্বালিয়ে বসে আছে—ওর নজরে পড়ল। তার চারিপাশ ঘিরে অনেক মেয়েছেলে জড়ো হয়ে কেউ হাত দেখাচ্ছে, কেউ ওষুধ নিচ্ছে, কেউ শুধু বা কথা শুনছে। শরৎ সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে এই দেবমন্দিরের পবিত্রতা অনুভব করতে চাইছিল—যে ঘরে সে আজ দুদিন কাটিয়ে এসেছে তার সমস্ত গ্লানি, অপবিত্রতা, পাপ—এই দেবায়তনের ধূপধুনার সৌরভে, শঙ্খঘণ্টার ধ্বনিতে, সমবেত ভক্তমণ্ডলীর প্রাণের নিবিড় আগ্রহে যেন ধুয়ে যায়, মুছে যায়, শুভ্র হয়ে ওঠে, নির্মল হয়ে ওঠে। কালীঘাটের মন্দিরের সেবকদের লোভ যেখানে উগ্র, পূজার্থীদের অর্থ শোষণ করবার হীন আকাঙ্ক্ষা সব ছাপিয়ে যেখানে প্রবল হয়ে উঠেছে—পূজার মধ্যে ব্যবসা এসে ঢুকেছে, বৈষয়িকতা এসে ঢুকেছে—সে সব দিক পল্লীবাসিনী শরতের জানা নেই। তার মুগ্ধ মনের ভক্তি ওর চোখে যে অঞ্জন মাখিয়েছে, তার সাহায্যে প্রাচীন ভারতের সংস্কারপূত বাহান্ন পীঠের এক মহাপীঠস্থান জাগ্রত হয়ে উঠেছে ওর মনে, বুদ্ধদেবের সেই অমর বাণী 'মনই জগৎকে সৃষ্টি করে'—শরতের মনে মহারুদ্রের চক্রছিন্ন দক্ষকন্যা সতীর দেহাংশ সতী নারীর তেজ ও পাতিব্রত্যের প্রতীক স্বরূপ এখানকার মাটিতে আশ্রয় নিয়েছে। এই মাটি তার মনে তেজ ও বল দিক। সন্ন্যাসিনীর সামনে বসে সারারাত কাটিয়ে দিলে সে। কিছু কিছু কথাও হল সন্ন্যাসিনীর সঙ্গে। সামান্য কিছু ফলমূল কিনে ক্ষুণ্ণিবৃত্তি করলে।

সন্ন্যাসিনী বললে, বাড়ি কোথায় তোমার ?

—গড়শিবপুরে।

—এখানে কোথায় থাকো ?

—কোথাও না । মন্দিরেই আছি এখন। আশ্রয় নেই কোথাও।

—তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে তুমি বড়ঘরের মেয়ে। কে আছে তোমার ?কি করে এখানে এলে মা ?একটা কথা জিজ্ঞেস করি কিছু মনে কোরো না— কারো সঙ্গে—মানে কেউ ভুলিয়ে নিয়ে এসেছিল ?

কিন্তু একথা জিজ্ঞাসা করার সঙ্গে সঙ্গেই শরতের সরল, তেজোদৃপ্ত মুখের সুকুমার রেখার দিকে, তার ডাগর, কালো, নিষ্পাপ চোখ দুটির দিকে চেয়ে সন্ন্যাসিনী এ প্রশ্ন করার জন্যে নিজেইলজ্জিত হয়ে পড়ল।

শরৎ মুখ নিচু করে বললে, না মা, ও সব নয়। তবে সব তো বোঝেন, মেয়েমানুষের অনেক শত্রু—বিশেষ করে মা, যে সকলকে বিশ্বাস করে তার শত্রু এখন দেখছি চারিদিকেই। ভুলিয়েই এনেছিল বটে মা—তবে আমি ভুলে আসিনি, বুঝলেন মা ?

—তোমার বয়েস কত মা ?

—সাতাশ বছর।

—কিন্তু তোমার রূপ এই বয়েসে যা আছে, তা কুড়ি বছরের যুবতীরও থাকে না—তোমার বড় বিপদ এই কলকাতা শহরে। আমার এখানে থাকো—কোথাও গেলে তোমার বিপদ ঘটতে দেরি হবে না মা।

শরতের চোখ ছাপিয়ে জল গড়িয়ে পড়ল। এই তো মা সতীরানী তাকে আশ্রয় দিয়েছেন। ঠাকুর-দেবতার মাহাত্ম্য কলিকালে তবে নাকি নেই ?বাবা তো নাস্তিক, সন্দে-আহ্নিকটা পর্যন্ত করবেন না। সে কত বকুনির পর জোর করে আসন পেতে বাবাকে আহ্নিকে বসাত। বাবার কথা মনে পড়তে শরতের চোখের জল আর থামে না। বাবা কি আর সন্দে-আহ্নিক করছেন ?উত্তর দেউলে এই সন্ধ্যায় বাদুড়নখীর জঙ্গল ঠেলে কে সন্দে-পিদিম দিচ্ছে আজকাল ?কেউ না।

বহুদূর থেকে সে দেখতে পায়, দেবীমূর্তির পায়ের চিহ্ন বনে-জঙ্গলে নির্দেশহীন কালো নিশীথ রাত্রে এখনো অমনি পড়ে যাচ্ছে, ভয়ে শিউরে উঠে কুটিরের ঘরে অর্গলবদ্ধ করবার জন্যে সে আর সেখানে নেই। রাজলক্ষ্মী ?সে কি আছে—সে আর সেখানে আসে না। কেনই বা আসবে ?

শরৎ সেখানেই রইল সেদিনটা। সন্ধ্যার পরে অনেকগুলি মেয়ে আসে—রোজ শাস্ত্রকথা হয়। শরৎ বড় ভালোবাসে শাস্ত্রকথা শুনতে, একদিন নকুলেশ্বরের মন্দিরে কথকতা হল। আরো কয়েকটি মেয়ের সঙ্গে সেখানে শরৎ গেল। কথকতার পর প্রসাদ বিতরণের পালা। সকলের সঙ্গে শরৎও শালপাতা পেতে বাতাসা, শসা, ছোলা ভিজে, ফলমূল নিয়ে এল। সন্ন্যাসিনী ব্রাহ্মণের মেয়ে—তিনি স্বপাক ভিন্ন খান না, নিজে রান্না করেন, শরৎকে শালপাতে ভাত বেড়ে দেন। সারাদিন খাওয়া হয়—সন্ধ্যার পর রান্না চড়ে।

তিন-চার দিন পরে একটি বড়লোকের গৃহিণী এলেন সন্ন্যাসিনীর কাছে। স্নানের ঘাটে যেতে শরৎকে সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন দুপুরে। বোধ হয় সন্ন্যাসিনীর সঙ্গে তাঁর কিছু কথা হয়ে থাকবে শরতের সম্বন্ধে। বললেন—তোমাকে দেখে আমার বড় ভালো লেগেছে। তোমার নাম কি ?

—শরৎসুন্দরী।

—কতদিন সন্ন্যাসিনীর কাছে আছ ?

—বেশি দিন না।

—আমাদের সঙ্গে যাবে ?

—কোথায় মা ?

—আমরা বেরিয়েছি কাশী, গয়া করব বলে। মুখে বলতে নেই—এখন হবে কিনা তা জানিনে। ইচ্ছে তো আছে। আমার বড় মেয়ের বিয়ে হয়েছে লক্ষ্ণৌ। সেখানে গিয়ে একবার মেয়ের সঙ্গে দেখা করব। আমি যাচ্ছি আর আমার দুই মেয়ে, ছোট ছেলে আর কর্তা। একটা লোক আমাদের দরকার। বয়েস হয়েছে—একা ভরসা করি নে সব ঝক্কি নিতে বিদেশে। তুমি চলো না কেন আমার সঙ্গে ?মাইনে-টাইনে সব ঠিক করে দেব এখন—কোনো অসুবিধে হবে না। গৌরী-মা বলেছিলেন তোমার কথা। কথা কি জানো, যে সে মেয়ে নিতে ভরসা হয় না। স্বভাব-চরিত্তির কার কি রকম না জেনে বাপু নেওয়া তো যায় না। গৌরী-মা যখন তোমার সম্বন্ধে বললেন—তখন আমার নিতে কোনো আপত্তি নেই।

মহিলাটির প্রস্তাব ভালোই—তবুও শরৎ বলল, ভেবে দেখি মা—আপনাকে আমি বলব এখন সন্দেবেলা। গৌরী-মার কথকতা আপনি আসবেন তো শুনতে সন্দেবেলা ?

তার পর মন্দিরে ফিরে এল ওরা স্নান সেরে।

গিন্নি বললেন, আমি এখন যাচ্ছি মনোহরপুকুর রোডে আমার মেজ জামাইয়ের বাড়ি। নাতির অসুখ, তাকে গৌরী-মার কাছে নিয়ে এসে মাদুলী ধারণ করাব। জামাই খ্রিস্টান মানুষ, ওসব মানে না। মেয়েকে বলে রেখেছি জামাই আপিসে বেরুলে নাতিকে মোটরে নিয়ে আসব। যাবেআমার সঙ্গে ?

শরতের যাবার কৌতূহল হল। ভাড়াটে গাড়ি করে ওরা অনেক রাস্তা গলি পার হয়ে একটা ছোট দোতলা বাড়ির সামনে এসে নামলে। শরৎ আশ্চর্য হয়ে ভাবলে, কলকাতার বড় লোক, দেখি ওদের বাড়ি-ঘর কি রকম—

প্রথমে এগারো বারো বছরের একটি মেয়ে নেমে এসে দোর খুলেই চেঁচিয়ে বলে উঠল—ও মা, কে এসেছে দ্যাখো—

একটি সুন্দরী মেয়ে ওপর থেকে নেমে এসে গিন্নির গলা জড়িয়ে ধরে বলল, মা কবে এলে ?কখন এলে ?চিঠি তো লিখলে না আজ আসছ ?এ কে মা ?

—ওকে নিয়ে এলাম। আমাদের সঙ্গে যাবে। গৌরী-মার কাছে এসেছে—সেখানে থাকে। পাড়াগাঁয়ে বাড়ি—কোন্ জায়গায় গো ?

শরৎ বলল—যশোর জেলায় গড়শিবপুরে।

মেয়েটি বলল, এসো ওপরে এসো।

ওপরের ঘর বেশ চমৎকার সাজানো। শরৎ চেয়ে চেয়ে দেখলে। বড় বড় গদি-আঁটা চেয়ার, মেঝের উপর বড় বড় শতরঞ্জির মতো আসন পাতা। তার ওপর দিয়ে মাড়িয়ে চলে যাচ্ছে সবাই, তবে আসন পাতা কেন ?এক কোণে একটি ছোট পাথরের মূর্তি, মেয়েটি বলল, তার শ্বশুরের চেহারা। বড় ডাক্তার ছিলেন, আজ ছ-বছর মারা গিয়েছেন। ফুলদানিতে বড় বড় রজনীগন্ধার ঝাড়। রান্নাঘরের মধ্যে কল, রান্না করতে করতে কল টিপলেই জল, ভারি সুবিধে। ছ-সাতটা বড় কাঠের আলমারি-ভর্তি মোটা বই। সেগুলো দেখিয়ে মেয়েটি বলল, শ্বশুর ডাক্তার ছিলেন বড়, নাম করতে পারি নে। তাঁর ডাক্তারি বই এগুলো—আরো সাত আলমারি বোঝাই বই আছে, নিচের ঘরে— শ্বশুরের শোবার ঘরে।

মেয়েটি শরৎকে কিছু মিষ্টি ও ফল খেতে দিলে।

তার পর গিন্নি মেয়ে ও নাতির সঙ্গে তাদের বড় মোটরে আবার এলেন কালীমন্দিরে। বেলা প্রায় তিনটে। শরৎ বলল, মা, আমি গঙ্গায় একটা ডুব দিয়ে আসি, বড্ড গরম—

আসল কথা গরম নয়। গঙ্গাহীন দেশের মেয়ে শরৎ, গঙ্গাকে কাছে পেয়ে সর্বদা ডুব দিয়ে পুণ্য সঞ্চয়ের লোভ দমন করতে পারে না। কিন্তু স্নান করে উঠে আসবার সময় শরৎ মহা বিপদের সামনে পড়ে গেল। স্নান করে উঠে কৃষ্ণকালী লেনের মুখে এসেছে, বাঁ দিকেই মনসাতলা ও কৃষ্ণকালীর মন্দিরে একবার দর্শন করে আসবে—হঠাৎ দেখলে তার ঠিক সামনে দাঁড়িয়ে গিরীন, প্রভাস ও আরো দুটো অজানা লোক। তারা চারিদিকে কি যেন খুঁজছে।

ওর সঙ্গে গিরীনের একেবারে চোখাচোখি হয়ে গেল। গিরীন আঙুল দিয়ে তার সঙ্গীদের ওর দিকে দেখিয়ে বলল—এই যে ! তার পর সবাই মিলে এসে ওকে ঘিরে ধরল। গিরীন বলল, তারপর ?রাগ করে ঝগড়া করে পালিয়ে এসে এখানে আছ ?চলো বাড়ি চলো—

সঙ্গীদের দিকে চেয়ে বলল, কেমন বলেছি কি না যে ঠিক কালীঘাটে খুঁজলেই পাওয়া যাবে। আজীর গাড়োয়ান দেখ ঠিক সন্ধান দিয়েছিল। বাবা, এ সব ডিটেকটিভগিরি কি তোমাদের কম্মো ?

প্রভাস বলল, চলো শরৎ দিদি, ফিরে চলো—রাগ কেন ?আর রাগ করে বাড়ি ছেড়ে চলে আসতে হয় ?

ওদের কথাবার্তার সুরে এমন একটা সহজ ভাব নিয়ে এসে ফেলেছে যেন শরৎ ওদের বহুদিনের ন্যায্য অভিভাবকত্ব থেকে বঞ্চিত করে নিজের একগুঁয়েমি এবং বদমেজাজের দরুন নিজে চলে এসেছে। ওরা যথেষ্ট উদারতা দেখিয়ে আবার ফিরিয়ে নিতে এসেছে।

গিরীন বলল, নাও হয়েছে, কোথায় বাসা নিয়েছ চল দেখি—জিনিসপত্র কিছু আছে-টাছে ?প্রভাস একখানা গাড়ি ডেকে আনো—এসো।

শরৎ হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল, এতক্ষণে যেন সম্বিৎ ফিরে পেয়ে বলল, আপনি আবার এসেছেন এখান পর্যন্ত ?কেন এসেছেন, আমি আপনাদের সঙ্গে যাবই বা কেন ?আপনাদের সাহস তো খুব।

প্রভাসের দিকে চেয়ে বলল, আর প্রভাসদা, আপনাকে মায়ের পেটের ভাইয়ের মতো জ্ঞান করতাম—তার সাজা খুব দিয়েছেন ! এত খারাপ হয় লোকে তা আমি বুঝিনি ! বাবা কোথায় ?বাবার খবর কিছু আছে ?

গিরীন ওদের দিকে সাট করে চোখ টিপে বলল—আরে আছেই তো। তিনি তো কাল থেকে এসে আমাদের ওখানে প্রভাসদের বাড়ি বসে। সেই জন্যেই নিতে আসা—চলো।

শরৎ বলল, মিথ্যে কথা। বাবা কখনো আসেননি। হ্যাঁ প্রভাসদা, সত্যি ?বাবা এসেছেন সত্যি বলুন—

প্রভাস বলল, মিথ্যে বলে লাভ ?এসো দেখবে চলো।গাড়ি আনি।

—গাড়ি আনতে হবে না প্রভাসদা। বাবা কখনো আসেননি। এলে আপনাদের সঙ্গে এখানে আসতেন।

—আমাদের কথা বিশ্বাস হল না ?যাবে কিনা তাই বলো ?

কলকাতা শহরের রাস্তা—একটি তরুণী মেয়েকে ঘিরে তিন-চারজন লোককে কথা-কাটাকাটি করতে দেখে দু-একজন লোক জমতে শুরু করল। একজন ছোকরা এগিয়ে এসে বলল, কি হয়েছে মশাই ?

গিরীন কুণ্ডু ঈষৎ সলজ্জ সুরে বলল, ও আমাদের ঘরোয়া ব্যাপার মশাই। আপনারা যান।

আর একজন বলল, ইনি কে ?কি বলছেন ?আপনারা নিয়ে যেতে চাইছেন কোথায় ?

প্রভাস বলল, উনি আমাদের লোক—

গিরীন বলল, মশাই আপনারা ভদ্দরলোক, চলে যান। আমাদের নিজেদের মধ্যে ঝগড়া হয়েছে—সে-সব কথা শুনে আপনাদের লাভ কি ?আমাদের মেয়েমানুষ ঝগড়া হয়ে রাগ করে চলে এসেছে, তাই নিয়ে যেতে এসেছি।

কে একজন বাইরে থেকে বলে উঠল—ওহে চলে এসো না—ওসবের মধ্যে থাকবার দরকার নেই, ও বুঝতে পেরেছি। এসব জায়গায় ওরকম কত কাণ্ড নিত্যি ঘটছে।

শরৎ অবাক, স্তম্ভিত। এমন সহজভাবে এমন নির্লজ্জ মিথ্যা কথা কেউ যে বলতে পারে তা তার ধারণার বাইরে। সে এর প্রতিবাদ করতেও পারলে না, প্রকাশ্য রাজপথে অপরিচিত পুরুষ-বেষ্টিতা অবস্থায় কথা-কাটাকাটি করা, চিৎকার করে ঝগড়া করা তার ঘটে লেখা নেই, তার স্বভাবজ শোভনতা-বোধ মুখে যেন হাত চাপা দেয়। সে মরে যাবে তবুও পথে দাঁড়িয়ে ইতরের মতো ঝগড়া করতে পারবে না।

লোকজন চলে যেতে শুরু করলে। শরৎ এগিয়ে যেতে চাইল, গিরীন কুণ্ডু এসে পথ আগলে দাঁড়িয়ে বলল, নাও চলো—খুব ঢলান ঢলালে রাস্তায় দাঁড়িয়ে, এতগুলো ভদ্দরলোক জুটিয়ে ফেললে চারিদিকে—এখন ফিরে চলো আমাদের সঙ্গে—রাগ অভিমান করে কি পালিয়ে এলে চলে চাঁদ ?

গিরীন যেন রাস্তার লোককে শুনিয়ে শুনিয়ে এ কথাগুলো চেঁচিয়েই বলল।

শরতের হঠাৎ বড় রাগ হল, গিরীনের মিথ্যা কথায়, ধূর্তামি ও শেষের কথার ইতর সম্বোধনে।

সে বলল, আবার ওই কথা মুখে ?আপনার সাধ্য নেই এখান থেকে আমায় নিয়ে যান। আমি এখানে চলে এলাম—এখানেও আপনারা এলেন ?পথ ছেড়ে দিন বলছি—

শরৎ তখনই মনে ভেবে দেখলে ওই দল যদি তার সঙ্গে যায় বা যে মহিলাটির আশ্রয় সে পেয়েছে তারা যদি এখন এখানে এসে পড়ে, তবে এদের সাজানো মিথ্যে কথায় তাদের মনে সন্দেহ জাগবে এবং তারা তাকে কুচরিত্রা ভেবে তখনই পরিত্যাগ করে চলে যাবে। তা হলে সে একেবারে অসহায়—এই সব শুনলে গৌরী-মা কি তাকে জায়গা দেবেন আর ?

যাক্, যদি কেউ আশ্রয় না দেয়, গঙ্গা তো কেউ কেড়ে নেবে না ?

গিরীন আবার বলল, দাঁড়াও এখানে গাড়ি ডাকি—মিছে রাগ করে কি হবে বলো !

সুর নিচু ও নরম করে বলল, চলো—কেন মিথ্যে পথে পথে ঘুরে কষ্ট পাও ! এখানে আছ কোথায় বলো তো ?খুব সুখে থাকবে। আমাদের সব ঠিক হয়ে গিয়েছে। প্রভাস মাসে পঞ্চাশ টাকা দেবে—আমি আর অরুণ পঞ্চাশ। আলাদা বাড়িভাড়া করে থাকতে চাও পাবে, হেনার বাড়িতেও থাকতে পারো। নেক্লেস আর চুড়ি সামনের হপ্তাতেই পাবে। ঘর সাজিয়ে দেব দুশো টাকা খরচ করে। কলের গান কিনে দেব। পায়ের ওপর পা দিয়ে বসে থাকবে, যা যখন হুকুম করো ইচ্ছামতো—

শরৎ ঝাঁঝের সঙ্গে বলল, আবার ওই সব কথা ?চলে যান আপনারা ! আপনাদের দেখলেও পাপ হয়। আমি এই পথে বসে থাকব, মা কালী আমায় আশ্রয় দেবেন—

গিরীন জানতো রাস্তার ওপর কোনো জোর করতে গেলেই লোক ছুটে হই-চই বাধিয়ে দেবে, পুলিশ আসবে—সব পণ্ড হবে। মিষ্টি কথায় কাজ হাসিল হল না দেখে সে ভয় দেখাতে আরম্ভ করল। চোখ রাঙিয়ে বললে, সহজে না যাও—জানো আমি কি করতে পারি ?আমার নাম গিরীন কুণ্ডু—থানায় এজাহার করব তুমি হেনা বিবির হার চুরি করে এনেছ ! এক্ষুনি চালান দিয়ে দেব, জানো ?হেনা সাক্ষী দেবে—আজ রাতেই হাজতে বাস করতে হবে। ও বাঙালির বাঙালগিরি কি করে ঘোচাতে হয়, সে আমি জানি—তুমি এখানে আছ কোথায় শুনি ?

শরৎ বলল, বেশ তাই করুন। ভগবান জানেন আমি কোনো অপরাধ করিনি। এখনো চন্দ্র সূর্যি উঠছে—আমি জীবনে পরের কুটোগাছটাতে কখনো হাত দিইনি। তিনি কখনো আমায় মিছিমিছি শাস্তি—

হঠাৎ নিজের অসহায় অবস্থা কল্পনা করে এবং ভগবানের উপর নির্ভরতার অনুভূতিতে শরতের চোখে জল এসে পড়ল—সে কেঁদে ফেলল।

ক্রন্দনরতা মেয়ে পথের ওপর, তখনই কৌতূহলী জনতা জমতে আরম্ভ করল আবার।

একজন যণ্ডা গোছের তোয়ালে-কাঁধে লোক এগিয়ে এসে বললে, কি হয়েছে ?কে আপনি ?উনি কাঁদছেন কেন মশাই ?

ভিড়েরই একজন বলল, তা কি জানি ?আপনার সঙ্গে কে আছেন মা ?হয়েছে কি ?

আর একজন বলল, আপনি কোথায় যাবেন ?কি হয়েছে আপনার বলুন তো মা ?।

এরা গিরীনের দলকে ঠাওর করতে পারেনি—সুতরাং তাদের সঙ্গে জনতার কথা বিনিময় হল না। জনতার সুর ক্রমশ উত্তেজিত ও কৌতূহলী হয়ে উঠতে দেখে গিরীন বুঝলে এখানে কথাবলতে যাওয়া মানেই বিপদ টেনে আনা। এরা কোনো কথা শুনবে না, সকলেরই সহানুভূতি ক্রন্দনরতা নারীর দিকে। মার খেতে হবে বেশি কথা বললে। বাতাসের মোড় হঠাৎ এমনভাবে ঘুরে যাবে, তা ওরা ভাবেনি।

—গিরীন কুণ্ডু আর যাই হোক, নির্বোধ নয়। বেগতিক বুঝে সে দলবল নিয়ে মুহূর্তে হাওয়া হয়ে গেল।

শরৎ যখন নাটমন্দিরে ফিরে এল, তখন বেলা পাঁচটা।

গৌরী-মা বললেন, এত দেরি হল যে মা ?এসে একটু প্রসাদ খেয়ে নাও। ওরাই পুজো দিয়ে গেল। কাল যাবে তো ওদের সঙ্গে ?

শরৎ ইতিমধ্যে পথে আসতেই ঠিক করে ফেলেছে সে ওদের সঙ্গে যাবে। এখানে থাকলে তার সমূহ বিপদ। আজ উদ্ধার পেয়েছে, কিন্তু যদি গিরীন তোড়জোড় করে আর একদিন আসে—আসবেই সে, তখন হয়তো জোর করেই নিয়ে যাবে। সন্ধ্যাবেলা গৌরী-মার কথকতা শুনতে গিন্নি এলেন, সব ঠিক হয়ে গেল—কাল বেলা তিনটার সময় শরৎ তৈরি থাকবে। কালই রওনা হতে হবে ওদের সঙ্গে।

রাত্রিটা নিতান্ত ভয়ে ভয়ে কেটে গেল। সকালে উঠে শরৎ গৌরী-মার সঙ্গে গঙ্গাস্নান করে এল। তাও তার বুক ঢিপ ঢিপ করছিল, কোন্ দিন থেকে ওরা এসে পড়ে নাকি ! ভগবান কাল বড় বাঁচিয়ে দিয়েছেন। মানুষ এত খল হতে পারে, এমন নয়-কে-ছয় করতে পারে, হাসিমুখে নির্জলা মিথ্যে বলতে পারে—গ্রাম্য মেয়ে শরতের তা জানা ছিল না। বিশেষ করে সে যে বাপের মেয়ে ! কেদারের মেয়ে তাঁরই মতো সরল।

গৌরী-মা বললেন, নকুলেশ্বর তলায় গিয়ে একটু প্রসাদী বেলপাতা নিয়ে এসো। তোমার যাত্রার দিন, ওদের যাত্রার দিন। মায়ের ফুল বেলপাতা আমি মন্দির থেকে এনে দেব।

যাবার সময় গৌরী-মার চোখে জল এল, বললেন—তিনদিনের মায়া, তাতেই তোমায় ছেড়ে দিতে মন কেমন করছে। আবার এসো, দেশে ফেরবার সময় এখান দিয়েই হয়ে যাবে সরলারা।

শরৎ চোখের জলে ভেসে গৌরী-মার পায়ের ধুলো নিলে, বলল—অনেকদিন মাকে হারিয়েছি, আবার সেই মায়ের কথা আপনাকে দিয়ে মনে পড়ল। আশীর্বাদ করুন মা।

হাওড়া স্টেশন ! মস্তবড় জায়গা। লোকজন গমগম করছে। লম্বা লম্বা রেলগাড়ি ঘরের মধ্যে এসে দাঁড়াচ্ছে। আলোয় আলো চারিদিক। ঘরের মধ্যে এসে রেলগাড়ি দাঁড়ায় কেমন করে !

সে সত্যিই চলল তবে ?কোথায় চলল ?

বাবার সঙ্গে আর দেখা হবে না। কোথায় পড়ে রইল তার আবাল্য-পরিচিত গড়শিবপুর ! যেখানকার গড়ের জঙ্গলে, তাদের কালো পায়রার দীঘির জলে, চৈত্র মাসে তুলোওড়া বড় শিমুল গাছটার ছায়ায়, উত্তর দেউলের নির্জন পথে বাদুড়নখীর শুক্‌নো খোলের ঝুমঝুমির শব্দে তার যে জীবনের শুরু, সেই মাটিতেই—সেখানকার জ্যোৎস্নার মধ্যে, বর্ষার দিনের মেঘের ছায়ায় যে জীবন সুখদুঃখে আপন পথ ধরে চলে এসেছিল এতদিন—সে জীবনের সঙ্গে আজ চিরদিনের মতো ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল।

শরৎ জানলা থেকে মুখ বাড়িয়ে দিল। চোখের জলে দ্রুত পলায়নপর টেলিগ্রাফের তারের খুঁটি, গাছপালা, ঘরবাড়ি সব ঝাপ্‌সা।কামরার মধ্যে শরৎ চেয়ে দেখলে অবাক হয়ে। কাদের সঙ্গে সে আজ দেশ ছেড়ে যাচ্ছে ?কারা এরা ?ওই মাটিতে ফর্সা রঙের গিন্নি, এই চৌদ্দ বছরের মেয়ে, ওই তিন-চারটি ছোট বড় খুকি, কর্তা আছেন পুরুষগাড়িতে—এদের তো সে চেনে না !

বাবা গান গাইতেন—‘দিয়ে মায়াবেড়ি পদে ফেলেচ বিপদে।’

কত যে সাধ ছিল দেশবিদেশে বেড়াতে। গড়শিবপুরের জঙ্গল ভালো লাগে না, রাজলক্ষ্মীর সঙ্গে সে কত গল্প ! আজ তো সে-সব সফল হতেই চলল—কিন্তু এ ভাবে সর্বস্ব ছেড়ে, বাবাকেছেড়ে গড়শিবপুর জন্মের মতো ছেড়ে যেতে হবে, জন্মজন্মান্তরের গভীর চেতনা দিয়ে যে গড়শিবপুর তার মন আঁকড়ে ধরে ছিল, তা সে কি কোনোদিন ভাবত ?

আর সে ফিরবে না।বাবাকে সে কলঙ্কের হাত থেকে—লোকের টিটকিরি থেকে মুক্ত রাখবে। তার ভাগ্যে পরের বাড়ির দাসী হয়ে চিরকাল বিদেশে নির্বাসন—যা ঘটে ঘটুক—বুড়ো বয়সে বাবার মুখ হাসাতে পারবে না। বাবা হয়তো দেশে গিয়ে বলেছেন, মেয়ে মরে গিয়েছে। খুব ভালো। আর সে দেখা দেবে না। দেশের কাছে মৃত হয়েই থাকবে যতদিন বাঁচবে সে।

রাতের অন্ধকারে বাংলা মুছে গেল। কামরাটা ছোট—ধামা, লণ্ঠন, প্যাঁটরা, বিছানা, জলের কুঁজোতে একটা দিক ঠাসা, অন্য দিকে শরৎ গৃহিণীর জন্য বিছানা পেতে দিলে বেঞ্চিতে। তার স্বাভাবিক সেবা-প্রবৃত্তি এখানেও সজাগ আছে।

গিন্নি বললেন, কোন্ ইস্টিশান রে মিনু ?

তেরো-চোদ্দ বছরের মেয়েটি মুখ বাড়িয়ে বললে, ব্যান্ডেল জংশন—

—সব শুয়ে পড় তোরা। শরৎ ওদের বিছানা করে দাও—

মিনু তাড়াতাড়ি বলল, আমি বিছানা পেতে নিচ্ছি মা—আমার পাতাই আছে।

শরৎ অবাক হয়ে মেয়েটির দিকে চাইল। বাঃ, বেশ মেয়েটি। এতক্ষণ চুপ করে লাজুকের মতো আপনমনে বসে ছিল।

পথে তার পর মেয়েটির সঙ্গে ওর বড় ভাব হয়ে গেল। ওর ভালো নাম মৃণাল, মৃদু স্বভাব, হৃদয়বতী। ও শরৎকে কি চোখে দেখে ফেলেছে, দিদি বলে ডাকে, লুকিয়ে হাতের কাজ কেড়ে নেয়।

জামালপুরে বদল করে ওরা গেল প্রথমে মুঙ্গেরে। সেখানে গিন্নির ছোট ঠাকুরপো চাকরি করে। গঙ্গার ধারে বেশ ভালো বাসা। তিন দিন ধরে কাটাল সেখানে, শরৎ মিনুকে সঙ্গে নিয়ে কষ্টহারিণীর ঘাটে রোজ স্নান করে আসে। গৃহিণীর বাতের ধাত, তিনি বাথরুমে স্নান করেন।

কষ্টহারিণীর ঘাটে প্রথমে যে দিন গিয়ে দাঁড়াল, শরতের মন অভিভূত হয়ে পড়ল—গঙ্গার রূপ দেখে। একদিকে জামালপুরের মাবক পাহাড়ের লম্বা টানা সুনীল রেখা, সামনে প্রশস্তপুণ্যতোয়া জাহ্নবী, দু-একখানা পালতোলা নৌকা নদীবক্ষে, কত স্নানার্থীর যাতায়াত।

পৃথিবীতে এমন সুন্দর জায়গাও আছে ?

আবার চোখে জল আসে, শরৎ দেখেনি কখনো এসব।

মিনু বললে, দিদি চেয়ে দ্যাখো—এই যে ভাঙা পাঁচিল না—এখানে মীরকাসিমের দুর্গ ছিল। ওই যে ফটক দিয়ে এলাম—দেখলে তো ?

—তোর দিদি মুখ্যু মেয়ে, তোরা এ কালের ইস্কুলে পড়া মেয়ে—দিদিকে একটু শিখিয়ে নে। মীরকাসিমের দুর্গ বললে তো—কে ছিল সে ?

—আহা দিদি, তুমি কিছু জানো না। শোনো বলি—

তার পর মিনু বিজ্ঞভাবে স্কুলে সদ্য-অধীত ইতিহাসের বিদ্যা সবিস্তারে জাহির করে।

শরৎ চোখ বড় বড় করে বলল—ও !

দিন বেশ কেটে যায়। একদিন সবাই মিলে চণ্ডীর মন্দিরে পুজো দিতে গেল, আর একদিন গেল সীতাকুণ্ড। মুঙ্গের থেকে ঘোড়ার গাড়ি ভাড়া করে গমের ক্ষেত, ছোলার ক্ষেতের পাশের পথ দিয়ে গিয়ে, কত ছোট বড় বস্তি ছাড়িয়ে কতখানি বেড়িয়ে এল সবাই মিলে।

পাহাড় জিনিসটা শরতের কাছে একটা বিস্ময়ের বস্তু।

প্রথম যেদিন মিনু ওকে দেখালে ওই দ্যাখো দিদি জামালপুরের পাহাড়—শরৎ অপলক চোখে চেয়ে রইল সেদিকে। তারপর আরো ভালো করে দেখলে যেদিন মুঙ্গের থেকে ওরা বখতিয়ারপুর রওনা হল। কাজরা স্টেশনের কাছে এবং স্টেশন ছাড়িয়ে বাঁদিকে সে কি লম্বা উঁচু পাথরের পাহাড়, এত বড় বড় পাথর যে আবার হয়, তার এত বড় স্তূপ হয়—এ কথা কে আবার কবে ভেবেছিল ?

কিউলের কাছাকাছি এসে দূরে কত নীল পাহাড়—শরৎ অবাক হয়ে চেয়ে থাকে। দেখে মনে আনন্দ হয়, দুঃখও হয়—কেবলই মনে হয় বাবাকে এসব সে যদি আজ দেখাতে পারত !

রেলে যেতে যেতে একটা চমৎকার জায়গা সে দেখেছে, মনের মধ্যে গেঁথে গেল জায়গাটা। কাজরা পাহাড়ের একটা কি সুবৃহৎ গাছের ছায়ায় অনেকটা যেন পাথরের সানবাঁধানো রোয়াক, চারিধারে শুধু পাহাড়, নিকটেই একটা ঝরনা ঝিরঝির করে পাহাড় থেকে বয়ে নেমে এসেছে। কি শান্তি পাহাড়ের ওপর সান-বাঁধানো রোয়াকের মতো পাথরটাতে ! কি ছায়া !

ট্রেনের এককোণে সে বসে বসে ভাবে বাবাকে নিয়ে সে ওইখানে একটা ছোট ঘর বাঁধবে। মাঝে মাঝে গড়শিবপুর থেকে বাবা আর সে ওখানে এসে বাস করবে দু-মাস, তিনমাস। জ্যোৎস্নারাতে এদিকের সেই যে পাথরখানা, বাবা ওটার ওপর বসে বেহালা বাজাবেন, তাঁর সেই প্রিয় গান গাইবেন—

"তারা কোন্ অপরাধে, এ দীর্ঘ মেয়াদে, সংসার গারদে থাকিব বল্"—

ভাবতে বেশ লাগে। যদিও সে জানে, এসব ভাবনা আকাশকুসুম, কোথায় বা বাবা, কোথায় কে ?এত দূর দূর সব জায়গা আছে তা হলে ?গড়শিবপুর থেকে, কলকাতা থেকে ?সত্যি পৃথিবীটা কত বড়—না মিনু ?

মিনু হেসে খিল্ খিল্ করে গড়িয়ে পড়ে বলল—দিদি, তুমি বড় ছেলেমানুষ ! কিচ্ছু জানো না।

—মুখ্যু যে তোর দিদি—তোরা আজকাল কত পড়িস্ বোন, কত জানিস্—

—দিদি, তোমাদের বাড়ির যে বড় গড়টা আর সেই ভাঙা কি কি পাথরের মূর্তি সেই বলেছিলে ?

—বারাহী দেবীর মূর্তি।

—সেই অন্ধকারে চলে বেড়ায় জঙ্গলের মধ্যে—না ?

—হ্যাঁ ভাই মিনু।

—সামনে যে পড়ে তাকে মেরে ফেলেন বুঝি ?

—এই রকম সবাই বলে। গড়ের জঙ্গলে সেই তিথিতে কেউ যায় না প্রাণের ভয়ে।

—সব দিন বুঝি নয় ?

—তিথির দিনে।

—আচ্ছা দিদি কখনো এরকম হতে দেখেছ তুমি ?তোমাদেরই তো গড়—

শরৎ গড়শিবপুরের জঙ্গল থেকে বহু দূরে থেকেও যেন ভয়ে শিউরে উঠে বললে—না দিদি, আমি কিছু দেখিনি চোখে। তবে পায়ের দাগ দেখেছে অনেকে—আমিও দেখেছি ছোটবেলায়—

—কিসের পায়ের দাগ ?

—বারাহী দেবীর পাথরের পায়ের ছাপ—

—সত্যি ?

—সত্যি ভাই মিনু। তোর গা ছুঁয়ে বলছি—

শরৎ যুবতী হলে কি হবে, ছেলেপুলে হয়নি, একা নির্জন গ্রাম্য সংসারে চিরদিন কাটিয়েছে, বালিকা-স্বভাব তার যায়নি। যায়নি বলেই সে বালিকাদের সঙ্গে নিজেকে যত মিশ খাওয়াতে পারে, বড়দের দলে তেমন পারে না। মিনুর সঙ্গে তাই মিলছিল ভালোই—যেমন গাঁয়ে থাকতে মিলেছিল রাজলক্ষ্মীর সঙ্গে।

বখ্তিয়ারপুর থেকে ওরা গেল রাজগীর। কর্তার শরীর ভালো নয়, গিন্নির বাতের ধাত—রাজগীরের উষ্ণ-কুণ্ডে স্নান করে বাত ভালো করতে চান। মিনু ও শরৎ বাসা থেকে বেরিয়ে রাজগীরের বৌদ্ধমঠ পার হয়ে বাজার ও উষ্ণ-কুণ্ডকে ডাইনে রেখে বেণুবন ও বৈভার পর্বতের ছায়ায় ছায়ায় সোন ভাণ্ডার গুহা পর্যন্ত বেরিয়ে আসে সরস্বতী নদীর ধারের পথ বেয়ে। ওদেরডাইনেই থাকে সেই গৃধ্রকূট পর্বত ও সেই সুপবিত্র বেণুবন, বুদ্ধদেব যেখানে শিষ্য আনন্দকে উপদেশ দিয়েছিলেন ! হাজার বছর ধরে পার্বত্য সরস্বতী নদীর বাতাসে বুদ্ধদেবের পদচিহ্নপূত করণ্ড ও বেণুবন ধ্বনিত হয়, হাজার হাজার বছরের জ্যোৎস্নালোকে বৈভার পর্বতের শিখরদেশ উদ্ভাসিত হয়—ছেলেমানুষ মিনু ও অশিক্ষিত গ্রাম্য মেয়ে শরৎ, লোকে তার কিছুই খবর রাখে না। তবুও মিনু তার স্কুলপাঠ্য ইতিহাসের জ্ঞানকে আশ্রয় করে বলল—এই যে রাজগীর দেখছ দিদি, এর নাম রাজগৃহ। মগধের রাজধানী ছিল রাজগৃহ—জরাসন্ধের নাম জানো তো দিদি ?এখানে জরাসন্ধের রাজধানী ছিল—

মগধের খবর রাখে না শরৎ, কিন্তু কাশীরাম দাসের মহাভারত ও গ্রাম্য যাত্রার কল্যাণে জরাসন্ধের নাম তার অপরিচিত নয়।

শরতের চোখ বিস্ময়ে বড় বড় হয়। জরাসন্ধের রাজ্যে এসে গিয়েছে তারা—পুরাণের সেই জরাসন্ধ ?কতদূরে এসে পড়েছে আজ...কত দূর বিদেশে ?

এখানে প্রতিদিন ওরা উষ্ণ-কুণ্ডে স্নান করে, গিন্নিকে ধরে এনে রোজ স্নান করাতে হয়, শরৎ অত্যন্ত যত্নে নিয়ে আসে, অত্যন্ত যত্নে নিয়ে যায়। গিন্নি শরতের ওপর খুব সন্তুষ্ট—সেবাপরায়ণা শরৎ প্রাণ দিয়ে আশ্রয়দাত্রীর সেবা করে। সে সেবার মধ্যে এতটুকু ফাঁকি নেই।

রাজগীর থাকতেই গিন্নির এক জা কোন্ জায়গা থেকে ছেলেপুলে নিয়ে ওদের ওখানে হাওয়া বদলাতে এলেন। ইনি নাকি বেশ বড়লোকের মেয়ে, স্বামী পশ্চিমের কোন্ শহরে ইন্‌জিনিয়ার, মোটা পয়সা রোজগার করে। সঙ্গে দুটি ছেলেমেয়ে, একজন আয়া এসেছে। সর্বাঙ্গে সোনার গহনা—গুমোরে মাটিতে পা পড়ে না। দোহারা গড়ন, রং খুব ফর্সাও নয়, খুব কালোও নয়। দাম্ভিক মুখশ্রী।

প্রথম দিন থেকেই মিনুর কাকিমা শরতের ওপর ভালো ব্যবহার করত না। যেদিন গাড়ি থেকে নামল—সেই দিনই বিকেলে মিনু ও শরৎ রাজগীরের বাজার ছাড়িয়ে সরস্বতী নদীর ধারে বেড়িয়ে সন্ধ্যার কিছু আগে ফিরল। মিনুর কাকি অমনি শরৎকে বলে উঠল, ছেলে দুটোকে একটু কোথায় ধরবে, না কোথা থেকে এখন বেড়িয়ে ফিরল—বাম্‌নী, ও বাম্‌নী, খোকাদের কাপড় ছাড়িয়ে গা-হাত ধুইয়ে দাও—

তার পর থেকে প্রত্যেক সময় সে শরৎকে ডাকে 'বাম্‌নী' বলে। শরৎ নিজের হাতেই দুবেলার রান্নার ভার নিয়েছিল। বাড়ির পাচিকাকে যে চোখে দেখা উচিত, মিনুর কাকি সেই চোখেই দেখত ওকে।

একদিন মিনুকে ডেকে বলল, হ্যাঁরে, বাম্‌নীকে নিয়ে রোজ রোজ যাস্ কোথায় ?

—কে ?দিদি ?দিদির সঙ্গে বেড়াতে যাই ।

—দ্যাখ্, তোকে বলে দিই মিনু ! চাকর-বাকরের সঙ্গে বেশি মেশামেশি করা ভালো নয়। সেবার তো দেখিনি, ওকে কোথা থেকে আনলি ?

—মা কলকাতা থেকে এনেছে এবার।

—ক'টাকা মাইনে ঠিক হয়েছে জানিস্ ?

—আমি জানি নে কাকিমা। তবে আমার মার যিনি গুরু-মা, কালীঘাটে থাকেন, তিনিই দিয়েছেন।

—যাক্‌গে, ওদের সঙ্গে এত মেশামেশি ভালো নয় বাপু। ওদের নাই দিলেই মাথায় চড়ে বসবে, চাকর-বাকরকে কখনো নাই দিতে নেই। অমনি একদিন বলে বসবে দু-টাকা মাইনে বাড়িয়ে দাও—ওসব করিস্ নে।

—উনি কিন্তু তেমন নয় কাকিমা—বড় ভালো, কি কথাবার্তা, ওঁদের দেশে মস্ত বড় বাড়ি ছিল, এখন পড়ে গিয়েছে—গড় ছিল বাড়িতে—কেমন দেখতে দেখছ তো ?বড় বংশের মেয়ে—

মিনুর কাকিমা হেসে গড়িয়ে পড়ে আর কি ! একটু সামলে নিয়ে বললে, তোকে এইসব গল্পকরে বুঝি ?কলকাতা থেকে এসেছে, ওই বয়েস—যাই হোক, ওরা লোক ভালো হয়না। সে-সব তোর শোনার দরকারও নেই—মোট কথা তুই ছেলেমানুষ, ওর সঙ্গে অত মেলামেশা করো না—বারণ করলুম।

তার পর থেকে মিনুর সত্যিই শরতের সঙ্গে বেড়ানো বন্ধ হয়ে গেল, কাকিমার হুকুমে।

একদিন মিনুর কাকিমা শরৎকে ডেকে বললে, ওগো বাম্‌নী, শোনো এদিকে। আগে কোথায় কাজ করতে ?

শরৎ এই বউটির পাশ কাটিয়ে চলতো—এ পর্যন্ত সামনেই এসেছে কম, উত্তর দিলে—কাজ বলছেন ?কাজ—কলকাতাতেই—

—কোথায় বলো তো ?আমরা কলকাতার লোক। সব চিনি। কোথায় ছিলে ?

—কালীঘাটে গৌরী-মার কাছে।

—না না, আমি বলছি কাজ করতে কোথায় ?

—কাজ করিনি কোথাও।

—তবে যে খানিক আগে বললে কাজ করতে ! বাড়ি কোথায় তোমার ?

—যশোর জেলার গড়শিবপুর—

—আচ্ছা, তোমার নাম কি বলো। কি পোস্টাফিস তোমার গাঁয়ের, আমরা চিঠি লিখব। তোমাকে সেখানে কেউ চেনে কিনা দেখা দরকার। অজানা লোককে রাখা ঠিক নয় কিনা। তোমার কেউ আছে, সেই কি নাম বললে, সেই গাঁয়ে ?

শরতের মুখ শুকিয়ে গেল। সে সত্য কথা বলে বিপদে পড়ে যাবে এমন তো ভাবেনি। কথা বানিয়ে বলা তার অভ্যাস নেই—তার বাবাও যেমন চিরকাল সোজা সরল কথা বলে এসেছেন, সে-ও তাই শিখেছে। এখন কি করা যায়, দেশে চিঠি লিখলে তো সব ফাঁস হয়ে যাবে।

কিন্তু এর মধ্যে একটা সত্য কথা বলবার ছিল, ডাকঘরের নাম তার জানা নেই। আগে ডাকঘর ছিল কুলবেড়ে। সে ডাকঘর উঠে গিয়েছে, বাবার কাছে সে শুনেছিল—তাদের কস্মিন্‌কালে চিঠিপত্র আসে না, কেই বা দেবে, ডাকঘর যে কোথায় হয়েছে।

সে বললে—ডাকঘর কোথায় জানি নে—

—ওমা, সে কি কথা—ডাকঘর জানো না কোথায়—কে আছে তোমার ?

—কেউ নেই মা ।

কথাটা বলবার সময়ে শরতের গলা ধরে গেল, মিনুর কাকিমা সেটা লক্ষ্য করলে। গিন্নিকে গিয়ে বললে—দিদি লোক দেখে রাখতে হয়। বাম্‌নীর বাড়িঘর আজ জিজ্ঞেস করলুম, তা বলতে চায় না। আমি তো ভালো বুঝছি নে, ওকে তাড়াও—

গিন্নি বললেন, গৌরী-মা ওকে দিয়েছেন, তাঁর কাছে থাকত। ভালো মেয়ে বড্ড—কোনো বদ্‌চাল তো দেখিনি। ওর আর কেউ নেই, তখনি জানি। ওকে তাড়াতে পারব না।

আট

মিনুর কাকিমার এ খুঁটিনাটি জেরার পরদিন থেকে শরৎ ভয়ে আর সামনে বেরুতে চায় না সহজে। সে জানত না, গিন্নির কাছে তার সম্বন্ধে লাগানোর কথা। কিন্তু আবার কোনোদিন বাপের বাড়ির কথা জিজ্ঞেস করে হয়তো বসবে বউটি—হয়তো যে আশ্রয়টুকু আছে, তাও যাবে। তার চেয়ে সামনে না যাওয়া নিরাপদ।

কিন্তু শরৎ এড়িয়ে যেতে চাইলেও মিনুর কাকিমা অত সহজে শরৎকে রেহাই দিতে রাজী নয় দেখা গেল। শরৎকে সে পছন্দও করে না—অথচ পছন্দ না করার মধ্যেই শরৎ সম্বন্ধে ওর কেমন এক ধরনের উগ্র কৌতূহল।

একদিন শরৎকে ডেকে বললে, ও বাম্‌নী—শোনো—শরৎ কাছে গিয়ে বললে, কি বলছেন ?

—তোমার হাতের রান্না বেশ ভালো। কোন্ জেলায় বাপের বাড়ি বললে সেদিন যেন—

—শরতের মুখ শুকিয়ে গেল। এই বুঝি আবার—

—সে বললে—যশোর জেলা।

—যশোর জেলা। বাঙাল দেশের নিরিমিষ্যি রান্না বাপু তোমাদের ভালোই। তোমার বয়েস কত ?

—সাতাশ বছর।

—না, তার চেয়ে বয়েস বেশি। বত্রিশ-তেত্রিশের কম না। তোমাদের হিসেব থাকে না।

শরৎ চুপ করে রইল ! এর কোনো উত্তর নেই।

—তোমার বিয়ে হয়েছিল কোথায় ?

—আমাদের গাঁয়ের কাছেই।

—কতদিন বিধবা হয়েছ ?

এ জাতীয় প্রশ্নের উত্তর দিতে শরতের মনে বড় কষ্ট হয়। যা ভুলে গিয়েছে, যা চুকেবুকে গিয়েছে কতদিন আগে, সে-সব দিনের কথা, সে সব পুরোনো কাসুন্দি—এখন আর ঘেঁটে লাভ কি ?

—তবু সে বললে, অনেকদিন আগে। আমার তখন আঠার বছর বয়েস।

—সেই থেকে বুঝি কলকাতায়—মানে, চাকরি করছ ?

—না, দেশেই ছিলাম।

শরৎ খুব সতর্ক ও সাবধান হল। তার বুক ঢিপঢিপ করতে লাগল।

কলকাতায় কতদিন আগে এসেছিলে ?

—বেশিদিন না।

—গাঁ থেকে কার সঙ্গে—মানে কলকাতায় আনলে কে ?

শরতের জিব ক্রমশ শুকিয়ে আসছে। তার মুখে কথা আর জোগাচ্ছে না। কাঁহাতক বানিয়ে বানিয়ে কথা বলবে সে ?

—কালীঘাট এসেছিলাম মা—গৌরী-মার কাছে সেই থেকে ছিলাম।

সেদিন মিনু এসে পড়াতে তার কাকিমার জেরা বন্ধ হল। শরৎ মুক্তি পেয়ে সামনে থেকে সরে গেল।

এর পরদিন বাসার সকলে মিলে উষ্ণকুণ্ডে স্নান করতে গেল। শরৎ ছেলেমেয়েদের সামলে নিয়ে পেছনে পেছনে চলল। মিনুর যা সেদিন যাননি। মিনুর কাকিমার সঙ্গে যে আয়া এসেছিল, সে কেন এখানে এসে ছুটি পেয়েছে—খাটুনি যত কিছু শরতের ঘাড়ে। কাকিমার দুটি ছেলেমেয়ে যেমন দুষ্ট তেমনি চঞ্চল—তাদের সামলাতে সামলাতে শরৎ হয়রান হয়ে পড়ে।

মিনুর কাকিমা বলে, ও বাম্‌নী, ওই মিন্টুকে চার পয়সার গরম জিলিপি কিনে এনে দাও তো বাজার থেকে—

বাজারে সকলের সামনে দোকান থেকে জিনিস কেনা শরতের অভ্যেস নেই। চুপি চুপি মিনুকে বললে, মিনু দিদি, যাবি আমার সঙ্গে ?

মিনু সব সময়েই তার দিদিকে সাহায্য করতে রাজী। বললে, চলো দিদি—

জিলিপি কিনে ফিরে আসতেই মিনুর কাকিমা বললে, চলো কুণ্ডীতে কাপড়গুলো নিয়ে—সাবানের বাক্স নেও। নেয়ে আসি—

মিনু পেছন থেকে এসে সাবানের বাক্স নিজেই নিয়ে চলল।

স্নান শেষ হয়ে গেল। সিক্ত বসনে সবাই উঠে এসে মেয়েদের কাপড় ছাড়বার ঘেরা জায়গারমধ্যে ঢুকল। শরৎও স্নান করে এল। সে লক্ষ্য করল, মিনুর কাকিমা ওর দিকে চেয়ে চেয়ে দেখছে। পশ্চিমের জলহাওয়ার গুণে হয়তো শরতের স্বাস্থ্য আরো কিছু ভালো হয়ে থাকবে, তার গৌর তনুর জলুস আরো খুলে থাকবে, সিক্তবসনা দীর্ঘদেহা সে তরুণীর মূর্তি এমন মহিমময়ী দেখাচ্ছিল যে রাস্তার কত লোক তার দিকে হাঁ করে চেয়ে রইল।

মিনু অপলক চোখে চেয়ে ভাবলে— দিদি যে বলে তাদের রাজার বংশ, মিথ্যে নয় কথাটা। ওই তো কাকিমা অত সেজেগুজে এসেছেন, দিদির পাশে দাঁড়াতে পারে না—

মিনুর কাকিমাও বোধ হয় শরতের অদ্ভুত রূপে কিছুক্ষণের জন্যে মুগ্ধ না হয়ে পারলে না—কারণ সে-ও খানিকটা শরতের দিকে চেয়ে চেয়ে দেখলে।

সঙ্গে সঙ্গে তার কেমন এক ধরনের ভাব হল মনে—সেই পুরাতন মনোভাব, সুন্দরী নারীর প্রতি সাধারণ নারীর ঈর্ষা।

সে ধমকের সুরে বললে, একটু হাত চালিয়ে কাপড়টাপড়গুলো কেচে-টেচে নাও না বাপু, তোমার সব কাজেই ন্যাড়া-ব্যাড়া—

যেন শরৎকে খাটো করে অপমান করে ওর নিজের মর্যাদা আভিজাত্য মাথাচাড়া দিয়ে উঠে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করলে।

ফিরবার পথে মিনুর কাকিমা বললে, তুমি একটু আগে হেঁটে যাও বাবু, আমরা আস্তে আস্তে যাচ্ছি— তোমাকে আবার গিয়ে দিদির গরমজল চড়াতে হবে—কাপড়গুলো নিয়ে গিয়ে রোদে দাওগে—

বড় এক বোঝা ভিজে কাপড় শরতের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে কাকিমা মিনুকে ও নিজের ছেলেমেয়ে দুটিকে নিয়ে পিছিয়ে পড়ল। মিনু বলল, দিদিকে আজ চমৎকার দেখাচ্ছিল নেয়ে উঠে, না কাকিমা ?

কেন মিনু হঠাৎ একথা বললে ?মিনুর কাকিমাও বোধ হয় ওই ধরনের কোনো কথাই ভাবছিল। হঠাৎ যেন চমকে উঠে মিনুর দিকে চেয়ে রইল অল্প একটু সময়ের জন্যে। পরক্ষণেই তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বললে, পরের ঘি-দুধ খেলে অমন সবারই হয় বাবু—তুই চল্, নে—

বিকেলে আবার বউটি ডাকলে শরৎকে। বউ নিজে স্টোভ ধরিয়ে চা করে এক পেয়ালা মুখে তুলে চুমুক দিচ্ছে, আর একটা ধূমায়মান পেয়ালা সামনে বসানো মেঝের ওপর। শরৎকে বললে, ও বাম্‌নী, দিদিকে চা-টা দিয়ে এসো তো ?

তার পরের কথাতে শরৎ বড় চমৎকৃত হয়ে গেল কিন্তু।

বউটি বললে, তোমার জন্যেও এক পেয়ালা আছে, ওটা দিদিকে দিয়ে এসো—এসে তুমি খাও—

শরৎ অগত্যা ফিরে এসে কলাইকরা পেয়ালাটা তুলে নিয়ে রান্নাঘরের দিকে যাচ্ছে, বউটি বললে, এখানে খাও না গো, তাড়াতাড়ির কি আছে ?

শরৎ বসে চা খেতে লাগল কিন্তু কোনো কথা বললে না।

মিনুর কাকিমা আবার বললে, তোমাকে একটা কথা বলব ভাবছি। দিদির কাছ থেকে তোমায় যদি আমি নিয়ে যাই, তুমি মাইনে নেবে কত ?

শরৎ আরো অবাক হয়ে ওর মুখের দিকে চেয়ে বললে—আমাকে ?

—হ্যাঁ গো—তোমাকে। বলো না মাইনে কত নেবে ?

—গিন্নিমা যেতে দেবেন না আমায়।

মিনুর কাকিমা মুখ নেড়ে বললে, সে ভাবনা তোমার না আমার ?আমি যদি বলেকয়ে নিতে পারি ! মানে আর কিছু না, যেখানে থাকি খোট্টা বামুনে রাঁধে, বাঙালির মুখে সে রান্না একেবারে অখাদ্য। আমার নিজের ওসব অভ্যেস নেই—হাঁড়িহেঁশেল কখনো করিনি, বাপের বাড়িতেও না, শ্বশুরবাড়িতে এসে তো নয়ই। তোমাদের বাঙাল দেশের রান্না ভালো—তাই বলছিলাম—বুঝলে ?

শরতের মুখ চুন হয়ে গেল।

এমন একটা আশ্রয় পেয়ে সে যে কোথাও যেতে রাজী নয়, এদের ছেড়ে, মিনুকে ছেড়ে। কিন্তু সে এখনো পরের দয়ার পাত্রী, তার কোনো ইচ্ছে বা দয়া এসব স্থলে খাটবে না, সে ভালোইবোঝে।

সে চুপ করে রইল।

মিনুর কাকিমা ভুল বুঝে বললে, আচ্ছা তাই তবে ঠিক রইল। মাইনের কথা একটা কিন্তু ঠিক করে ফেলা ভালো—তা বলছি। তখন যে বলবে—

শরৎ মিনুকে নিরিবিলি পেয়ে বললে, মিনু বেড়াতে যাবি ?

—চলো দিদি—কোন্ দিকে যাবে ?

—সোন ভাণ্ডারের গুহার দিকে চল—

নদীর ধারে ধারে বন্যবৃত পথ গৃধ্রকূট শৈলের ছায়ায় ছায়ায় সোন ভাণ্ডার ছাড়িয়ে রাজগীরের প্রাচীনতর অঞ্চলে জরাসন্ধের মল্লভূমির দিকে বিস্তৃত। ওরা সেই পথে চলল। কত পাথরের নুড়ি পড়ে আছে পাহাড়ের তলায়, নদীর পাড়ে। সমতলবাসিনী শরৎ এখনো এই সব রঙচঙে নুড়ির মোহ কাটিয়ে ওঠেনি, দেখতে পেলেই কুড়িয়ে আঁচলে সঞ্চয় করে।

মিনু বললে, তুমি একটা পাগল দিদি ! কি হবে ওসব ?

—বেশ না এগুলো ?দ্যাখ এটা কেমন—

—কি করবে ?

—ইচ্ছে কি করে জানিস্ ! ওসব দিয়ে ঘর সাজাই—কিন্তু ঘর কোথায় ?

—জড়ো করেছ তো একরাশ।—তাতেই সাজিয়ো—জানিস মিনু, তোর কাকিমা কি বলেছে ?

—কি দিদি ?

—আমায় নিয়ে যেতে চায় ওদের বাড়ি।

—তোমার যাওয়া হবে না, আমি মাকে টিপে দেব !

—আমি তোদের ফেলে কোথাও যেতে চাই নে মিনু। যখন আশ্রয় পেয়েছি, যতদিন বাঁচি এখানেই থাকব।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত যেতেই হল মিনুর কাকিমার সঙ্গে। মিনুর মা বললেন—যাও মা, ওরা কাশীতে যাচ্ছে, তোমার তীর্থ করা হবে এখন। আমি এর পরে তোমায় কাছে নিয়ে আসব।

মিনুর কাকিমা সগর্বে অন্যান্য বোঁচকা, ট্রাঙ্ক, আয়া ও ছেলেমেয়েদের সঙ্গে শরৎকেও নিয়ে গিয়ে কাশী নামল দিন-দশেক পরে। মাঝারি গোছের তেতলা বাড়ি, ছোট্ট সংসার, স্বামী-স্ত্রী আর এক দেওর। দেওর লাহোর মেডিকেল ইস্কুলে পড়ে, এবার পাশ দেবে। নিচে একঘর গরিব লোক থাকে ওদের ভাড়াটে।

শরৎ মুখ ফুটে কিছু বলতে পারেনি, কিন্তু নতুন জায়গায় এসে তার এত খারাপ লাগছিল। একটা কথা বলবার লোকও নেই। মিনুর কাকিমা চাকর-বাকরকে আমল দেয় না, ছেলেমেয়েদেরও তার ভালো লাগে না। যেমন দুষ্ট, তেমনি একগুঁয়ে এগুলো। যা ধরবে তাই।

একদিন মিনুর কাকিমা বললে—ও বাম্‌নী, এই ডালটুকু ওই নিচের তলার পটলের মাকে দিয়ে এসো—চেয়েছিল আমার কাছে, গরিব লোক—

শরৎ ডাল দিতে গিয়ে দেখল একটি বউ রান্নাঘরে বসে ওর দিকে পিছন ফিরে রান্না করছে। ওর কথায় বউটি ওর দিকে ফিরতেই শরৎ বললে, উনি ডাল পাঠিয়ে দিয়েছেন— রাখুন—

তার পরেই বউয়ের চোখ দুটোর দিকে চেয়ে শরতের মনে কেমন খট্‌কা লাগল।

বউটি হেসে বললে, তোমার গলা নতুন শুনছি। তুমি বুঝি ওদের এখানে নতুন ভর্তি হয়েছ। বলছিলেন কাল দিদি। বসো ভাই। আমি চোখে দেখতে পাইনে—বাটিটা রাখ এই সিঁড়ির কাছে।

ও,তাই অমন চোখের চাউনি !

শরতের বুকের মধ্যে যেন কোথায় ধাক্কা লাগল।

বউটি আবার বললে, তোমার নাম কি ভাই ?তোমার গলা শুনে মনে হচ্ছে বয়েস বেশিনয়।

—আমার নাম শরৎ। বয়েস আপনার চেয়ে বেশিই হবে বোধ হয়—

—না ভাই, আমার বয়েস কম নয়। তা আমাকে তুমি আপনি আজ্ঞে কোরো না। আমি একা থাকি এই ঘরে—উনি তো বাইরের কাজেই ঘোরেন। তুমি এসো, দুজনে গল্প করব।

—বেশ ভাই। তাহলে তো বেঁচে যাই—

শরতের মনের মধ্যে কাশী আসবার কথা শুনে একটু আগ্রহ না হয়েছিল এমন নয়। মিনুর মার কাছে এজন্যে সে না আসার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেনি। কাশী গয়া ক'জন বেড়াতে পারে ?তাদের গাঁয়ের নীলমণি চাটুজ্যের মা শরতের ছেলেবেলায় কাশীতে এসে তীর্থ করে যান—সে গল্প বুড়ির এখনো ফুরল না। আর বছরও সে গল্প বুড়ির মুখে শরৎ শুনেছে। সেই কাশীতে যদি এমন যাওয়া হয়—হোক !

কাশী এসে কিন্তু মিনুর কাকিমার ফরমাশ আর হুকুমের চোটে এতটুকু সময় পায় না শরৎ। সকালে উঠে হেঁশেলের কাজ শুরু। একদফা ছোটদের দুধবার্লি, একদফা বড়দের চা খাবার, বাজল বেলা আটটা। তার পরে রান্নার পালা শুরু হল এবং খাওয়ানো-দাওয়ানোর কাজ মিটতে বেলা দেড়টা। ওবেলা তিনটে থেকে সাড়ে তিনটের মধ্যে আবার চা-খাবারের পালা। সন্ধ্যার সময় বাবুর বন্ধুরা বৈঠকখানায় এসে বসে, রাত নটা পর্যন্ত বিশ পেয়ালা চা-ই হবে।

দুপুরবেলায় কাজকর্ম চুকিয়ে ফাঁক পেলে শরৎ এসে বসে একতলায় অন্ধ বউটির কাছে। শরৎ তার পরিচয় নিয়েছে—ওর নাম রেণুকা, ওর বাবা কাশীতেই স্কুল-মাস্টারি করতেন। মা নেই, ভাই নেই, আজ কয়েক বছর আগে ওর বিয়ে দিয়েই বাবা মারা যান। ওরা ব্রাহ্মণ, স্বামী সামান্য মাইনেতে কি একটা চাকরি করে। সন্ধ্যার সময় ভিন্ন বাড়ি আসতে পারে না—সারাদিন রেণুকাকে একা থাকতে হয় বাসাতে।

শরৎ বলে, তুমি বাংলাদেশে যাওনি কখনো ?

—না ভাই, এখানেই জন্ম, বিশ্বনাথের চরণ ছেড়ে আর কোথাও যাবার ইচ্ছা নেই।

—দেশ ছিল কোথায় বাবার মুখে শোনোনি ?

—হালিশহর বল্‌দেঘাটা। এখনো আমার কাকারা সেখানে আছেন শুনেছি।

দুজনে বসে সুখদুঃখের কথা বলে। রেণুকার অনেক কাজ শরৎ করে দেয়। বড় ভালো লাগে এই অন্ধ মেয়েটিকে। মন বড় সরল, অল্পেই সন্তুষ্ট, জীবন ওকে বেশি কিছু দেয়নি, যা দিয়েছে তাই নিয়েই খুশি আছে।

রেণুকা বলে, একদিন আমার বাড়ি কিছু খাও ভাই—

—বেশ, আমি কি খাব না বলছি ?

—রান্না তো খেতে পারবে না। নিরিমিষের হাঁড়ি নেই—সব একাকার। রান্না করে খাবে আলাদা ?

—না ভাই, সে হাঙ্গামাতে দরকার নেই—তুমি ফল খাইও বরং—

রেণুকার স্বামী ছানা ফলমূল মিষ্টি কিনে রেখে গিয়েছিল। একদিন বিকেলে রেকাবি সাজিয়ে রেণুকা ওকে খেতে দিলে। চোখে দেখতে পায় না বটে—কিন্তু কাজকর্ম সবই করে হাতড়ে হাতড়ে।

শরৎ একদিন মিনুর কাকিমাকে বলেকয়ে বিশ্বনাথ দর্শনের ছুটি নিলে। ওদের আয়া সঙ্গে গেল মন্দিরের পথ দেখানোর জন্যে। শরৎ রেণুকাকে হাত ধরে নিয়ে গেল।

বিশ্বনাথের গলির মধ্যে কি লোকের ভিড় ! কত বউ-ঝি, কত লোকজন ! শরৎ অবাক হয়ে চেয়ে দেখলে, তার কাছে সব কিছু নতুন, সবই আশ্চর্য। মন্দির থেকে বার হয়ে দশাশ্বমেধ ঘাটেগিয়ে বসল বিকেলবেলা। নিত্য উৎসব লেগেই আছে সেখানে। নৌকো আর বজরাতে কত লোক সাজগোজ করে বেড়াতে বেরিয়েছে।

রেণুকা বললে, আমি ওসব জায়গা দেখেছি ছেলেবেলায়। চোদ্দ বছর বয়েস থেকে অসুখে চোখ হারিয়েছি। এখনো সেইরকম আছে, কানে শুনে বুঝতে পারি।

—ভারি ভালো জায়গা ভাই। কলকাতা শহর দেখে ভালো লেগেছিল বটে— কিন্তু সেখানে শান্তি পাইনি এমন। এখানে মন জুড়িয়ে গেল।

—একদিন গঙ্গায় নাইতে এসো—

সময় পাই নে, আসি কখন ?কাল একবার বলব—

শরৎ আর রেণুকা একটু তফাত হয়ে বসে। চারিদিকের জন-কোলাহল ও সমুখে পুণ্যতোয়া জাহ্নবীর দিকে চেয়ে শরতের নতুন চোখ ফোটে। সত্যই সে বড় শান্তি পেয়েছে মনে।

আয়া বললে, একদিন তোমাকে কেদার ঘাটে নিয়ে যাব—

শরৎ চমকে উঠে বললে, কি ঘাট ?

—কেদার ঘাট। ওই দিকে আমার সঙ্গে যেয়ো—

শরতের মন স্বপ্নঘোরে একমুহূর্তে কোন্ পথে চলে গেল পাহাড় পর্বত বনবনানীর ব্যবধান ঘুচিয়ে। গরিব বাবা কত কষ্টে চাল জোগাড় করে, নুন তেল জোগাড় করে এনে বলতেন ভালো করে রাঁধো, বাবা

যে ছেলেমানুষের মতো, ঘরে কিছু নেই, তা বুঝবেন না—ভালো খাওয়াটি হওয়া চাই—নইলে অবুঝের মতো রাগ করবেন, অভিমান করবেন। এতটুকু কষ্ট সহ্য করতে পারেন না বাবা। কোথায় গেলেন বাবা ! জানবার জন্যে বুকের মধ্যে কেমন করে ওঠে, তিনি এখন কোথায় কি ভাবে আছেন ! এমন জায়গা কাশী, সেই কতকাল আগের গল্পে শোনা বিশ্বনাথের মন্দির, দশাশ্বমেধ ঘাট সব দেখা হল—কিন্তু মনের মধ্যে সব সময় একথা আসে কেন, বাবা যে এসব কিছু দেখলেন না, বাবা বুড়ো হয়েছেন, তাঁর এখন তীর্থধর্ম করবার সময়, অথচ বাবার অদৃষ্টে জুটল না কিছু। তিনি গোয়ালপাড়া বাগদিপাড়ায় বেহালা বাজিয়ে, গান গেয়ে বেড়াচ্ছেন, ফিরে এসে অবেলায় হাত পুড়িয়ে রেঁধে খাচ্ছেন কিংবা তাও খাচ্ছেন না, কে তাকে দেখছে, কে মুখের দিকে চাইবার আছে তার !

কাশী গয়া সব তুচ্ছ—কিছু ভালো লাগে না।

শরৎ বলে, আচ্ছা রেণুকা, কাশীতে দুজন লোকের কত হলে চলে ?

রেণুকা ওর মুখের দিকে চেয়ে বললে, তা কুড়ি টাকার কম তো কোনো মাস যেতে দেখলামনা। আমরা তো দুটো মানুষ থাকি। কেন ভাই ?

শরৎ কি ভেবে কি কথা বলছে সে নিজেই জানে না। রেণুকা ভাবে, শরৎ হঠাৎ কিরকম অন্যমনস্ক হয়ে গেল, না কি—আর ভালো করে কথা বলছে না কেন ?

বাড়ি ফিরে মিনুর কাকিমার ফাইফরমাশ ও হুকুমের মধ্যে রান্নাঘরে রাঁধতে বসে সে ভাবে তার কোন্ জীবনটা সত্যি, গড়শিবপুরের ভাঙা গড়বাড়ির বনের সেই জীবন, না পরের বাড়ির হাঁড়ি-হেঁশেলের এ জীবন ?

নয়

মিনুর কাকিমা শরৎকে প্রায়ই বেরুতে দেন না। আজ তিনি যাবেন মিছরিপোখরায় তাঁর বন্ধুর বাড়ি, শরৎকে বাড়ি আগলে বসে থাকতে হবে, কাল তিনি লক্‌সাতে মাসিমার সঙ্গে দেখা করতে যাবেন, শরৎ ছেলেমেয়ে সামলে বাড়ি বসে থাকবে।

একদিন মিনুর কাকিমা বললে, পটলের বউয়ের ওখানে অত ঘন ঘন যাও কেন ?

—কেন ?

—আমি পছন্দ করি নে। ওরা গরিব লোক, আমাদের ভাড়াটে, অত মাখামাখি করা ভালো না।

—আমি মিশি, আমিও তো গরিব লোক। এতে আর দোষ কি বলুন ?

—তুমি বড় মুখে মুখে তর্ক করতে শুরু করেছ দেখছি। পটলের বউ মেয়ে ভালো নয়— তুমি জানো কিছু ?

শরৎ এতদিন মিনুর কাকিমার কোনো কথার প্রতিবাদ না করে নীরবে সব কাজ করে এসেছে, কিন্তু অন্ধ রেণুকার নামে কটু কথা সে সহ্য করতে পারলে না। বললে—আমি যতদূর দেখেছি কোনো বেচাল তো দেখিনি। আমি যদি যাই, আপনাকে তাতে কেউ কিছু বলবে না তো !

—না, আমি চাই আমার বাড়ির চাকরবাকর আমার কথা শুনবে—যাও, রান্নাঘরের দিকে দ্যাখো গে—

শরৎ মাথা নামিয়ে রান্নাঘরে চলে গেল। সেখানে গিয়েই সে ক্ষুণ্ণ অভিমানে কেঁদে ফেললে। আজ সে এ কথার জবাব দিত মিনুর কাকিমার, একবার ভেবেছিল দিয়েই দেবে উত্তর, যা থাকে ভাগ্যে।

তবে মুখে জবাব না দিলেও কাজে সে দেখালে, মিনুর কাকিমার অসঙ্গত হুকুম সে মানতে রাজী নয়। রেণুকার বাড়ি সেই দিনই বিকেলের দিকে সে আবার গেল।

রেণুকা ওকে পেয়ে সত্যিই বড় খুশি হয়। বললে—ভাই, আজ চলো আমরা নতুন কোনো জায়গায় যাই—

—কোথায় যাবে ?

—আমি রাস্তাঘাট চিনি নে, তুমি বাঙালিটোলায় আমার এক বন্ধুর বাড়ি নিয়ে যেতে পারবে ?

—কেন পারব না, চলো।

—ছ'নম্বর ধ্রুবেশ্বরের গলি—জিজ্ঞেস করে চলে যাওয়া যাক।

একে ওকে জিজ্ঞেস করে ওরা ধ্রুবেশ্বরের গলিতে নির্দিষ্ট বাসায় পৌঁছল। তারাও খুব বড়লোক নয়, ছোট দুটি ঘর ভাড়া নিয়ে থাকে স্বামী-স্ত্রী, চার-পাঁচটি ছেলেমেয়ে। বাড়ি অনেক দিন আগে ছিল ঢাকা জেলায় কি এক পাড়াগাঁয়ে, বাড়ির কর্তা বেনারস মিউনিসিপ্যালিটির কেরানী, সেই উপলক্ষ্যে এখানে বাস।

বাড়ির গিন্নির বয়স চল্লিশের কাছাকাছি। তিনি ওদের যত্ন করে বসালেন, চা করে খেতে দিলেন।

তাদের বাড়িতে একটি চার-পাঁচ বছরের খোকা আছে, নাম কালো। দেখতে কি চমৎকার, যেমন গায়ের রং, তেমনি মুখশ্রী, সোনালি চুল, চাঁচাছোলা গড়ন।

শরৎ বললে, এমন সুন্দর ছেলের নাম কালো রাখলেন কেন ?

গিন্নি হেসে বললেন, আমার শ্বশুরের দেওয়া নাম। তাঁর প্রথম ছেলে মারা যায়, নাম ছিল ওই। তিনিই জোর করে কালো নাম রেখেছেন।

প্রথম দর্শনেই খোকাকে শরৎ ভালোবেসে ফেললে।

বললে, এসো খোকা, আসবে ?

খোকা অমনি বিনা দ্বিধায় শরতের কাছে এসে বসল।

শরৎ বললে, আমি কে হই বলো তো খোকন ?

খোকা হেসে শরতের মুখের দিকে চোখ তুলে চুপ করে রইল।

খোকার মা বললেন, মাসিমা হন, মাসিমা বলে ডাকবে—

খোকা বললে, ও মাসিমা—

—এই যে বাবা, উঠে এসে কোলে বসো—

খোকার মা বললেন, সেই ছড়াটা শুনিয়ে দাও তোমার মাসিমাকে খোকন !

খোকা অমনি দাঁড়িয়ে উঠে বলতে আরম্ভ করলে—

এই যে গঙ্গা পুণ্য ঢারা
বিমল মুরটি পাগলপারা
বিশ্বনাটের চরণটলে বইছে কুটূহলে—

খোকা 'ত'-এর জায়গায় 'ট' বলে, 'ধ'-এর জায়গায় 'ঢ' বলে—শরতের মনে হল খোকার মুখে অমৃত বর্ষণ হচ্ছে যেন। অভাগিনী শরৎ সন্তানস্নেহ কখনো জানেনি, কিন্তু এই খোকাকে দেখে তার সুপ্ত মাতৃহৃদয় যেন হঠাৎ সজাগ হয়ে উঠল। কত ছেলে তো দেখলে এ পর্যন্ত, মিনুর কাকিমারই তো এ বয়সের ছেলে রয়েছে, তাদের প্রতি স্নেহ তো দূরের কথা—শরৎ নিতান্তই বিরক্ত। এ ছেলেটির ওপর এমন ভাবের কারণ কি সে খুঁজে পায় না। কিন্তু মনে হল এ খোকা তার কত দিনের আপনার, একে দেখে, একে কোলে করে বসে ওর নারীজীবন যেন সার্থক হল।

শরৎ সেদিন সেখান থেকে চলে এল বটে, কিন্তু মন রেখে এল খোকার কাছে। কাজের ফাঁকে ফাঁকে তার মন হঠাৎ অন্যমনস্ক হয়ে যায়।

গড়বাড়ির জঙ্গলে তাদের পুরানো কোঠা।

বাবা বাড়ি নেই।

—ও খোকন, ও কালো—

—কি মা ?

—বেড়িয়ো না এই রোদ্দুরে হটর হটর করে—ঘরে শোবে এসো—

খিল খিল করে দুষ্টুমির হাসি হেসে খোকা ছুটে পালায়।

হাঁড়ি-হেঁশেলের অবসরে নতুন আলাপী খোকনকে ঘিরে তার মাতৃহৃদয়ের সে কত অলস স্বপ্ন। যে সাধ আশা কোনোকালে পূর্ণ হবার নয়, ইহজীবনে নয়, মন তাকেই হঠাৎ যেন সবলে আঁকড়ে ধরে।

দিন দুই পরে সে রেণুকাকে বলে—চল ভাই, কালোকে দেখে আসি গে—

কিন্তু সেদিন রেণুকার যাবার সময় হয় না। স্বামী দুজন বন্ধুকে খাওয়ার নিমন্ত্রণ করেছেন, রান্নাবান্নার হাঙ্গামা আছে।

আরো দিনকয়েক পরে আবার শরতের অবসর মিলল—এবার রেণুকাকে বলেকয়ে নিয়ে গেল ধ্রুবেশ্বরের গলি। দূর থেকে বাড়িটা দেখে ওর বুকের মধ্যে যেন সমুদ্রের ঢেউ উথলে উঠল—বড় বড় পর্বতপ্রমাণ ঢেউ যেন উদ্দাম গতিতে দূর থেকে ছুটে এসে কঠিন পাষাণময় বেলাভূমির গায়ে আছড়ে পড়ছে।

খোকা দেখতে পেয়েছে, সে তাদের বাড়ির দোরে খেলা করছিল। সঙ্গে আরো পাড়ার কয়েকটি খোকাখুকি।

শরতের বুক ঢিপ ঢিপ করে উঠল—খোকা যদি ওকে না চিনতে পারে !

কিন্তু খোকা তাকে দেখেই খেলা ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে দুধে-দাঁত বার করে একগাল হেসে ফেললে।

শরতের অদৃষ্টাকাশের কোন্ সূর্য যেন রাশিচক্রের মধ্যে দিয়ে পিছু হঠতে হঠতে মীনরাশিতে প্রবিষ্ট হলেন, যার অধিপতি সর্বপ্রকার স্নেহপ্রেমের দেবতা শুক্র !

—চিন্‌তে পারিস্ খোকা ?আয়—

শরৎ হাত বাড়িয়ে দিলে ওকে কোলে নেবার জন্যে। খোকা বিনা দ্বিধায় ওর কোলে এসে উঠল, বললে—মাছীমা—

—তাহলে তুই দেখছি ভুলিসনি খোকা—

খোকার মা ছুটে এসে বললেন, যাক, এসেছ ভাই ?ও কেবল মাসিমা মাসিমা রে, একদিন ভেবেছিলাম রেণুকাদের বাড়ি নিয়েই যাই—দাঁড়াও ভাই, পাশের বক্‌সীদের বাড়ির বড় বউ তোমাকে দেখতে চেয়েছে, ডেকে আনি—

বক্‌সীদের বাড়ির দুই বউ একটু পরে হাজির। দুজনেই বেশ সুন্দরী, গায়ে গহনাও মন্দ নেই দুজনের। বড় বউ প্রণাম করে বললে—ভাই, আপনার কথা সেদিন দিদি বলছিলেন, তাই দেখতে এলুম—

—আমার কথা কি বলবার আছে বলুন ?

—দেখে মনে হচ্ছে, বলবার সত্যিই আছে। যা নয় তা কখনো রটে ভাই ?রটেছে আপনার নামে—

শরতের মুখ শুকিয়ে গেল। কি রটেছে তার নামে ?এরা কি কেউ গিরীন প্রভাসের কথা জানে নাকি ?সে বললে, আমার নামে কি শুনেছেন ?

বড় বউ হেসে বললে, না, তা আর বলব না।

শরতের আরো ভয় হল। বললে, বলুনই না ?

—আপনার চেহারার বড় প্রশংসা করছিলেন দিদি। আমায় বললেন, ভাই রেণুকাদের বাড়িওলাদের বাড়িতে তিনি এসেছেন রান্না করতে, কিন্তু অনেক বড় ঘরে অমন রূপ নেই। সে যে সামান্য বংশের মেয়ে নয়, তা দেখলে আর বুঝতে বাকি থাকে না। তাই তো ছুটে এলাম, বলি দেখে আসি তো—

শরৎ বড় লজ্জা পায় রূপের প্রশংসা শুনলে। এ পর্যন্ত তা সে অনেক শুনেছে—রূপের প্রশংসাই তার কাল হয়ে দাঁড়াল জীবনে, আজ এই দশা কেন হবে নইলে ?কিন্তু সে-সব কথা বলা যায় না কারো কাছে, সুতরাং সে চুপ করেই রইল—

কালোর মা বললেন, খোকা তো মাসিমা বলতে অজ্ঞান ! তবু একদিনের দেখা ! কি গুণ তোমার মধ্যে আছে ভাই, তুমিই জানো—

বক্‌সীদের বড় বউ বললে, একটু আমাদের বাড়ি পায়ের ধুলো দিতে হবে ভাই—

—এখন কি করে যাব বলুন, ছুটি যে ফুরিয়ে এল—

—তা শুনব না, নিয়ে যাব বলেই এসেছি—দিদিও চলুন, রেণুকা ভাই তুমিও এসো—

খোকাকে কোলে নিয়ে শরৎ ওদের বাড়ি চলল সকলের সঙ্গে।

বড় বউ বললে, ভাই তোমার কোলে কালোকে মানিয়েছে বড় চমৎকার। ও যেমন সুন্দর, তুমিও তেমন। মা আর ছেলে দেখতে মানানসই একেই বলে—

ওদের বাড়ি যে জলযোগের জন্যেই নিয়ে যাওয়া একথা সবাই বুঝেছিল। হলও তাই, শরতের জন্যে ফলমূল ও সন্দেশ—বাকি দুজনের জন্যে সিঙ্গাড়া-কচুরির আমদানিও ছিল। বউ দুটির অমায়িক ব্যবহারে শরৎ মুগ্ধ হয়ে গেল। খানিকক্ষণ বসে গল্পগুজবের পর শরৎ বিদায় চাইলে।

বড় বউ বললে, আবার কিন্তু আসবেন ভাই, এখন যখন খোকার মাসিমা হয়ে গেলেন, তখন খোকাকে দেখতে আসতেই হবে মাঝে মাঝে—

—নিশ্চয়ই আসব ভাই—

খোকা কিন্তু অত সহজে তার মাসিমাকে যেতে দিতে রাজী হল না। সে শরতের আঁচল ধরে টেনে বসে রইল, বললে—এখন টুমি যেয়ো না মাছীমা—

—যেতে দিবি নে ?

—না।

—আবার কাল আসব। তোর জন্যে একটা ঘোড়া আনব—

—না, টুমি যেয়ো না।

শরৎ মুগ্ধ হয় শিশু কত সহজে তাকে আপন বলে গ্রহণ করেছে তাই দেখে। যেন ওর কতদিনের জোর, কতদিনের ন্যায্য অধিকার। সব শিশু যে এমন হয় না, তা শরতের জানতে বাকি নেই।

খোকা ওর ছোট্ট মুঠি দিয়ে শরতের আঁচলে কয়েক পাক জড়িয়েছে। সে পাক খুলবার সাধ্য নেই শরতের, জোর করে তা সে খুলতে পারবে না, চাকরি থাকে চাই যায়। শরতের হৃদয়ে অসীম শক্তি এসেছে কোথা থেকে, সে ত্রিভুবনকে যেন তুচ্ছ করতে পারে এই নবার্জিত শক্তির বলে, জীবনের নতুন অর্থ যেন তার চোখের সামনে খুলে গিয়েছে। যখন অবশেষে সে বাড়ি চলে এল, তখন সন্ধ্যার বেশি দেরি নেই। মিনুর কাকিমা মুখ ভার করে বললেন, রোজ রোজ তোমার বেড়াতে যাওয়া আর এই রাত্তিরে ফেরা। উনুনে আঁচ পড়ল না এখনো, ছেলেমেয়েদের আজ আর খাওয়া হবে না দেখছি। আটটার মধ্যেই ওরা ঘুমিয়ে পড়বে—

—কিছু হবে না, আমি ওদের খাইয়ে দিলেই তো হল—

—তোমার কেবল মুখে মুখে জবাব ! এ বাড়িতে তোমার সুবিধে দেখে কাজ হবে না— আমার সুবিধে দেখে কাজ হবে, তা বলে দিচ্ছি। কাল থেকে কোথাও বেরুতে পারবে না।

মুখোমুখি তর্ক করা শরতের অভ্যেস নেই। সে এমন একটি অদ্ভুত ধরনের নির্বিকার, স্বাধীন ভঙ্গিতে রান্নাঘরের দিকে চলে গেল, একটা কথাও না বলে—যাতে মিনুর কাকিমা নিজে যেন হঠাৎ ছোট হয়ে গেল এই অদ্ভুত মেয়েটির ধীর, গম্ভীর, দর্পিত ব্যক্তিত্বের নিকট।

মিনুর কাকিমা কিন্তু দমবার মেয়ে নয়, শরতের সঙ্গে রান্নাঘর পর্যন্ত গিয়ে ঝাঁজালো এবং অপমানজনক সুরে বললে, কথার উত্তর দিলে না যে বড় ?আমার কথা কানে যায় না নাকি ?

শরৎ রান্নাঘরের কাজ করতে করতে শান্তভাবে বললে, শুনলাম তো যা বললেন—

—শুনলে তো বুঝলাম। সেই রকম কাজ করতে হবে। আর একটা কথা বলি, তোমার বেয়াদবি এখানে চলবে না জেনে রেখো। আমি কথা বললাম আর তুমি এমনি নাক ঘুরিয়ে চলে গেলে, ও-সব মেজাজ দেখিয়ো অন্য জায়গায়। এখানে থাক্‌তে হলে—ও কি, কোথায় চললে ?

—আসছি, পাথরের বাটিটা নিয়ে আসি ওঘর থেকে—

মিনুর কাকিমার মুখে কে যেন এক চড় বসিয়ে দিলে। সে অবাক হয়ে সেখানে দাঁড়িয়ে রইল। এ কি অদ্ভুত মেয়ে, কথা বলে না, প্রতিবাদ করে না, রাগঝালও দেখায় না—অথচ কেমন শান্ত, নির্বিকার, আত্মস্থ ভাবে তুচ্ছ করে দিতে পারে মানুষকে। মিনুর কাকিমা জীবনে কখনো এমন অপমানিতা বোধ করেনি নিজেকে।

শরৎ ফিরে এলে তাই সে ঝাল ঝাড়বার জন্যে বললে, কাল থেকে দুপুরের পর বসে বসে ডালগুলো বেছে হাঁড়িতে তুলবে। কোথাও বেরুবে না।

মিনুর কাকা তাঁর স্ত্রীর চিৎকার শুনে ডেকে বললেন, আঃ, কি দুবেলা চেঁচামেচি করো রাঁধুনীর সঙ্গে ?অমন করলে বাড়িতে চাকরবাকর টিকতে পারে ?

—কেন গো, রাঁধুনীর উপর যে বড় দরদ দেখতে পাই—

—আঃ, কি সব বাজে কথা বল ! শুনতে পাবে—

—শুনতে পেলে তো পেলে—তাতে ওর মান যাবে না। ওরা কি ধরনের মানুষ তা জানতে বাকি নেই—আজ এসেছে এখানে সাধু সেজে তীর্থ করতে।

—লোককে অপ্রিয় কথাগুলো তুমি বড্ড কটকট করো বলো ! ও ভালো না—

মিনুর কাকিমা ঝাঁজের সঙ্গে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে বললে, আমায় তোমার পাদ্রি সাহেবের মতো মর্মজ্ঞান শিখিয়ে দিতে হবে না—থাক্—

মিনুর কাকাটিকে শরৎ দূর থেকে দেখেছে। সামনে এ পর্যন্ত একদিনও বার হয়নি। লোকটি বেশ নাদুস-নুদুস চেহারার লোক, মাথায় ঈষৎ টাক দেখা দিয়েছে, সাহেবের মতো পোশাক পরে আপিসে বেরিয়ে যায়, বাড়িতে কখনো চেঁচামেচি হাঁকডাক করে না, চাকর-বাকরদের বলাবলি করতে শুনেছে যে লোকটা মদ খায়। মাতালকে শরৎ বড় ভয় করে, কাজেই ইচ্ছে করেই কখনোসে লোকটির ত্রিসীমানায় ঘেঁষে না।

সেদিন আবার তার মন উতলা হয়ে উঠল খোকাকে দেখবার জন্যে। খোকাকে একটা ঘোড়াদেবে বলে এসেছিল, হাতে পয়সা নেই, এদের কাছে মুখ ফুটে চাইতে সে পারবে না, অথচ কি করা যায় ?

কিন্তু শেষ পর্যন্ত খোকাকে খেলনা দেবার টানই বড় হল। সে মিনুর কাকিমাকে বললে—আমায় কিছু পয়সা দেবেন আজ ?

মিনুর কাকিমা একটু আশ্চর্য হল। শরৎ এ পর্যন্ত কখনো কিছু চায়নি।

বললে—কত ?

—এই—পাঁচ আনা—

মিনুর কাকিমা মনে মনে হিসেব করে দেখলে শরৎ পাঁচ মাস হল এখানে রাঁধুনীর কাজ করছে, এ পর্যন্ত তাকে মাইনে বলে কিছু দেওয়া হয়নি, সে-ও চায়নি। আজ এতদিন পরে মোটে পাঁচ আনা চাওয়াতে সে সত্যিই আশ্চর্য হল।

আঁচল থেকে চাবি নিয়ে বাক্স খুলে বললে, ভাঙানো তো নেই দেখছি, টাকা রয়েছে। ও বেলা নিয়ো—

শরৎ ঠিক করেছিল আজ দুপুরের পরে কাজকর্ম সেরে সে খোকার কাছে যাবে। মুখ ফুটে সে বললে, টাকা ভাঙিয়ে আনলে হয় না ?আমার বিকেলে দরকার ছিল।

—কি দরকার ?

—ও আছে একটা দরকার—

—বলোই না—

—একজনের জন্যে একটা জিনিস কিনব।

—কে ?

শরৎ ইতস্তত করে বললে রেণুকা জানে—পটলের বউ—

মিনুর কাকিমা মুখ টিপে হেসে বললে, আপত্তি থাকে বলবার দরকার নেই, থাক গে। নিয়ো এখন—

শরৎ রেণুকাকে নিয়ে বিশ্বনাথের গলিতে ঘোড়া কিনতে গেল। এক জায়গায় লোকের ভিড় ও কান্নার শব্দ শুনে ও রেণুকাকে দাঁড় করিয়ে রেখে দেখতে গেল। একটি আঠারো-উনিশ বছরের বাঙালির মেয়ে হাউহাউ করে কাঁদছে, আর তাকে ঘিরে কতকগুলো হিন্দুস্থানী মেয়েপুরুষ খ্যাপাচ্ছে ও হাসাহাসি করছে।

মেয়েটি বলছে, আমার গামছা ফেরত দে—ও মুখপোড়া, যম তোমাদের নেয় না, মণিকর্ণিকা ভুলে আছে তোদের ?শালারা, পাজি ছুঁচোরা—গামছা দে—

শরৎকে দেখে ভিড় সসম্ভ্রমে একটু ফাঁক হয়ে গেল। কে একজন হেসে বললে, পাগলী, মাইজী—আপলোক হঠ্ যাইয়ে—

মেয়েটি বললে, তোর বাবা মা গিয়ে পাগল হোক্ হারামজাদারা—মণিকর্ণিকায় নিয়ে যা ঠ্যাং-এ দড়ি বেঁধে, পুড়ুতে কাঠ না জুটুক—দে আমার গামছা—দে—

যে ওকে পাগলী বলেছিল সে তার পুণ্যশ্লোক পিতামাতার উদ্দেশে গালাগালি সহ্য করতে নাপেরে চোখ রাঙিয়ে বললে, এইয়ো—মু সাম্হালকে বাত বোলো—নেই তো মু মে ইটা ঘুষা দেগা—

মেয়েটির পরনে চমৎকার ফুলনপাড় মিলের শাড়ি, বর্তমানে অতি মলিন—খুব একমাথা চুল তেল ও সংস্কার অভাবে রুক্ষ ও অগোছালো অবস্থায় মুখের সামনে, চোখের সামনে, কানের পাশে পড়েছে, হাতে কাচের চুড়ি, গায়ের রং ফর্সা, মুখশ্রী একসময়ে ভালো ছিল, বর্তমানে রাগে, হিংসায়, গালাগালির নেশায় সর্বপ্রকার কোমলতা-বর্জিত, চোখের চাউনি কঠিন, কিন্তু তার মধ্যেই যেন ঈষৎ দিশাহারা ও অসহায়।

শরতের বুকের মধ্যে কেমন করে উঠল। রাজলক্ষ্মী ?গড়শিবপুরের সেই রাজলক্ষ্মী ?এরচেয়ে সে হয়তো দু-তিন বছরের ছোট—কিন্তু সেই পল্লীবালা রাজলক্ষ্মীই যেন। বাঙালির মেয়ে হিন্দুস্থানীদের হাতে এভাবে নির্যাতিতা হচ্ছে, সে দাঁড়িয়ে দেখতে পারবে এই বিশ্বনাথের মন্দিরেরপবিত্রপ্রবেশপথে ?

শরৎ সোজাসুজি গিয়ে মেয়েটির হাত ধরে বললে, তুমি বেরিয়ে এসো ভাই—আমার সঙ্গে—

মেয়েটি আগের মতো কাঁদতে কাঁদতে বললে, আমার গামছা নিয়েছে ওরা কেড়ে—আমি রাস্তায় বেরুলেই ওরা এমনি করে রোজ রোজ—তার পরেই ভিড়ের দিকে রুখে দাঁড়িয়ে বললে, দে আমার গামছা, ওঃ মুখপোড়ারা, তোদের মড়া বাঁধা ওতে হবে না—দে আমার গামছা—

ভিড় তখন শরতের অপ্রত্যাশিত ব্যবহারে কিছু অবাক হয়ে ছত্রভঙ্গ হবার উপক্রম হয়েছে। দু-একজন হি হি করে মজা দেখবার তৃপ্তিতে হেসে উঠল। শরৎ মেয়েটির হাত ধরে গলির বাইরে যত টেনে আনতে যায়, মেয়েটি ততই বার বার পিছনে ফিরে ভিড়ের উদ্দেশে রুদ্রমূর্তিতে নানা অশ্লীল ও ইতর গালাগালি বর্ষণ করে।

অবশেষে শরৎ তাকে টানতে টানতে গলির মুখে বড় রাস্তার ধারে নিয়ে এল, যেখানে মনোহারী দোকানের সামনে সে রেণুকাকে দাঁড় করিয়ে রেখে গিয়েছিল।

রেণুকা চোখে না দেখতে পেলেও গোলমাল ও গালাগালি শুনেছে; এখনো শুনছে মেয়েটির মুখে—সে ভয়ের সুরে বললে, কি, কি ভাই ?কি হয়েছে ?ও সঙ্গে কে ?

—সে কথা পরে হবে। এখন চলো ভাই ওদিকে—

মেয়েটি গালাগালি বর্ষণের পরে একটু ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল যেন। সে কাঁদো কাঁদো সুরেবলতে লাগল—আমার গামছাখানা নিয়ে গেল মুখপোড়ারা—এমন গামছাখানা—

শরৎ বললে, ভাই রেণুকা, দোকান থেকে গামছা একখানা কিনে দিই ওকে—চল তো—

মেয়েটি গালাগালি ভুলে ওর মুখের দিকে চাইলে। রেণুকা জিজ্ঞেস করলে, তোমার নাম কি ?থাকো কোথায় ?

মেয়েটি কোনো জবাব দিলে না।

গামছা কিনতে গিয়ে দোকানী বললে, একে পেলেন কোথায় মা ?

শরৎ বললে, একে চেনো ?

—প্রায়ই দেখি মা। গণেশমহল্লার পাগলী, গণেশমহল্লায় থাকে—ও লোককে বড় গালাগালি দেয় খামকা—

পাগলী রেগে বললে, দেয় ?তোর পিণ্ডি চটকায়, তোকে মণিকর্ণিকার ঘাটে শুইয়ে মুখে নুড়ো জ্বেলে দেয় হারামজাদা—

দোকানী চোখ রাঙিয়ে বললে, এই চুপ ! খবরদার—ওই দেখুন মা—

শরৎ ছেলেমানুষকে যেমন ভুলোয় তেমনি সুরে বললে, ওকি, অমন করে না ছিঃ—লোককে গালাগালি দিতে নেই।

পাগলী ধমক খেয়ে চুপ করে রইল।

—গামছা কত ?

—চোদ্দ পয়সা মা—আমার দোকানে জিনিসপত্তর নেবেন। এই রাস্তায় বাঙালি বলতে এই আমিই আছি। দশ বছরের দোকান আমার। হুগলী জেলায় বাড়ি, ম্যালেরিয়ার ভয়ে দেশে যাই নে, এই দোকানটুকু করে বাবা বিশ্বনাথের ছিচরণে পড়ে আছি—আমার নাম রামগতি নাথ। এক দামে জিনিস পাবেন মা আমার দোকানে—দরদস্তুর নেই। মেড়োদের দোকানে যাবেন না, ওরা ছুরি শানিয়ে বসে আছে। বাঙালি দেখলেই গলায় বসিয়ে দেবে। এই গামছাখানা মেড়োর দোকানে কিনতে যান—চার আনার কম নেবে না।

দোকানীর দীর্ঘ বক্তৃতা শরৎ গামছা হাতে দাঁড়িয়ে একমনে শুনলে, যেন না শুনলে দোকানীরপ্রতি নিষ্ঠুরতা ও অশৌজন্য দেখানো হবে। তার পর আবার রাস্তায় উঠে পাগলীকে বললে, এই নেও বাছা গামছা—পছন্দ হয়েছে ?

পাগলী সে কথার কোনো জবাব না দিয়ে বললে, খিদে পেয়েছে—

শরৎ বললে, কি করি রেণু, ছ'টা পয়সা সম্বল, তাতেই যা হয় কিনে খাগে—

রেণুকা বললে, আমার হাঁড়িতে বোধ হয় ভাত আছে।

—তাই দেখি গে চলো—

পাগলীকে ভাত দেওয়া হল, কতক ভাত সে ছড়ালে, কতক ভাত ইচ্ছে করে ধুলোতে মাটিতে ফেলে তাই আবার তুলে তুলে খেতে লাগল, অর্ধেক খেলে ভাত, অর্ধেক খেলে ধুলোমাটি।

শরতের চোখে জল এসে পড়ে। মনে ভাবলে—আহা অল্প বয়েস, কি পোড়া কপাল দেখো একবার ! মুখের ভাত দুটো খেলেও না—

বললে, ভাত ফেলছিস্ কেন ?থালায় তুলে নে মা—অমন করে না—

ঠিক সেই সময় রাজপথে সম্ভবত কোনো বিবাহের শোভাযাত্রা বাজনা বাজিয়ে ও কলরব করতে করতে চলেছে শোনা গেল। শরৎ তাড়াতাড়ি সদর দরজার কাছে ছুটে এসে দেখতে গেল, এসব বিষয়ে তার কৌতূহল এখনো পল্লীবালিকার মতোই সজীব।

সঙ্গে সঙ্গে পাগলীও ভাতের থালা ফেলে উঠে ছুটে গেল শরৎকে ঠেলে একেবারে সদর রাস্তায়—

শরৎ ফিরে এসে বললে, ওমা, একি কাণ্ড, ভাত তো খেলেই না, গামছাখানা পর্যন্ত ফেলে গেল !

অনেকক্ষণ অপেক্ষা করেও পাগলীর আর দেখা পাওয়া গেল না।

দশ

পরদিন শরৎ আবার খোকাদের বাড়ি ধ্রুবেশ্বরের গলিতে গিয়ে হাজির, সঙ্গে পটলের বউ।

খোকার মা বললেন, দু-দিন আসনি ভাই, খোকা 'মাসিমা মাসিমা' বলে গেল।

খোকার জন্যে আজ সে এসেছে শুধু হাতে, কারণ পাগলীকে পয়সা দেবার পরে ওর হাতে আর পয়সা নেই। মিনুর কাকিমার কাছে বার বার চাইতে লজ্জা করে।

খোকা শরতের কোল ছাড়তে চায় না।

শরৎ যখন এদের বাড়ি আসে, যেন কোনো নূতন জীবনের আলো, আনন্দের আলোর মধ্যে ডুবে যায়। আবার যখন মিনুর কাকিমাদের বাড়ি যায়, তখন জীবনের কোন্ আলো-আনন্দহীন অন্ধকার রন্ধ্রপথে ঢুকে যায়, দূরদিকচক্রবালে উদার আলোকোজ্জ্বল প্রসার সেখান থেকে চোখে পড়ে না।

খোকা বলে, এসো, মাছীমা—খেলা করি—

খোকার আছে দুটো রবারের বল, একটা কাঠের ভাঙা বাক্স, তার মধ্যে 'মেকানো' খেলার সাজ-সরঞ্জাম। শেষোক্ত জিনিসটা ছিল খোকার দাদার, এখন সে বড় হয়ে তার ত্যক্ত সম্পত্তি ছোট ভাইকে দিয়ে দিয়েছে।

খোকা বলে, সাজিয়ে দাও মাছীমা।

শরৎ জীবনে 'মেকানো'র বাক্স দেখেনি, কল্পনাও করেনি। সে সাজাতে পারে না। খোকাও কিছু জানে না, দুজনে মিলে হেলাগোছা করে একটা অদ্ভুত কিছু তৈরি করলে।

খোকার মা শরতের জন্যে খাবার করে খেতে ডাকলেন।

শরৎ বললে, আমি কিছু খাব না দিদি—

—তা বললে হয় না ভাই, খোকার মাসিমা যখন হয়েছ, কিছু মুখে না দিয়ে—

—রোজ রোজ এলে যদি খাওয়ান তা হলে আসি কি করে ?

—খোকনকে তুমি বড় হলে খাইও ভাই। শোধ দিয়ো তখন না হয়—

বক্‌সীদের বড় বউ খবর পেয়ে এসে শরতের সঙ্গে অনেকক্ষণ গল্প করলে।

সে বললে, কি ভালো লেগেছে ভাই তোমাকে, তুমি এসেছ শুনে ছুটে এলাম—একটা কথা বলবে ?

—কি, বলুন ?

—তোমার বাপের বাড়ি কোথায় ভাই ?

—গড়শিবপুর, যশোর জেলায়।

—শ্বশুরবাড়ি ?

—বাপের বাড়ির কাছেই—

—বাবা-মা আছেন ?

শরৎ চুপ করে রইল। দু চোখ বেয়ে টস্-টস্ করে জল গড়িয়ে পড়ল বাবার কথা মনে পড়াতে। সে তাড়াতাড়ি চোখের জল আঁচল দিয়ে মুছে নিয়ে বললে, ওসব কথা জিজ্ঞেস করবেন না দিদি—

বক্‌সীদের বউ বুদ্ধিমতী, এ বিষয়ে আর কিছু জিজ্ঞেস করলেন না তখন। কিছুক্ষণ অন্য কথার পরে শরৎ যখন ওদের কাছে বিদায় নিয়ে চলে আসছে, তখন ওকে আড়ালে ডেকে বললে, আমি তোমাকে কোনো কথা

জিজ্ঞেস করতে চাই নে ভাই—কিন্তু আমার দ্বারা যদি তোমার কোনো উপকার হয়, জানিও—তা যে করে হয় করব। তোমাকে যে কি চোখে দেখেছি !

শরৎ অশ্রুভারনত চোখে বললে, আমার ভালো কেউ করতে পারবে না দিদি। যদি এখন বাবা বিশ্বনাথ তাঁর চরণে স্থান দেন, তবে সব জ্বালা জুড়িয়ে যায়।

—তুমি সাধারণ ঘরের মেয়ে নও কিন্তু—

—খুব সাধারণ ঘরের মেয়ে দিদি। ভালোবাসেন তাই অন্যরকম ভাবেন। আচ্ছা এখন আসি।

—আবার এসো খুব শিগ্‌গির—

শরৎ ও পটলের বউ পথ দিয়ে চলে আসতে আসতে সেদিনকার সেই পাগলীর সঙ্গে দেখা। সে রাস্তার ধারে একখানা ছেঁড়া কাপড় পেতে বসেছে জাঁকিয়ে—আর যে পথ দিয়ে যাচ্ছে তাকেই বলছে—একটা পয়সা দিয়ে যাও না ?

শরৎ বললে, আহা, সেদিন ওর কিছু খাওয়া হয়নি, পয়সা আছে কাছে ভাই ?

পটলের বউ বললে, পাঁচটা পয়সা আছে—

—ওকে কিছু খাবার কিনে দিই—এসো।

নিকটবর্তী একটা দোকান থেকে ওরা কিছু খাবার কিনে নিয়ে ঠোঙাটা পাগলীর সামনে রেখে দিয়ে বললে, এই নাও খাও—

পাগলী ওদের মুখের দিকে চেয়ে কোনো কথা না বলে খাবারগুলো গোগ্রাসে খেয়ে বললে—আরো দাও—

শরৎ বললে, আজ আর নেই—কাল এখানে বসে থেকো বিকেলে এমনি সময়, কাল দেব।

পটলের বউ বললে, ভাই, আমাদের বাড়ি থেকে দুটো রেঁধে নিয়ে এসে দেব কাল ?

—বেশ এনো। আমি একটু তরকারি এনে দেব। আমার যে ভাই কোনো কিছু করবার জো নেই—তা হলে আমার ইচ্ছে করে ওকে বাড়ি নিয়ে গিয়ে ভালো করে পেটভরে খাওয়াই। দুঃখ-কষ্টের মর্ম নিজে না বুঝলে অপরের দুঃখ বোঝা যায় না। বাঙালির মেয়ে কত দুঃখে পড়ে আজ ওর এ দশা—তা এক ভগবান ছাড়া আর কেউ বলতে পারে না। আমিও কোনোদিন ওই রকম না হই ভাই—

—বালাই ষাট, তুমি কেন অমন হতে যাবে ভাই ?...ধরো, আমার হাত ধরো ভাই, বড্ড উঁচু-নীচু—

এই অন্ধ পটলের বউ—এর ওপরও এমন মায়া হয় শরতের ! কে আছে এর জগতে, কেউ নেই পটল ছাড়া। আজ যদি, ভগবান না করুন, পটলের কোনো ভালোমন্দ হয়, তবে কাল এই নিঃসহায় অন্ধ মেয়েটি দাঁড়ায় কোথায় ?

আবার ওই রাস্তার ধারের পাগলীর কথা মনে পড়ে।

জগতে যে এত দুঃখ, ব্যথা, কষ্ট আছে, শরৎ সেসবের কিছু খবর রাখত না। গড়শিবপুরের নিভৃত বনবিতান শ্যামল আবরণের সংকীর্ণ গণ্ডী টেনে ওকে স্নেহেযত্নে মানুষ করেছিল— বহির্জগতের সংবাদ সেখানে গিয়ে কোনোদিনও পৌঁছোয়নি।

শরৎ জগৎটাকে যে রকম ভাবত, আসলে এটা সে রকম নয়। এখন তার চোখ ফুটেছে, জীবনে এত মর্মান্তিক দুঃখের মধ্যে দিয়েই, তবে যে উদার দৃষ্টি লাভ হয়েছে তার—এক-একদিন গঙ্গার ঘাটে চুপ করে বসে থাকতে থাকতে শরতের মনে ওঠে এসব কথা।

আগেকার গড়শিবপুরের সে শরৎ আর সে নেই—সেটা খুব ভালো করেই বোঝে। সে শরৎ ছিল মনেপ্রাণে বালিকা মাত্র। বয়স হয়েছিল যদিও তার ছাব্বিশ—দৃষ্টি ছিল রাজলক্ষ্মীর মতোই, সংসারের কিছু বুঝত না, জানত না। সব লোককে ভাবত ভালো, সব লোককে ভাবত তাদের হিতৈষী।

সেই বালিকা শরতের কথা ভাবলে এ শরতের এখন হাসি পায়।

শরৎ মনে এখন যথেষ্ট বল পেয়েছে। কলকাতা থেকে আজ এসেছে প্রায় দেড় বছর, যে ধরনের উদ্‌ভ্রান্ত, ভীরু মন নিয়ে দিশেহারা অবস্থায় পালিয়ে এসেছিল কলকাতা থেকে—এখন সে মন যথেষ্ট বল সঞ্চয় করেছে। দুনিয়াটা যে এত বড়, বিস্তৃত—সেখানে যে এত ধরনের লোক বাস করে, তার চেয়েও কত বেশি দুঃখী অসহায়, নিরাবলম্ব লোক যে তার মধ্যে রয়েছে, এই সব জ্ঞানই তাকে বল দিয়েছে।

সে আর কি বিপদে পড়েছে,তার চেয়েও শতগুণে দুঃখিনী ওই গণেশ-মহল্লার পাগলী, এই অন্ধ পটলের বউ। এই কাশীতে সেদিন সে এক বুড়িকে দেখেছে দশাশ্বমেধ ঘাটে, বয়স তার প্রায় সত্তর-বাহাত্তর, মাজা ভেঙে গিয়েছে, বাংলাদেশে বাড়ি ছিল, হাওড়া জেলার কোন্ এক পাড়াগেঁয়ে। কেউ নেই বুড়ির, অনেকদিন থেকে কাশীতে আছে, ছত্রে ছত্রে খেয়ে বেড়ায়।

সেদিন শরৎকে বললে, মা,তুমি থাকো কোথায় গো ?

—কাছেই ! কেন বলুন তো ?

—তোমরা ?

—ব্রাহ্মণ।

—আমায় দুটো ভাত দেবে একদিন ?

—আমার সে সুবিধে নেই মা। আমি পরের বাড়ি থাকি। আপনার মতো অবস্থা। কেন, আপনি খান কোথায় ?

—পুঁটের ছত্তরে খেতাম, সে অনেকদূর। অত দূর আর হাঁটতে পারি নে—আজকাল আবার নিয়ম করেছে একদিন অন্তর মাদ্রাজীদের ছত্তরে ডালভাত দেয়। তা সে সব তরকারি নারকোল তেলে রান্না মা, আমাদের মুখে ভালো লাগে না। আজ এক জায়গায় ভোজ দেবে, সেখানে যাব—ওই পাঁড়েদের ধর্মশালায়—চলো না, যাবে মা ?

—কতদূর ?

—বেশি দূর নয়। এক হিন্দুস্থানী বড়লোক কাশীতে তীর্থধর্ম করতে এসেছে মা। লোকজন খাওয়াবে—আমাদের সব নেমন্তন্ন করেছে। চলো না ?

—না মা, আমি যাব না।

—এতে কোনো লজ্জা নেই, অবস্থা খারাপ হলে মা সব রকম করতে হয়। আমারও দেশে গোলাপালা ছেল, দুই ছেলে হাতির মতো। তারা থাকলে আজ আমার বের্দ্ধ বয়েসে কি এ দশা হয় ?

বুড়ির চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল।

শরৎ ভাবলে, দেখেই আসি, খাব না তো—যা জিনিস দেবে, নিয়ে এসে পাগলীকে কি পটলের বউকে দিয়ে দেব।

তাই সেদিন সে মনোমোহন পাঁড়ের ধর্মশালায় গেল বুড়ির সঙ্গে। ধর্মশালার বিস্তৃত প্রাঙ্গণে অনেক বৃদ্ধ বাঙালি ও হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণ জড়ো হয়েছে—মেয়েমানুষও সেখানে এসেছে, তবে সংখ্যা খুব বেশি নয়।

যারা ভোজ দিচ্ছে তারা বাংলা জানে না—হিন্দিতে কথাবার্তা কি বলে, শরৎ ভালো বুঝতে পারে না। তারা খুব বড়লোক, দেখেই মনে হল। শরৎকে দেখে আলাদা ডেকে তাদের একটি বউ বললে, তুমি কি আলাদা বসে খাবে, মাইজি ?

—না মা—আমি নিয়ে যাব।

—বাড়িতে লেড়কালেড়কি আছে বুঝি ?

শরৎ মৃদু হেসে বললে, না।

—আচ্ছা বেশ নিয়ে যাও—এখানে থাকো কোথায় ?

—একজনদের বাড়ি। রান্না করি।

—বাঙালি রান্না করো ?

—হ্যাঁ মা।

একটু পরে ভোজের বন্দোবস্ত হল। অন্য কিছু নয়, শুধু হালুয়া, তিল তেলে রান্না। প্রকাণ্ড চাদরের কড়াইয়ে প্রায় দশ সের সুজি, দশ সের চিনি—আর ছোট টিনের একটিন তিল তেল ঢেলে হালুয়া তৈরি হচ্ছে, শরৎকে ডেকে নিয়ে গিয়ে হিন্দুস্থানী বউটি সব দেখালে। অভ্যাগত দরিদ্র নরনারীদের বসিয়ে পেটভরে সেই হালুয়া খাওয়ানো হল—যাবার সময় দু-আনা করে মাথাপিছু ভোজনদক্ষিণাও দেওয়া হল। শরৎকে কিন্তু একটা পুঁটুলিতে হালুয়া ছাড়া পুরী ও লাড্ডু অনেক করে দিলে ওরা।

খাবারগুলো পুঁটুলি বেঁধে নিয়ে এসে শরৎ পটলের বউকে দিয়ে দিলে। বললে, আজ আর পাগলীর দেখা নেই ! আজ খেতে পেত, আজই নিরুদ্দেশ।

পটলের বউ বললে, পাগলীর জন্যে রেখে দেব দিদি ?

—কেন মিথ্যে বাসি করে খাবে ?কাল যে আসবে তারই বা মানে কি আছে ?খাও তোমরা।

—তুমি খাবে না ?

—আমি খাব না, সে তুমি জানো। ওরা কি জাত তার ঠিক নেই, ওদের হাতে রান্না—

—কাশীতে আবার জাতের বিচার—

—কেন, কাশী তো জগন্নাথ ক্ষেত্তর না, সেখানে নাকি জাতের বিচার নেই—

এমন সময় ওপর থেকে ঝি এসে বললে—ওগো বামুনঠাকরুন, মা ডাকছেন—

ওপরে যেতেই মিনুর কাকিমা এক তুমুল কাণ্ড বাঁধিয়ে দিল। মোগলসরাই থেকে তার ভাইপোরা এসেছে, রাত আটটার গাড়িতে চলে যাবে, অথচ বাম্‌নীর দেখা নেই, মাইনে যাকে দিতে হচ্ছে সে সব সময় বাড়ি থাকবে ! বিধবা মানুষের আবার অত শখের বেড়ানো কিসের, এতদিন কোনো কৈফিয়ৎ চাওয়া হয়নি শরতের গতিবিধির, কিন্তু ব্যাপার ক্রমশ যে-রকম দাঁড়াচ্ছে, তাতে কৈফিয়ৎ না নিলে চলে না !

শরৎ বললে, আমি তো জানতাম না ওঁরা আসবেন। আমি আটটার অনেক আগে খাইয়ে দিচ্ছি—

—তুমি রোজ রোজ যাও কোথায় ?

—পটলের বউয়ের সঙ্গে তো যাই—

—কোথায় যাও ?

—৬নম্বর ধ্রুবেশ্বরের গলি। হরিবাবু বলে এক ভদ্রলোকের বাড়ি—

—সেখানে কেন ?

—পটলের বউ বেড়াতে নিয়ে যায়। ওদের জানাশুনো।

—আজ কোথায় গিয়েছিলে ?

—একটা ধর্মশালা দেখতে।

—ওসব চলবে না বলে দিচ্ছি—কোথাও বেরুতে পারবে না কাল থেকে। ডুবে ডুবে জল খাও, আমি সব টের পাই। একশো বার করে কর্তাকে বললাম পটলদের তাড়াও নীচের ঘর থেকে-এগারো টাকার জায়গায় এখুনি পনেরো টাকা ভাড়া পাওয়া যায়। তা কর্তার কোনো কথা কানে যাবে না—পটলের বউয়ের স্বভাবচরিত্র আমার ভালো ঠেকে না—

বেচারি অন্ধ পটলের বউ, তার নামে মিথ্যে অপবাদ শরতের সহ্য হল না। সে বললে, আমার নামে যা হয় বলুন, সে বেচারি অন্ধ, তাকে কেন বলেন ?আমায় না রাখেন, কাল সকালেই আমি চলে যাব—

—বেশ যাও। কাল সকালেই চলে যাবে—

শরৎ নির্বিকার-চিত্তে রান্নাবান্না করে গেল। লোকজনকে খাইয়ে দিলে। রাত ন'টার পরে মিনুর কাকিমা বললে, তোমার কি থাকবার ইচ্ছে নেই নাকি ?

—আপনিই তো থাকতে দিচ্ছেন না। পটলের বউয়ের নামে অমন বললেন কেন ?আমি মিশি বলে সে বেচারিও খারাপ হয়ে গেল ?

—তোমার বড্ড তেজ—কাশী শহরে কেউ জায়গা দেবে না। সে কথা ভুলে যাও—

—আমার কারো আশ্রয়ে যাওয়ার দরকার নেই। বিশ্বেশ্বর স্থান দেবেন। আমি আপনাদের বাড়ি থাকতে পারব না, সকালে উঠেই চলে যাব, যদি বলেন তো রেঁধে দিয়ে যাব, নয়তো খোকাদের খাওয়ার কষ্ট হবে।

রাত্রে বাড়ি ফিরে মিনুর কাকা সব শুনলেন। এই রাত্রেই তিনি শরৎকে ডেকে বললেন, তুমি কোথাও যেতে পারবে না বামুন-ঠাকরুন। ও যা বলেছে, কিছু মনে কোরো না।

শরৎ মিনুর কাকার সামনে বেরোয় না, কথাও বলে না। ঝিকে দিয়ে বললে, তিনি যদি যেতে বারণ করেন, তবে সে কোথাও যাবে না। কারণ গৌরী-মা তাকে যাঁর হাতে সঁপে দিয়েছিলেন—তাঁর অর্থাৎ মিনুর মা'র বিনা অনুমতিতে সে এ সংসার ছেড়ে যেতে পারবে না।

আরো দিন পনেরো কেটে গেল। একদিন বিশ্বেশ্বরের গলির মুখে সেই বুড়ির সঙ্গে আবার দেখা। বুড়ি বললে, কি গা, যাচ্ছ কোথায় ?কোন্ ছত্তরে ?

শরৎ অবাক হয়ে বললে, আমি ছত্তরে খাই নে তো ?আমি লোকের বাড়ি থাকি যে।

—চলো, আজ কুচবিহারের কালীবাড়িতে খুব কাণ্ড, সেখানে যাই। নাটকোটার ছত্তর চেনো ?

—না মা, আমি কোথাও যাইনি—

—চলো আজ সব দেখিয়ে আনি—

সারা বিকেল তিন-চারটি বড় বড় ছত্রে শরৎ কাঙালীভোজন, ব্রাহ্মণভোজন দেখে বেড়াল। বাঙালিটোলা ছাড়িয়ে অনেক দূর পর্যন্ত পাঁচিল দিয়ে ঘেরা বিরাট কালীবাড়ি ও ছত্র কুচবিহার মহারাজের। কালীমন্দিরের দেওয়ালে কত রকমের অস্ত্রশস্ত্র, কি চমৎকার বন্দোবস্ত অনাহূত রবাহূত গরিব, নিরন্ন সেবার ! মেয়েদের জন্যে খাওয়ানোর আলাদা জায়গা, পুরুষদের আলাদা, ব্রাহ্মণদের আলাদা। এত অকুণ্ঠ অন্নদান সে কখনো কল্পনাও করতে পারেনি।

শরৎ বললে,হ্যাঁ মা, এখানে যে আসে তাকেই খেতে দেয় ?

—কুচবিহারের কালীবাড়িতে তা দেয় গো। তবুও আজকাল কড়াকড়ি করেছে। হবে না কেন, বাঙাল দেশ থেকে লোক এসে সব নষ্ট করে দিয়েছে।

—আমি নিজে যে বাঙাল—হ্যাঁ মা—

শরৎ কথা বলেই হেসে ফেললে। বুড়ি কিছুমাত্র অপ্রতিভ না হয়ে বললে, হ্যাঁগো, বাঙাল না ছাই, তোমার কথায় বুঝি বোঝা যায় কিছু, চলো চলো—নাটকোটার ছত্তর দেখিয়ে আনি—

নাটকোটার ছত্রে যখন ওরা গেল, তখন সেখানকার খাওয়া-দাওয়া শেষ। বাইরের গরিব লোকেরা ভাত নিয়ে যাচ্ছে কেউ কেউ।

শরৎ বললে, এ কাদের ছত্র মা ?

—তৈলিঙ্গিদের ছত্তর। এখানে খেতে এসেছিলুম একদিন, ডালে যত বা টক্, তত বা লঙ্কা। সে মা আমাদের পোষায় না। তুণ্ডুমুণ্ডুদের পোষায়, ওদের মুখে কি সোয়াদ আছে মা ?

শরৎ হেসে কুটি কুটি। বললে, তুণ্ডুমুণ্ডু কারা মা ?

—আরে ওই তৈলিঙ্গিদের কথাবার্তা শোনোনি ?তুণ্ডুমুণ্ডু না কি সব বলে না ?

—আমি কখনো শুনিনি। আমায় একদিন শোনাবেন তো !

—একদিন খাওয়া-দাওয়ার সময় নাটকোটার ছত্তরে নিয়ে আসব—দেখতে পাবে—

—আর কি ছত্তর আছে ?

—এখনো রাজরাজেশ্বরী ছত্তর, পুঁটের ছত্তর, আমবেড়ে—আহিল্যেবাই—

—সব দেখব মা, আজ সব দেখে আসব—

সমস্ত ঘুরে শেষ করতে ওদের প্রায় সন্ধ্যা হয়ে গেল। বুড়ি বললে, কাশীতে ভাতের ভাবনা নেই, অন্নপুন্নো মা দু-হাতে অন্ন বিলিয়ে যাচ্ছেন—

শরৎ বাসায় ফিরে এসে ভীষণ অন্যমনস্ক হয়ে রইল। তার সকলের চেয়ে ভালো লেগেছে কাশীর এই অন্নদান। এমন একটা ব্যাপারের কথা সত্যিই সে জানত না। ডাল-ভাত উনুনে চাপিয়ে দিয়ে সে শুধু ভাবে ওই কথাটা। তার আর কিছু ভালো লাগে না। কাল সকাল সকাল এদের খাইয়ে-দাইয়ে দিয়ে সে আবার বেরুবে ছত্র দেখতে। ছত্রে খাওয়ানোর দৃশ্য সে মাত্র দেখলে কুচবিহারের কালীবাড়িতে। অন্য ছত্রে যখন গিয়েছিল তখন সেখানকার খাওয়ানো বন্ধ হয়ে গিয়েছে। সে দেখতে চায় দুচোখ ভরে এই বিরাট অন্নব্যয়, অকুণ্ঠ সদাব্রত—যেখানে গণেশমহল্লার পাগলীর মতো, ওই অন্ধ রেণুকার মতো, তার নিজের মতো, ওই সত্তর বছরের মাজা-ভাঙা বুড়ির মতো—নিরন্ন, নিঃসহায় মানুষকে দুবেলা খেতে দিচ্ছে। ওই দেখতে তার খুব ভালো লাগে—খুব—খুব ভালো লাগে—ওই সব ছত্রেই বিশ্বেশ্বর ও অন্নপূর্ণা প্রত্যক্ষ বিরাজ করেন বুভুক্ষু অভাজনদের ভোজনের সময়—মন্দিরে তাদের দেখার চেয়েও সে দেখা ভালো। অনেক অনেক ভালো।

ঝি এসে বলে, ও বামুন-ঠাকরুন, মাছের ঝোল দিয়ে বাবুকে আগে ভাত দিতে হবে।খেয়ে এখুনি বেরিয়ে যাবেন—

—ও ঝি, শোনো—পাঁচফোড়ন মোটে নেই, বাজার থেকে আগে এনে দাও—

ঝি চলে যায়। মাছের ঝোল ফোটে। নিভৃত রান্নাঘরের কোণে গোলমাল নেই—বসে শরৎ স্বপ্ন দেখে, সে প্রকাণ্ড ছত্র খুলেছে, কেদার ছত্র, বাবার নামে। কত লোক এসে খাচ্ছে—অবারিত দ্বার। বাবার ছত্র থেকে কোনো লোক ফিরবে না, অনাহারে কেউ ফিরে যাবে না। সে নিজে দেখবে শুনবে—সকলকে খাওয়াবে। সে দু-হাতে অন্নদান করবে। সকলকেই—ব্রাহ্মণ-শূদ্র নেই, তুণ্ডুমুণ্ডু নেই, বাঙাল-ঘটি নেই—সকলেই হবে তার পরম সম্মানিত অতিথি। নিজে দাঁড়িয়ে থেকে সবাইকে খাওয়াবে সে।

শরতের মাথার মধ্যে কি যেন নেশা জমেছে।...

রান্নাবান্না সেরে সে মিনুর কাকিমাকে বলল, আজ একবারটি বাইরে যাব ?

—কোথায় ?

শরৎ হঠাৎ সলজ্জ হেসে বললে—সে বলব এখন এসে।

শরতের হাসি দেখে মিনুর কাকিমার মনে সন্দেহ হল। সে বললে, কোথায় যাচ্ছ না বললে চলে ?সব জায়গায় যেতে দিতে পারি কি ?রাগ করলে তো চলে না—বুঝে দেখতে হয়।

—ছত্তর দেখতে। রাজরাজেশ্বরীর ছত্তরে অনেক বেলায় খাওয়া-দাওয়া হয়, পুঁটের ছত্তরেও হয়—দেখে আসি একটিবার—

মিনুর কাকিমা শরতের মনের উত্তাল উদ্বেল সমুদ্রের কোনো খবর রাখে না—সেবা ও অন্নদানের যে বিরাট আকুতি ও আগ্রহ, তার কোনো খবর রাখে না—বললে, কেন, ছত্তর দেখতে কেন ?সে আবার কি ?

—দেখিনি কখনো। যেতে দিন আজ আমায়—

শরতের কণ্ঠে সাগ্রহ মিনতির সুরে মিনুর কাকিমা ছুটি দিতে বাধ্য হল, তবে হয়তো শরতের কথা সে আদৌ বিশ্বাস করলে না।

শরৎ এসে বললে, ও রেণু পোড়ারমুখী—কি হচ্ছে ?

—ও, আজ যেন খুব ফুর্তি, তোমার কি হয়েছে শুনি ?

—কি আবার হবে, তোর মুণ্ডু হবে ! চল্ ছত্তরে যাই, খাওয়া দেখে আসি।

রেণু অবাক হয়ে বললে, কেন ?

—কেন, তোর মাথা ! আমি যে কাশীতে ছত্তর খুলছি, জানিস্ নে ?

—বেশ তো ভাই। আমাদের মতো গরিব লোকে তাহলে বেঁচে যায়। দু-বেলা তোমার ছত্তরে পেট ভরে দুটো খেয়ে আসি। হাঁড়ি-হেঁশেলের পাট উঠিয়ে দিই। কি নাম হবে, শরৎসুন্দরী ছত্র ?

—না ভাই, বাবার নামে কেদার ছত্তর। কেমন নাম হবে বল্ তো ?

—যাই বলো ভাই, শরৎসুন্দরী ছত্র শুনতে যেমন, তেমনটি কিন্তু হল না।

রাজরাজেশ্বরী ছত্রে ওরা যেতেই ছত্রের লোকে জিজ্ঞেস করলে—আপনারা আসুন, মেয়েদের জন্যে আলাদা বন্দোবস্ত আছে—

শরৎ বললে, চল ভাই রেণু, দেখি গে—

—যদি খেতে বলে ?

—জোর করে খাওয়াবে না কেউ, তুমি চলো।

মেয়েদের মধ্যে সবাই বুড়ো-হাবড়া, এক আধ জন অল্পবয়সি মেয়েও আছে—কিন্তু তারা এসেছে বুড়িদের সঙ্গে কেউ নাতনী, কেউ মেয়ে সেজে। বুড়িরা বড় ঝগড়াটে, পাতা আর জলের ঘটি নিয়ে নিজেদের মধ্যে ঝগড়া বাধিয়েছে। শরৎ বললে, মা বসুন, আমি জল দিচ্ছি আপনাদের—

একজন জিজ্ঞেস করলে—তুমি কি জেতের মেয়ে গা ?

—বামুনের মেয়ে, মা।

—কাশীতে এলে সবাই বামুন হয়। কোথায় থাকো তুমি ?

—বাঙালিটোলায় থাকি মা—কিছু ভাববেন না আপনি।

ছত্রের পরিবেশনকারিণী একটি মধ্যবয়স্কা মেয়ে শরৎকে বললে, তোমরা বসছ না বাছা ?

—আমি খাব না মা।

সে অবাক হয়ে বললে, তবে এখানে কেন এসেছ ?

—দেখতে।

রেণুকা বললে, উনি বড়লোকর মেয়ে, ছত্তর খুলবেন কাশীতে—তাই দেখতে এসেছেন কি রকম খাওয়া-দাওয়া হয়।

এক মুহূর্তে যে-সব বুড়ি খেতে বসেছে এবং যারা পরিবেশন ও দেখাশুনো করছে, সকলেরই ধরন বদলে গেল। যে বুড়ি শরতের জাতি-বর্ণের প্রশ্ন তুলেছিল, সে-ই সকলের আগে একগাল হেসে বললে, সে চেহারা দেখেই আমি ধরেছি মা, চেহারা দেখেই ধরেছি। আগুন কি ছাইচাপা থাকে ?তা দ্যাখো রানীমা, একটা দরখাস্ত দিয়ে রাখি। আমার এই নাতনী, অল্পবয়সেকপাল পুড়েছে, কেউ নেই আমাদের। আপনার ছত্তর খুললে এর দুটো বন্দোবস্ত যেন সেখানে হয়। ভগবান আপনার ভালো করবেন। কুচবেহার কালীবাড়িতেও আমাদের নাম লেখানো আছে মাসে পনেরো দিন। বাকি পনেরো দিন আমবেড়েয় আর এই ছত্তরে—

আর চার-পাঁচজন নিজেদের দুরবস্থা সবিস্তারে এবং নানা অলঙ্কার দিয়ে বর্ণনা করছে, এমন সময় পায়েস এসে হাজির হল। একটা ছোট পিতলের গামলার এক গামলা পায়েস, খেতে বসেছে প্রায় জন ত্রিশ-বত্রিশ, বেশি করে কাউকে দেওয়া সম্ভব নয়—অথচ প্রত্যেকেই নির্লজ্জভাবে অনুযোগ করতে লাগল তার পাতে পায়েস কেন অতটুকু দেওয়া হল, রোজই তো পায়েস কম পায়, তাকে আজ একটু বেশি করে দেওয়া হোক্। কেউ কেউ ঝগড়াও আরম্ভ করলে পরিবেশনকারিণীর সঙ্গে।

শরৎ রেণুকাকে নিয়ে বাইরে চলে এল। বললে, কেন ওরকম বললি ?ছিঃ—ওরা সবাইগরিব, ওদের লোভ দেখাতে নেই।

তার পর অন্যমনস্কভাবে বললে, ইচ্ছে করে ওদের খুব করে পায়েস খাওয়াই। আহা, খেতে পায় না, ওদের দোষ নেই—ছত্তরে বন্দোবস্ত ঠিকই আছে, একটু পায়েস দেয়, একটু ঘি দেয়—তবে ছিটেফোঁটা।

রেণুকা বললে, বাবা, বুড়িগুলো একটু পায়েসের জন্যে কি রকম আরম্ভ করে দিয়েছে বল্ তো ?খাচ্ছিস পরের দয়ায়—আবার ঝগড়া ! ভিক্ষের চাল কাঁড়া-আঁকাড়া।

—আহা ভাই— কত দুঃখে যে ওরা এমন হয়েছে তা তুমি আমি কি জানি ?মানুষে কি সহজে লজ্জাশরম খোয়ায় ?ওদের বড় দুঃখ। সত্যি ভাই, আমার ইচ্ছে করছে, আজ যদি আমার ক্ষমতা থাকত, বাবার নামে ছত্তর দিতাম। আর তাতে নিজের হাতে বড় কড়ায় পায়েস রেঁধে ওদের খাওয়াতাম। সেদিন যেমন কড়ায় হালুয়া রেঁধে দিল সেই ছত্তরটা—তুই দেখিস্নি—চাদরের মস্ত বড়কড়া।

—নে চল্ আমার হাত ধর্—

—ওই পাগলীকে নিজের হাতে রেঁধে একদিন পেটভরে খাওয়াব। তোর বাড়িতে—

—বেশ তো।

—আমি মাইনে বলে কিছু চাইলে ওরা দেবে না ?

—দেওয়া তো উচিত। তবে গিন্নিটি যে রকম ঝানু—তুমি তো ভাই মুখ ফুটে কিছু বলতে পারবে না—

—মরে গেলেও না। তবে একবার বলে দেখতে হবে। বেশি লোককে না পারি, একজনকেও তো পারি।

ওরা খানিক দূর এসেছে, ছত্রের উত্তর দিকের উঁচু রোয়াক থেকে পুরুষের দল খেয়ে নেমে আসছে, হঠাৎ তাদের মধ্যে কাকে দেখে শরৎ থমকে দাঁড়িয়ে গেল। তার মুখ দিয়ে একটা অস্ফুট শব্দ বার হল—পরক্ষণেই সে রেণুকার হাত ছেড়ে দিয়ে সেদিকে এগিয়ে চলল।

বিস্মিতা রেণুকা বললে, কোথায় চললে ভাই ?কি হল ?

পুরুষের ভিড়ের মধ্যে এঁটোহাতে নেমে আসছেন সেই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, তিন বৎসর আগে যিনি পদব্রজে দেশভ্রমণে বেরিয়ে গড়শিবপুরে শরৎদের বাড়ির অতিথিশালায় কয়েকদিন ছিলেন।

শরৎ চেয়ে চেয়ে দেখলে। কোনো ভুল নেই—তিনিই। সেই গোপেশ্বর চট্টোপাধ্যায়।

সে প্রথমটা একটু ইতস্তত করছিল—কিন্তু তখনি দ্বিধা ও সঙ্কোচ ছেড়ে কাছে গিয়ে বললে, ও জ্যাঠামশাই ?চিনতে পারেন ?

সেই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণই বটে। শরতের দিকে অল্পক্ষণ হাঁ করে চেয়ে থেকে তিনি আগ্রহ ও বিস্ময়ের সুরে বললেন—মা, তুমি এখানে ?

—হ্যাঁ জ্যাঠামশাই, আমি এখানেই আছি—

—কতদিন এসেছ ?রাজামশায় কোথায় ?তোমার বাবা ?

—তিনি—তিনি দেশে। সব কথা বলছি, আসুন আমার সঙ্গে। আমার সঙ্গে একটি মেয়ে আছে—ওকে ডেকে নিই। আপনি হাতমুখ ধুয়ে নিন জ্যাঠামশায়।

পথে বেরিয়েই গোপেশ্বর চাটুজ্যে বললেন—তারপর মা, তুমি এখানে কবে এসেছ ?আছ কোথায় ?

—সব বলব। আপনি আগে বসুন, আপনি কবে এসেছেন ?

—আমি সেই তোমাদের ওখান থেকে বেরিয়ে আরো দু-এক জায়গায় বেড়িয়ে বাড়ি যাই। বাড়িতে তো ছেলের বউ আর ছেলেরা—তাদের অবস্থা ভালো না। কিছুদিন বেশ রইলাম—তার পর এই মাঘ মাসে আবার বেরিয়ে পড়লাম—একেবারে কাশী।

—হেঁটে ?

—না মা, বুড়ো বয়সে তা কি পারি ?ভিক্ষে-সিক্ষে করে কোনোমতে রেলে চেপেই এসেছি। ছত্তরে ছত্তরে খেয়ে বেড়াচ্ছি। মা অন্নপুণ্ণোর কৃপায় আমার মতো গরিব ব্রাহ্মণের দুটো ভাতের ভাবনা নেই এখানে। চলে যাচ্ছে এক রকমে। আর দেশে ফিরব না ভেবেছি মা।

রেণুকাকে বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে শরৎ বললে, চলুন জ্যাঠামশায়, দশাশ্বমেধ ঘাটে গিয়ে বসি।

দুজনে গিয়ে দশাশ্বমেধ ঘাটের রানায় বসল।

গোপেশ্বর চাটুজ্যে বললেন, তারপর মা, তোমার কথা বলো। কার সঙ্গে এসেছ কাশীতে ?ও মেয়েটি বুঝি চোখে দেখতে পায় না ?ও কেউ হয় তোমাদের ?

শরতের কোনো দ্বিধা হল না এই পিতৃসম স্নেহশীল বৃদ্ধের কাছে সব কথা খুলে বলতে। অনেক দিন পরে সে এমন একজন মানুষ পেয়েছে, যার কাছে বুকের বোঝা নামিয়ে হাল্‌কা হওয়া যায়। কথা শেষ করে সে আকুল কান্নায় ভেঙে পড়ল।

বৃদ্ধ গোপেশ্বর চাটুজ্যে সব শুনে কাঠের মতো বসে রইলেন।

এসব কি শুনছেন তিনি ?এও কি সম্ভব ?

শেষে আপন মনেই যেন বললেন, তোমার বাবা রাজামশায় তা হলে দেশেই—না ?

—তা জানি নে জ্যাঠামশায়, বাবা কোথায় তা ভেবেছিও কতবার—তবে মনে হয় দেশেই আছেন তিনি—যদি এতদিন বেঁচে থাকেন—

কান্নার বেগে আবার ওর কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হয়ে গেল।

—আচ্ছা, থাক মা, কেঁদো না। আমিও বলছি শোনো—গোপেশ্বর চাটুজ্যে যদি অভিনন্দ ঠাকুরের বংশধর হয়, তবে এই কাশীর গঙ্গাতীরে বসে দিব্যি করছি তোমাকে তোমার বাবার কাছে নিয়ে যাবোই। তুমি তৈরি হও মা—কালই রওনা হয়ে যাব বাপে-ঝিয়ে—তুমি কোন্ বাড়ি থাকো—চল দেখে যাই। তুমি কি মেয়ে, আমার তা জানতে বাকি নেই। নরাধম পাষণ্ড ছাড়া তোমার চরিত্রে কেউ সন্দেহ করতে পারে না। আমার রোগ থেকে সেবা করে তুমি বাঁচিয়ে তুলেছিলে—তা আমি ভুলিনি—আমার আর জন্মের মা-জননী তুমি। তোমায় এ অবস্থায় এখানে ফেলে গেলে আমার নরকেও স্থান হবে না যে।

এগারো

বৃদ্ধ গোপেশ্বর চাটুজ্যেকে সঙ্গে নিয়ে শরৎ ফিরল নিজের বাসায়।

বৃদ্ধ বললেন, এই বাড়ি ?বেশ। কাল তুমি তৈরি হয়ে থেকো। তোমার এই বুড়ো ছেলের সঙ্গে কাল যেতে হবে তোমায়। পয়সাকড়ি না থাকে, সেজন্যে কিছু ভেব না—ছেলের সে ক্ষমতা আছে মা-জননী।

রেণুকা এতক্ষণ কিছু বুঝতে না পেরে অবাক হয়ে গিয়েছিল, শরৎকে চুপি চুপি বললে, উনি কে ভাই ?

—আমার জ্যাঠামশাই—

—তোমাকে দেশে নিয়ে যাবেন ?

—তাই তো বলছেন।

—হঠাৎ কালই চলে যাবে কেন, এ মাসটা থেকে যাও না কাশীতে। বলো তোমার জ্যাঠামশাইকে। খোকার সঙ্গে একবার দেখাও করতে হবে তো ?আমাকে এত শিগ্‌গির ফেলে দিয়েই বা যাবে কোথায় ?

শরৎ বৃদ্ধকে জানাল। কালই যাওয়া মুশকিল হবে তার। যেখানে কাজ করছে, যারা এতদিন আশ্রয় দিয়ে রেখেছিল, তারা একটা লোক দেখে নিলে সে যাবার জন্যে তৈরি হবে।

বৃদ্ধ গোপেশ্বর চাটুজ্যে তাতে রাজী হলেন। পাঁচ দিনের সময় নিয়ে শরৎ রোজ রান্নাবান্নার পরে রেণুকাকে সঙ্গে নিয়ে খোকনদের বাড়ি যায়। কাশী থেকে কোন্ অনির্দেশ্য ভবিষ্যতের পথে সে যাত্রা শুরু করবে তা সে জানে না— কিন্তু খোকনকে ফেলে যেতে তার সব চেয়ে কষ্ট হবে তা সে এ ক'দিনে হাড়ে হাড়ে বুঝছে। খোকনের মা ওর যাবার কথা শুনে খুবই দুঃখিত।

শরৎ বলে, ও খোকন বাবা, গরিব মাসিমাকে মনে রাখবি তো বাবা ?

খোকন না বুঝেই ঘাড় নেড়ে বলে—হুঁ, তোমাকে একটা বল কিনে দেব মাসিমা—

—সত্যি ?

—হ্যাঁ মাসিমা, ঠিক দেব।

—আমায় কখনো ভুলে যাবি নে ?বড় হলে মাসিমার বাড়ি যাবি, মুড়কি নাড়ু দেব ধামি করে, পা ছড়িয়ে বসে খাবি।

খোকা ঘাড় নেড়ে বলে— হুঁ।

বক্‌সীদের বড় বউ ওর নামঠিকানা সব লিখে নিলে, খোকনের মার কাছে ওর নামঠিকানা রইল।

ফেরবার পথে শরৎ গণেশমহল্লার পাগলীর সন্ধানে ইতস্তত চাইতে লাগল, কিন্তু কোথাও তাকে দেখা গেল না। রেণুকাকে বললে, ওই একটা মনে বড় সাধ ছিল, পাগলীকে একদিন ভালো করে বেঁধে খাওয়াব—তা কিন্তু হল না। আমি মাইনে বলে কিছু চেয়ে নেব মিনুর কাকির কাছ থেকে, যদি কিছু দেয় তবে তোর কাছে রেখে যাব। আমার হয়ে তুই তাকে একদিন খাইয়ে দিস্—

রেণুকা ধরা গলায় বলে—আর আমার উপায় কি হবে বললে না যে বড় ?তোমার ছত্র কবে এসে খুলছ কাশীতে—শরৎসুন্দরী ছত্র ?গরিব লোক দুটো খেয়ে বাঁচি।

শরৎ হেসে ভঙ্গি করে ঘাড় দুলিয়ে বললে, আ তোমার মরণ ! এর মধ্যে ভুলে গেলি মুখপুড়ি ?শরৎসুন্দরী নয়, কেদার ছত্তর—

—ও ঠিক, ঠিক। জ্যাঠামশায়ের নামে ছত্র হবে যে ! ভুলে যাই ছাই—

—না হলেও তুই যাবি আমাদের দেশে। মস্ত বড় অতিথিশালা আছে। রাজারাজড়ার কাণ্ড ! সেখানে বারো মাস খাবি, রাজকন্যের সখী হয়ে—কি বলিস ?

উঃ, তা হলে তো বর্তে যাই দিদিভাই। কবে যেন যাচ্ছি তাই বলো, জোড়ে না বিজোড়ে ?

—তা কি কখনো হয় রে পোড়ারমুখী ?জোড়ের পায়রা জোড় ছাড়া করতে গিয়ে পাপের ভাগী হবে কে ?

মিনুর কাকিমাকে শরৎ বিদায়ের কথা বলতেই সে চমকে উঠল প্রায় আর কি। কেন যাবে, কোথায় যাবে, কার সঙ্গে যাবে—নানা প্রশ্নে শরৎ ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠল। তার কোনো কথাই অবিশ্যি মিনুর কাকিমার বিশ্বাস হল না। ওসব চরিত্রের লোকের কথার মধ্যে বারো আনাই মিথ্যে।

শরৎ বললে, আমায় কিছু দেবেন ?যাবার সময় খরচপত্র আছে—

—যখন তখন হুকুম করলেই কি গেরস্তর ঘরে টাকাকড়ি থাকে ?আমি এখন যদি বলি আমি দিতে পারব না ?

—দেবেন না। আপনারা এতদিন আশ্রয় দিয়েছিলেন এই ঢের। পয়সাকড়ির জন্যে তো ছিলাম না, গৌরী-মা বলে দিয়েছিলেন, সব ঠিক করে দিয়েছিলেন—তাই এখানে ছিলাম।আপনাদের উপকার জীবনে ভুলব না।

মিনুর কাকিমা শরতের কথা শুনে একটু নরমও হল। বললে, তা—তা তো বটেই। তা আচ্ছা দেখি যা পারি দেব এখন।

বিদায়ের দিন শরৎ মিনুর কাকিমাকে অবাক করে দিয়ে বাড়ির ছেলেমেয়েদের জন্যে কিছু-না-কিছু খেলনা ও খাবার জিনিস কিনে নিয়ে এল। রেণুকাকে তার ঘরে একখানা লালপাড় শাড়ি দিতে গিয়ে চোখের জলের মধ্যে পরস্পরের ছাড়াছাড়ি হল।

রেণুকা বললে, এ শাড়ি আমার পরা হবে না ভাই, মাথায় করে রেখে দেব—

—তাই করিস মুখপুড়ি।

—কেন আমার জন্যে খরচ করলে ?ক'টাকা দাম নিয়েছে ?

তোর সে খোঁজে দরকার কি ?দিলাম, নে—মিটে গেল। জানিস আমি রাজকন্যে, আমাদের হাত ঝাড়লে পর্বত ?

রেণুকা চোখের জল ফেলতে ফেলতে বললে—তুমি আমায় ভুলে গেলে আমি মরে যাব ভাই।

শরৎ মুখে ভেংচি কেটে বললে, মরে ভূত হবি পোড়ারমুখী ! ভূত না তো, পেত্নী হবি। রাত্রে আমায় যেন ভয় দেখাতে যেয়ো না !

শরতের মুখে হাসি অথচ চোখে জল।

আবার কলকাতা শহর।...

গোপেশ্বর চাটুজ্যে বললেন, এখানে বৃন্দাবন মল্লিকের লেনে আমাদের গাঁয়ের একজন লোক থাকে বাসা করে, আপিসে চাকরি করে। চলো সেখানে গিয়ে উঠি দুজনে।

খুঁজতে খুঁজতে বাসা মিলল। বাড়ির কর্তা জাতিতে মোদক, স্বগ্রামের প্রবীণ ব্রাহ্মণ প্রতিবেশীর উপস্থিতিতে সে যেন হাতে স্বর্গ পেয়ে গেল। মাথায় রাখে কি কোথায় রাখে, ভেবে যেন পায় না। বললে—মা ঠাকরুন কে ?

—আমার ভাইঝি, গড়শিবপুরে বাড়ি ওদের। তুমি চেনো না—মস্ত লোক ওর বাবা।

—তা চাটুজ্যে মশাই, সব জোগাড় আছে ঘরে। দিদি-ঠাকরুন রান্নাবান্না করুন, ওরা সব যুগিয়ে দেবে এখন। আমার আবার আপিসের বেলা হয়ে গেল—দশটায় হাজির হতেই হবে। আমি তেল মাখি—কিছু মনে করবেন না।

বাড়ির গৃহিণী শরৎকে যথেষ্ট যত্ন করলেন। তাকে কিছুই করতে দিলেন না। বাটনা বাটা, কুটনো কোটা সবই তিনি আর তাঁর বড় মেয়ে দুজনে মিলে করে শরৎকে রান্না চড়িয়ে দিতে ডাক দিলেন।

শরতের জন্যে মিছরি ভিজের শরবৎ, দই, সন্দেশ আনিয়ে তার স্নানের পর তাকে জল খেতে দিলেন।

আহারাদির পর শরতের বড় ইচ্ছে হল একবার কালীঘাটে গিয়ে সে গৌরী-মার সঙ্গে দেখা করে। বৃদ্ধ গোপেশ্বর চাটুজ্যে শুনে বললেন, চলো না মা, আমারও ওই সঙ্গে দেবদর্শনটা হয়েযাক্।

বিকেলের দিকে ওরা কালীঘাটে গেল। বাড়ির গৃহিণী তার বড় মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে ওদের সঙ্গিনী হলেন। মন্দিরের প্রাঙ্গণে বিস্তৃত নাটমন্দিরে দু-তিনটি নূতন সন্ন্যাসী আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। গৌরী-মা তার পুরোনো জায়গাটিতেই ধুনি জ্বালিয়ে বসে আছেন। শরৎকে দেখে তিনি প্রায় চমকে উঠলেন। বললেন, সরোজিনীরা কি কলকাতায় এসেছে ?

শরৎ তার পায়ের ধুলো নিয়ে প্রণাম করে সব খুলে বললে।

গৌরী-মা বললেন, তোমার জ্যাঠামশাই ?কই দেখি—

বৃদ্ধ চাটুজ্যে মহাশয় এসে গৌরী-মার কাছে বসলেন, কিন্তু প্রণাম করলেন না, বোধ হয় সন্ন্যাসিনী তাঁর চেয়ে বয়সে ছোট বলে। বললেন—মা, আমি আপনার কথা শরতের মুখে সব শুনেছি। আপনি আশীর্বাদ করুন আমি ওকে যেন ওর বাবার কাছে নিয়ে যেতে পারি। আপনার আশীর্বাদ ছিল বলে বোধ হয় আমার সঙ্গে ওর দেখা হয়েছিল কাশীতে।

গৌরী-মা বললেন, তাঁর কৃপায় সব হয় বাবা, তিনিই সব করছেন—আপনি আমি নিমিত্ত মাত্র।

বাসায় ফিরে আসবার পথে শরতের কেবলই মনে হচ্ছিল, যদি কমলার সঙ্গে একবারটি পথেঘাটে কোথাও দেখা হয়ে যেত, কি মজাই হত তা হলে। কলকাতার মধ্যে যদি কারো সঙ্গে দেখা করবার জন্যে প্রাণ কেমন করে—তবে সে সেই হতভাগিনী বালিকার সঙ্গেই আবার সাক্ষাতের আশায়।

কাশীতে গিয়ে এই দেড় বৎসরে সে অনেক শিখেছে, অনেক বুঝেছে। এখন সে হেনাদের বাড়ি আবার যেতে পারে, কমলাকে সেখান থেকে টেনে আনতে পারে, সে সাহস তার মধ্যে এসে গিয়েছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় সে হেনাদের বাড়ির ঠিকানা জানে না, শহর বাজারে ঘরবাড়ির ঠিকানা বা রাস্তা না জানলে বের করতে পারা যায় না, আজকাল সে বুঝেছে।

কলকাতায় এসে আবার তার বড় ভালো লাগছে। কাশী তো পুণ্যস্থান, কত দেউল-দেবমন্দির, ঘাট, যত ইচ্ছে স্নান করো, দান করো, পুণ্য করো—স্বয়ং বাবা বিশ্বনাথের সেখানে অধিষ্ঠান। কিন্তু কলকাতা যেন ওকে টানে, এখানে এত জিনিস আছে যার সে কিছুই বোঝে না—সেজন্যেই হয়তো কলকাতা তার কাছে বেশি রহস্যময়। এত লোকজন, গাড়িঘোড়া, এত বড় জায়গা কাশী নয়।

শরৎ বলে, জ্যাঠামশায় আপনি কোন্ কোন্ দেশে বেড়ালেন ?

—বাংলাদেশের কত জায়গা পায়ে হেঁটে বেড়িয়েছি মা, বর্ধমানে গিয়েছি, বৈঁচি, শক্তিগড়, নারাণপুর গিয়েছি। রাঢ় দেশের কত বড় বড় মাঠ বেয়ে সন্দেবেলা সুমুখ আঁধার রাত্রিতে একা গিয়েছি। বড় তালগাছ ঘেরা দীঘি, জনমানব নেই কোথাও, লোকে বলে ঠ্যাঙাড়ে ডাকাতের ভয়—এমন সব দীঘির ধারে সারাদিন পথ হাঁটবার পরে বসে চাট্টি জলপান খেয়েছি। একদিন সে কথা গল্প করব তোমাদের বাড়ি বসে।

—বেশ জ্যাঠামশায়।

—বেড়াতে বড় ভালো লাগে আমার। আগে বাংলাদেশের মধ্যেই ঘুরতাম, এবার গয়া কাশীও দেখা হল—

—আমারও খুব ভালো লাগে। বাবা কোনো দেশ দেখেননি, বাবাকে নিয়ে চলুন আবার আমরা বেরুব—

—খুব ভালো কথা মা। চলো এবার হরিদ্বারে যাব—

—সে কতদূর ?কাশীর ওদিকে ?

—সে আরো অনেক দূর শুনেছি। তা হোক, চলো সবাই মিলে যাওয়া যাক্—বৃন্দাবন হয়ে যাব—তোমার বাবাও চলুন।

—জ্যাঠামশায় ?

—কি মা ?

—বাবার দেখা পাব তো ?

—আমি যখন কথা দিয়েছি মা, তুমি ভেব না। সে বিষয়ে নিশ্চিন্দি থাকো।

পরদিন গোপেশ্বর চাটুজ্যে শরৎকে কলকাতায় তাঁর স্বগ্রামবাসী কৃষ্ণচন্দ্র মোদকের বাসায় রেখে দুদিনের জন্যে গড়শিবপুরে গেলেন। শরৎকে আগে হঠাৎ গ্রামে না নিয়ে গিয়ে ফেলে সেখানকার ব্যাপার কি জানা দরকার। গড়শিবপুরে গিয়ে সন্ধান নিয়ে কিন্তু তাঁর চক্ষু স্থির হয়ে গেল, যা শুনলেন সেখানে। গ্রামের লোকে বললে, কেদার রাজা বা তাঁর মেয়ে আজ প্রায় দেড়-বৎসর দু-বৎসর আগে গ্রাম থেকে কলকাতায় চলে যান। সেখান থেকে তাঁরা কোথায় চলে গিয়েছেন তা কেউ জানে না। কলকাতায় তারা নেই একথাও ঠিক। যাদের সঙ্গে গিয়েছিলেন,তারাই ফিরে এসে বলেছে।

গোপেশ্বর চাটুজ্যে গ্রামের অনেককেই জিজ্ঞেস করলেন, সকলেই ওই এক কথা বলে। সেবার যে সেই মুদির দোকানে কেদারের সঙ্গে বসে বসে গান-বাজনা করেছিলেন সেখানেও গেলেন। কেদার গাঁয়ে না থাকায় গানবাজনার চর্চা আর হয় না, মুদি খুব দুঃখ করলে। গোপেশ্বরকে তামাক সেজে খাওয়ালে। অনেকদিন কেদার বা তাঁর মেয়ের কোনো সন্ধান নেই, আর আসবেন কিনা কে জানে !

বৃদ্ধ তামাক খেয়ে উঠলেন।

গ্রামের বাইরের পথ ধরে চিন্তিত মনে চলেছেন, শরতের বাপের যদি সন্ধান না-ই পাওয়া যায়, তবে উপস্থিত শরতের গতি কি করা যাবে ?কাশী থেকে এনে ভুল করলেন না তো ?

এমন সময় পেছন থেকে একজন চাষা লোক তাঁকে ডাক দিলে—বাবাঠাকুর—

গোপেশ্বর চাটুজ্যে ফিরে চেয়ে দেখে বললেন—কি বাপু ?

—আপনি ক্যাদার খুড়ো ঠাকুরের খোঁজ করছিলে ছিবাস মুদির দোকানে ?আমিও সেখানে ছেলাম। আপনি কি তাঁর কেউ হও ?

—হ্যাঁ বাপু, আমি তাঁর আত্মীয়। কেন, তুমি কিছু জানো নাকি ?

—আপনি কারো কাছে বলবেন না তো ?

—না, বলতে যাব কেন ?কি ব্যাপার বলো তো শুনি ?আমি তাঁর বিশেষ আত্মীয়, আর আমার দরকারও খুব।

লোকটা সুর নীচু করে বললে— তিনি হিংনাড়ার ঘোষেদের আড়তে কাজ করছেন যে ! হিংনাড়া চেনেন ?হলুদপুকুর থেকে তিন ক্রোশ। আমি পটল বেচতে যাই সেবার মাঘ মাসে, আমার সঙ্গে দেখা। আমায় দিব্যি দিয়ে দিয়েলেন, গ্রামের কাউকে বলতে নিষেধ করে দিলেন, তাই কাউকে বলিনি। আপনি সেখানে যাও,

পুকুরের উত্তর পাড়ে যে ধান-সর্ষের আড়ত, সেখানেই তিনি থাকেন। আমার নাম করে বলবে, গেঁয়োহাটির ক্ষেত্তর সন্ধান দিয়েছে। আমাদের গাঁয়ের শখের যাত্রার দলে কতবার উনি গিয়ে বেয়ালা বাজিয়েছেন। আমায় বড্ড স্নেহ করতেন। মনে থাকবে—গেঁয়োহাটির ক্ষেত্তর কাপালী !

গোপেশ্বর চাটুজ্যে আশা করেননি এভাবে কেদারের সন্ধান মিলবে। বললেন, বড় উপকার করলে বাপু। কি নাম বললে—ক্ষেত্র ?আমি বলব এখন তার কাছে—বড় ভালো লোক তুমি।

সেই দিনই সন্ধ্যার আগে গোপেশ্বর চাটুজ্যে হিংনাড়ার বাজারে গিয়ে ঘোষেদের আড়ত খুঁজে বার করলেন। আড়াতের লোকে জিজ্ঞেস করলে, কাকে চান মশাই ?কোত্থেকে আসা হচ্ছে ?

—গড়শিবপুরের কেদারবাবু এখানে থাকেন ?

—হ্যাঁ আছেন। কিন্তু তিনি মালঞ্চার বাজারে আড়তের কাজে গিয়েছিলেন—এখনো আসেননি। বসুন।

রাত্রি প্রায় সাড়ে আটটার সময় কে তাঁকে বললে—মুহুরি মশায় ওই যে ফিরছেন—

গোপেশ্বর চাটুজ্যে সামনে গিয়ে বললেন, রাজামশায়, নমস্কার। আমায় চিনতে পারেন ?

গোপেশ্বরের দেখে মনে হল কেদারের বয়স যেন খানিকটা বেড়ে গিয়েছে, কিন্তু হাবভাবে সেই পুরানো আমলের কেদার রাজাই রয়ে গিয়েছেন পুরোপুরিই।

কেদার চোখ মিটমিট করে বললেন, হ্যাঁ, চিনেছি। চাটুজ্যে মশায় না ?

—ভালো আছেন ?

—তা একরকম আছি।

—এখানে কি চাকরি করছেন ?আপনার মেয়ে কোথায় ?

—আমার মেয়ে ?ইয়ে—

কেদার যেন একবার ঢোঁক গিলে, তারপর অকারণে হঠাৎ উৎসাহিতের সুরে বললেন, মেয়ে কলকাতায়—তার মাসিমার—

গোপেশ্বর চাটুজ্যে সুর নিচু করে বললেন, শরৎ-মাকে আমার সঙ্গে এনেছি। সে আমার কাছেই আছে—কোনো ভয় নেই।

—এই কথা বলার পরে কেদারের মুখের ভাবের অদ্ভুত পরিবর্তন ঘটলো। নিতান্ত নিরীহ ও নির্বোধ লোক ধমক খেলে যেমন হয়, তার মুখ যেন তেমনি হয়ে গেল। গোপেশ্বর চাটুজ্যের মনে হল এখুনি তিনি যেন হাতজোড়া করে কেঁদে ফেলবেন।

বললেন, আমার মেয়েকে—আপনি এনেছেন ?কোথায় সে ?

কলকাতায় রেখে এসেছি। কালই আনব। বসুন একটু নিরিবিলি জায়গায়—সব বলছি। ভগবান মুখ তুলে চেয়েছেন, কোনো ভয় নেই রাজামশায়। চলুন ওদিকে—বলি সব খুলে।

গোপেশ্বর চাটুজ্যে বললেন, আপনার মেয়ে আগুনের মতো পবিত্র—

কেদার হা-হা করে হেসে বললেন, ও কথা আমায় বলার দরকার হবে না হে গোপেশ্বর। আমার মেয়ে, আমাদের বংশের মেয়ে—ও আমি জানি।

গোপেশ্বর চাটুজ্যে বললেন, রাজামশায় শেষটাতে কি এখানে চাকরি স্বীকার করলেন ?

কেদার অপ্রতিভের হাসি হেসে বললেন, ভুলে থাকবার জন্যে, স্রেফ ভুলে থাকবার জন্যে দাদা। এরা আমার বাড়ি যে গড়শিবপুরে তা জানে না। বেহালা বাজাইনি আজ এই দেড় বছর—বেহালার বাজনা যদি কোথাও শুনি, মন কেমন করে ওঠে।

—চলুন, আজই কলকাতায় যাই—

আমার বড় ভয় করে। ভয়ানক জায়গা—আমি আর সেখানে যাব না হে, তুমি গিয়ে নিয়ে এসো মেয়েটাকে। আজ রাতে এখানে থাকো—কাল রওনা হয়ে যাও সকালে। আমার কাছে টাকা আছে, খরচপত্র নিয়ে যাও। প্রায় সওয়া-শো টাকা এদের গদিতে মাইনের দরুন এই দেড় বছরে আমার পাওনা দাঁড়িয়েছে। আজ ঘোষ মশায়ের কাছে চেয়ে নেব।

গোপেশ্বর চাটুজ্যে পরদিন সকালে কলকাতায় গেলেন এবং দুদিন পরে শরৎকে সঙ্গে নিয়ে স্বরূপপুর স্টেশনে নেমে নৌকাযোগে বৈকালে হিংনাড়া থেকে আধক্রোশ দূরবর্তী ছুতোরঘাটায় পৌঁছে কেদারকে খবর দিতে গেলেন। শরৎ নৌকাতেই রইল বসে।

সন্ধ্যার কিছু আগে কেদার এসে বাইরে থেকে ডাক দিলেন—ও শরৎ—

শরৎ কেঁদে ছইয়ের মধ্যে থেকে বার হয়ে এল। সে যেন ছেলেমানুষের মতো হয়ে গেল বাপের কাছে। অকারণে বাপের ওপর তার এক দুর্জয় অভিমান।

কেদার বড় শক্ত পুরুষমানুষ—এমন সুরে মেয়ের সঙ্গে কথা বললেন, যেন আজ ওবেলাই মেয়ের সঙ্গে তার দেখা হয়েছে, যেন রোজই দেখাসাক্ষাৎ হয়।

কাঁদিস নে মা, কাঁদতে নেই। কেঁদো না—ভালো আছিস ?

শরৎ কাঁদতে কাঁদতেই বললে, তুমি তো আর আমার সন্ধান নিলে না ?বাবা তুমি এত নিষ্ঠুর ! আজ যদি মা বেঁচে থাকত, তুমি এমনি করে ভুলে থাকতে পারতে ?

দুজনেই জানে কারো কোনো দোষ নেই, যা হয়ে গিয়েছে তার ওপর হাত ছিল না বাবা বা মেয়ের কারো—রাগ বা অভিমান—সম্পূর্ণ অকারণ !

কেদার অনুতপ্ত কণ্ঠে বললেন, তা কিছু মনে করিস নে তুই মা। আমার কেমন ভয় হয়েগেল—আমায় ভয় দেখালে পুলিশ ডেকে দেবে, তোমায় ধরিয়ে দেবে, সে আরো কত কিছু। আমার সব মনেও নেই মা। যাক্, যা হয়ে গিয়েছে, তুমি কিছু মনে করো। চলো চলো আজই গড়শিবপুরে রওনা হই—দেড় বছর বাড়ি যাইনি।

গড়শিবপুরের রাজবাড়ি এই দেড় বছরে অনেক খারাপ হয়ে গিয়েছে।

চালের খড় গত বর্ষায় অনেক জায়গায় ধ্বসে পড়েছে। বাঁশের আড়া ও বাতা উইয়ে খেয়ে ফেলেছে। বাড়ির উঠোনে একহাঁটু বনজঙ্গল—আজ গোপেশ্বর চাটুজ্যে ও কেদার অনবরত কেটে পরিষ্কার করেও এখনো সাবেক উঠোন বের করতে পারেননি।

নিড়ানি ধরে সামনের উঠোনের লম্বা লম্বা মুথো ঘাস উপড়ে তুলতে তুলতে কেদার বললেন, ও মা শরৎ, আমাদের একটু তামাক দিতে পারো ?

গোপেশ্বর চাটুজ্যে উঠোনের ওপাশে কুক্‌শিমা গাছের জঙ্গল দা দিয়ে কেটে জড়ো করতে করতে বলে উঠলেন—ও কি রাজামশায়, না না, মেয়েমানুষদের দিয়ে তামাক সাজানো—ওরা ঘরের লক্ষ্মী—না, ছিঃ—তামাক আমি সেজে আনছি গিয়ে—

ততক্ষণে শরৎ তামাক ধরিয়ে কলকেতে ফুঁ পাড়ছে। দুপুর গড়িয়ে বিকেলের ছায়া ঈষৎ দীর্ঘতর হয়েছে। বাতাসে সদ্য কাটা বনজঙ্গলের কটুতিক্ত গন্ধ। ভাঙা গড়বাড়ির দেউড়ির কার্নিসে বন্য পাখির কাকলী।

কাশীতে যখন ছিল তখন ভাবেনি আবার সে দেশে ফিরতে পারবে কখনো, আবার সে এমনিতর বৈকালে বাবাকে নিড়ান হাতে উঠোনর ঘাস পরিষ্কার করতে দেখবে, বাবার তামাক আবার সাজবার সুযোগ পাবে সে।

তামাক দিয়ে শরৎ বললে, বাবা, হিম হয়ে বসে থেকো না—এবেলা একটা তরকারি নেই যে কুটি, ব্যবস্থা আগে করো।

কেদার কিছুমাত্র ব্যস্ত না হয়ে বললেন, কেন, পুকুরপাড়ে ঝিঙে দেখে এলাম তো তখন !

কালোপায়রা দীঘির পাড়ে বাঁধানো ঘাটের পাশের ঝোপের মাথায় বন্য ঝিঙে ও ধুঁধুলের লতা বেড়ে উঠেছে, কেদারের কথার লক্ষ্যস্থল সেই বুনো ধুঁধুলের গাছ।

—শুধু ঝিঙে বাবা ?

—তাই নিয়ে এসে ভাতে দে—কি বলো হে দাদা ?হবে না ?

গোপেশ্বর চাটুজ্যে বনজঙ্গল কাটতে কাটতে একটা ঝালের চারা দায়ের মুখে উপড়ে ফেলেছিলেন, সেটিকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করবার জন্যে কিছুক্ষণ থেকে প্রাণপণ চেষ্টা করছিলেন, অন্যমনস্কভাবে ঘাড় নেড়ে বললেন—খুব, খুব। রাজভোগ ভেসে যাবে।

কেদার বললেন—তবে তাই করো মা শরৎ। তাই নিয়ে এসো।

শরৎ কালোপায়রা দীঘির ধারে জঙ্গলে এল ঝিঙে খুঁজতে।

আজই দুপুরবেলা ওরা গরুর গাড়ি করে এসে পৌঁছেছে এখানে। বাপ ও জ্যাঠামশাই সেই থেকে বনজঙ্গল পরিষ্কার নিয়েই ব্যস্ত আছেন। সে নিজে ঘরদোর পরিষ্কার করছিল—এইমাত্র একটু অবসর মিলেছে চোখ মেলে চারিদিকে চাইবার। কালোপায়রা দীঘির টলটলে জলে রাঙা কুমুদ ফুল ফুটেছে গড়বাড়ির ভগ্নস্তূপের দিকটাতে। এই তো বাঁধাঘাট। ঘাটের ধাপে শ্যাওলা জমেছে, কুক্‌শিমার জঙ্গল বেড়েছে খুব—কতকাল বাসন মাজেনি ঘাটটাতে বসে। কাল সকালে আসতে হবে আবার।

ছাতিম বনের ছায়ার দিকে চেয়ে সে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। ছাতিম বনের ওপরে ওই দেউলের গম্বুজাকৃতি চুড়োটা বনের আড়াল থেকে মাথা বার করে দাঁড়িয়ে আছে। ছায়া ওপার থেকে এপারে এসে পৌঁছেছে, চাতালের যে কোণে বসে শরৎ বাসন মাজত, এপারের বটগাছটার ডাল তার ওপরে ঝুঁকে পড়েছে। শরৎ যেন কতকাল পরে এসব দেখছে, জন্মান্তরের তোরণদ্বার অতিক্রম করে এ যেন নতুন বার পৃথিবীতে এসে চোখ মেলে চাওয়া বহু কালের পুরোনোপরিচয়ের পৃথিবীতে। কালোপায়রা দীঘির ধারের এমনি একটি সুপরিচিত বৈকালের স্বপ্ন দেখে কতবার চোখের জল ফেলেছে কাশীতে পরের বাড়ি দাসত্ব করতে করতে, দশাশ্বমেধ ঘাটের রানায় সন্ধ্যাবেলা রেণুকার সঙ্গে বসে, রাজগিরিতে গৃধ্রকূট পাহাড়ের ছায়াবৃত পথে মিনুর সঙ্গে বেড়াতে বেড়াতে।

সে শরৎ নেই আর। শরৎ নিজের অনুভূতিতে নিজেই বিস্মিত হয়ে গেল। নতুন দৃষ্টি, নতুন মন নিয়ে ফিরেছে শরৎ। পল্লীগ্রামের ক্ষুদ্র অভিজ্ঞতা যে শরৎসুন্দরীর দৃষ্টি সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ রেখেছিল, আজ বহির্জগতের আলো ও ছায়া, পাপ ও পুণ্যের সংস্পর্শে এসে যেন শরতের মন উদারতর, দৃষ্টি নবতর দর্শনের ক্ষেত্রে প্রসারিত হয়েছে।

ঝিঙে তুলে রেখে শরৎ বার বার দীঘির ঘাটের ভাঙা চাতালে প্রাচীন বটতলায় নানা কারণে অকারণে ছুটে ছুটে আসতে লাগল শুধু এই নতুন ভাবানুভূতিকে বার বার আস্বাদ করবার জন্যে। একবার উপরে গিয়ে দেখলে গ্রামের জগন্নাথ চাটুজ্যে কার মুখে খবর পেয়ে এসে পৌঁছে গিয়েছেন। বাবা ও জ্যাঠামশায়ের সঙ্গে বসে গল্প করছেন।

ওকে দেখে জগন্নাথ বললেন, এই যে মা শরৎ, তা কাশী গয়া অনেক জায়গা বেরিয়ে এলে বাবার সঙ্গে আর গোপেশ্বর ভায়ার সঙ্গে ?ভালো—প্রায় দেড় বছর বেড়ালে।

বুদ্ধিমতী শরৎ বুঝল এ গল্প জ্যাঠামশায়ই রচনা করেছেন তাদের দীর্ঘ অনুপস্থিতির কারণ নির্দেশ করার জন্যে। শরৎ জগন্নাথ চাটুজ্যের পায়ের ধুলো নিয়ে প্রণাম করলে।

—এসো, এসো মা, থাক্। চিরজীবী হও—তা কোন্ কোন্ দেশ দেখলে ?

কেদার বললেন, দেড় বছর ধরে তো বেড়ানো হয়নি। আমি মধ্যে চাকরি করেছিলাম হিংনাড়ার বাজারে ঘোষেদের আড়তে। এই গোপেশ্বর দাদা সপরিবারে পশ্চিমে গেলেন, শরৎকে নিয়ে গিয়েছিলেন—

শরৎ বললে, চা খাবেন জ্যাঠামশায়, যাবেন না—বসুন। আমি বাসনগুলো ধুয়ে আনি পুকুরঘাট থেকে।

আবার সে ছুটে এল কালোপায়রা দীঘির পাড়ে ছাতিমবনের দীর্ঘ, ঘন শীতল ছায়ায়। পুরোনো দিনের মতো আবার রোদ রাঙা হয়ে উঠে গিয়েছে ছাতিম গাছের মাথায়। বেলা পড়ে এসেছে। এমন সময়ে দূর থেকে রাজলক্ষ্মীকে আসতে দেখে সে হঠাৎ লুকিয়ে আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

রাজলক্ষ্মীর হাতে একটি প্রদীপ, তেলসলতে দেওয়া।

দুজনেই দুজনকে দেখে উচ্ছ্বসিত আনন্দে আত্মহারা।

রাজলক্ষ্মী হেসে বললে, মানুষ না ভূত, দিদি ?

—ভূত, তোর ঘাড় মটকাব !

তারপর দুজন দুজনকে জড়িয়ে ধরলে।

—শুনিসনি আমরা এসেছি ?

—কারো কাছে না। কে বলবে ?আমি অবেলায় ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, উঠে এই আসছি—

—কোথায় চলেছিস রে এদিকে ?

—তোমাদের উত্তর দেউলে পিদিম দিচ্ছি আজ এই দেড় বছর। বলে গিয়েছিলে, মনে নেই ?

—সত্যি ভাই ?

—না, মিথ্যে !

—আর জন্মের বোন ছিলি তুই, এই বংশের মেয়ে ছিলি কোন্ জন্মে।

—এতদিন কোথায় ছিলে তোমরা দিদি ?

—কাশীতে। সব বলব গল্প তোকে। চল—

—আজ পিদিম তুমি দেবে দিদি ?

—নিশ্চয় ! ভিটেয় যখন এসেছি, তখন তোকে আর পিদিম দিতে হবে না। তবে আমার সঙ্গেচল—

বারো

কালোপায়রা দীঘির ওপারের ছাতিমবন নিবিড় হয়েছে, তার ছায়ায় ছায়ায় উত্তর দেউলের যাবার পথে বাদুড়নখী গাছের জঙ্গল তেমনি ঘন, যেমন শরৎ চিরকাল দেখে এসেছে, তবে এখনো গাছ শুকিয়ে যায়নি—সবে বেগুনে রঙের ফুল ধরেছে বড় বড় সবুজ পাতার আড়ালে। শরৎ আগে আগে প্রদীপ হাতে, রাজলক্ষ্মী পেছনে। কত পরিচিত পুরোনো পথ, সারা জীবনই যেন অতীব শান্ত ও নিরুপদ্রব আরামে এই বাদুড়নখী গাছের জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে চলেছে সে, তার পিতৃগৃহের পুণ্য আবেষ্টনী তার জীবনের পাথেয় যুগিয়ে এসেছে—যে জীবনের না আছে রাত্রি, না আছে অরুণোদয়—শুধু এমনি চাপা গোধূলি, হইচইহীন কর্মকোলাহলহীন।

প্রদীপ দিয়ে ওরা আবার ফিরল। পথের দুপাশে পুষ্পশ্রীর লীলায়িত চেতনা ওর আগমনে যেন আনন্দিত। কতকাল করে রাজকন্যা বাড়ি ফিরেছে !

রাজলক্ষ্মী বলে, এঃ দিদি, এ ঘরে বসে রাঁধবে কি করে ?জল পড়ে মেজে যে একেবারে নষ্ট হয়ে গিয়েছে !

—পিঁড়ি পেতে নেব এখন। তুই আমার বাপের ভিটের নিন্দে করিসনি বলে দিচ্ছি—

রাজলক্ষ্মী হেসে বললে, সেই ছেলেমানুষি স্বভাব এখনো যায়নি শরৎদি—

—চা খাবি ?

—তা খাচ্ছি—এখন বলো এতকাল কোথায় ছিলে তোমরা ?

—রাজারাজড়ার কাণ্ড, একটু হিল্লিদিল্লি বেড়িয়ে আসা গেল !

—সে তো বুঝতেই পারছি।

—আজ রাত্তিরে এখানে খাবি রাজলক্ষ্মী। কিন্তু কিছু নেই বলছি, শুধু ধুঁধুলভাতে, ধুঁধুলভাজা।

ভাঙা ঘরে এই দুই তরুণীতে বসে বহুকাল পরে আবার আসর জমালে—ওদিকে দুই বৃদ্ধ উঠোনে দুই কাঁঠালকাঠের পিঁড়ি পেতে বসে অনেক রকম রাজা-উজীর বধের গল্প করছিলেন। জগন্নাথ চাটুজ্যে ইতিমধ্যে চলে গিয়েছেন।

—ভাই, জ্যাঠামশায় আর বাবাকে চাটুকু দিয়ে আয় তো—

রাজলক্ষ্মী চা দিতে গেলে কেদার বললেন, আরে আমার মা-লক্ষ্মী যে ! আয় আয় কতকাল পরে দেখলাম, ভালো ছিলি ?

গোপেশ্বর চাটুজ্যেও বললেন, হ্যাঁ, এ খুকিকে তো দেখেছি বটে এখানে—কি নাম যেন তোমার মা ?

রাজলক্ষ্মী দুজনের পায়ের ধুলো নিয়ে প্রণাম করে রান্নাঘরে চলে গেল।

কেদার বললেন, দাদা, এবার এখানে কিছুদিন থেকে যাও ।একসঙ্গে দিনকতক কাটানো যাক্—

—শরৎ-মা বলছিল—তীর্থভ্রমণে একবার চলুন, বেরুনো যাক রাজামশায়—

কেদার নিশ্চিন্ত আরামে চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিতে দিতে বললেন, আর কোথাও বেরুতে ইচ্ছে করে না দাদা। বিদেশে বড় গোলমাল—শুনলে তো সবই ! আমাদের এই জায়গাটাই ভালো—বাইরে নানারকম ভয়। কেন এখানে ওখানে বেরুনো—আমার হাতে এখনো যা টাকা আছে, এ বছরটা হেসে খেলে চলে যাবে। খাজনাপত্তর কেউ দেয়নি দুটি বছর—কাল থেকে আবার তাগাদা শুরু করি।

শরৎ নিজে তামাক সেজে আনতেই গোপেশ্বর চাটুজ্যে হাঁ হাঁ করে উঠলেন।—তুমি কেন মা—তুমি কেন ?আমাকে বললেই তো হত—এসব আমি পছন্দ করি নে, মেয়েদের দিয়ে তামাক সাজানো ! রাজামশায়ের তামাক আমি সাজব।

কেদার বললেন, তুমি আমার চেয়ে বয়সে অনেক বড়, দাদা। আর যে উপকার তুমি করেছ, তার ঋণ আমি বা আমার মেয়ে কেউ শুধ্‌তে পারব না। আমার এ বাড়িতে যতদিন ইচ্ছে থাকো, তোমার বাড়ি তোমার ঘর-দোর। আমার মেয়ে তোমার আমার তামাক সাজবে এ আর বেশি কথা কি দাদা ?

গোপেশ্বর চাটুজ্যে বললেন, আচ্ছা রাজামশাই, ওই কালোপায়রা দীঘির ওপারের বন কেটে বেশ আলু হয়—কিছু বীজ এনে—

—না দাদা, ওসব আমাদের বংশে নেই। চাষকাজ করে চাষা লোকেরা। আমার দরকার হয় গড়ের জঙ্গল থেকে মেটে আলু তুলে আনব। সোজা মেটে আলুটা হয় গড়ের জঙ্গলে ?সে বছর উত্তর দেউলের গায়ের বন থেকে আলু তুলেছিলাম এক একটা আধমণ ত্রিশ সের। আলুর অভাব কি আমার ?

হঠাৎ জগন্নাথ চাটুজ্যেকে পুনরায় আসতে দেখে উচ্চকণ্ঠে বললেন, ও শরৎ, জগন্নাথ খুড়ো আসছেন—আর একটু চা পাঠিয়ে—

জগন্নাথ চাটুজ্যে আসতে আসতে বললেন, তুমি বাড়ি এসেছ শুনে অনেকে দেখা করতে আসছে কেদার রাজা। আমি গিয়ে সাতকড়ির চণ্ডীমণ্ডপে খবরটা দিয়ে এলাম—সেই জন্যেই গিয়েছিলাম। ওঃ, একটু তেল আনতে বলো তো শরৎকে। বিছুটি যা লেগেছে গায়ে—বড্ড বিছুটির জঙ্গল বেড়েছে গড়ের খালের পথটাতে। ছিলে না অনেকদিন, চারিধারে বনজঙ্গল হয়ে—

গোপেশ্বর চাটুজ্যে বললেন, কাল আমি সব কেটে সাফ্ করে দেব—দেবেন তো দেখিয়ে জায়গাটা।

জগন্নাথ চাটুজ্যে এসেছেন এদের সব খবর সংগ্রহ করতে। একটু পরেই তিনি বড় বেশি আগ্রহ দেখাতে লাগলেন, একা এতদিন কোথায় ছিলেন, কি ভাবে কাটল সে-সব খবর জানতে। জগন্নাথ বললেন, তুমি কি বরাবর হিংনাড়ায় ছিলে এই দেড় বছর—না আর কোথাও—

—না, আমি গিয়ে হিংনাড়াতেই—

—কাদের আড়তে বললে—

—ঘোষেদের আড়তে। বিপিন ঘোষ বিনোদ ঘোষ দুই ভাই—ওদেরই—

—মাট্‌সের বিনোদ ঘোষ ? —মাসে তো ওদের বাড়ি নয়, শত্রুঘ্নপুর—

—সে আবার কোন্ দিকে ?নাম তো শুনিনি

—শত্রুঘ্নপুর বাজিতপুর—রামনগর থানা।

কেদার ক্রমশ অস্বস্তি বোধ করছিলেন জগন্নাথ চাটুজ্যের জেরায়। এত খুঁটিনাটি জিজ্ঞেস করবার কি দরকার তিনি বুঝতে পারলেন না। জগন্নাথ চাটুজ্যে পরের ছিদ্র অনুসন্ধান করে জীবন কাটিয়ে দিলেন কিনা, তাই ভয় হয়।

গোপেশ্বরকে দেখিয়ে জগন্নাথ বললেন, ইনি সেই একবার তোমার এখানে এসেছিলেন না ?চমৎকার হাত তবলার। একদিন শুনতে হবে আবার।

—হ্যাঁ।

—শরৎ বুঝি এঁর পরিবারের সঙ্গে তীর্থ করে এল ?

—হ্যাঁ।

—বেশ বেশ।

জগন্নাথ চাটুজ্যে হঠাৎ বললেন, ভালো কথা কেদার ভায়া, শুনেছ বোধ হয়, প্রভাসের বাবা হারান বিশ্বেস মারা গিয়েছে আজ বছরখানেক হল। প্রভাসদের কলকাতার বাড়িতে তোমরা তো প্রথম যাও—না ?

কেদারের মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল। জগন্নাথ চাটুজ্যে কতটা জানে বা না জানে আন্দাজ করাশক্ত। কি ভেবে ও কি কথা বলছে, তাই বা কে জানে ?হঠাৎ প্রভাসের কথা তোলার মানে কি ?

তবুও সত্য কথার মার নেই ভেবে তিনি বললেন, প্রভাসদের বাড়িতে তো ছিলাম না আমরা। একটা বাগানবাড়িতে আমাদের থাকবার জায়গা করে দিয়েছিল।

—কতদিন সেখানে ছিলে তোমরা ?

—বেশি দিন নয়—দিন পনেরো।

—তার পর কোথায় গেলে ?

এইবার জবাব দিলেন গোপেশ্বর চাটুজ্যে। বললেন, তার পর একদিন আমার সঙ্গে হঠাৎ দেখা। আমি ওঁদের সঙ্গে দেখা করলাম বাগানবাড়িতে গিয়ে তার পরদিন সকালে। আমার বাড়ির সকলে তীর্থ করতে বেরিয়েছিল—সেই সঙ্গে শরৎকে নিয়ে গেলাম। রাজামশাই দেশে চলে আসছেন, হিংনাড়ার বাজারে ঘোষেদের আড়তের একজন কর্মচারীর সঙ্গে ওঁর চেনা ছিল—সে নিয়ে গিয়ে চাকরি জুটিয়ে দিলে। এই হল মোট ব্যাপার। কেমন, এই তো রাজামশাই ?

—হ্যাঁ, ওই বৈকি।

দুপুরবেলা। কেউ কোথাও নেই। গোপেশ্বর কালোপায়রার দীঘিতে মাছের চার করতে গিয়েছেন, আহারাদির পর কেদারকে নিয়ে মাছ ধরতে যাবেন।

শরৎ বাবাকে একা পেয়ে বললে, আচ্ছা বাবা, আমার খোঁজ করলে না কেন ?

কেদার কথার কি উত্তর দেবেন ?এ সব ব্যাপারকে তিনি এড়িয়ে চলতে চান—জীবনের সব চেয়ে বড় ধাক্কাকে তিনি ভুলে যেতে চেষ্টা করে আসছেন—তাঁর সব চেয়ে ভয় মেয়ে পাছে আবার ওইসব কথা তোলে।

আমতা আমতা করে বললেন, তা—খোঁজ করি কোথায় ?আমার—

—তোমাকে ওরা বলেছিল আমি ইচ্ছে করেই তোমার সঙ্গে দেখা করিনি—না ?বলো বাবা, তা যদি বিশ্বাস করে থাকো আমি তোমার সামনেই দীঘির জলে ডুবে মরব।

এবার কেদার যেন একটু বিচলিত হলেন, তাঁর অনড় আত্মস্বাচ্ছন্দ্য-বোধ এইবার একটু ধাক্কা খেলে। মেয়ের মুখের দিকে চেয়ে তিরস্কারের সুরে বললেন, তাই তুই বিশ্বাস করিস্ যে আমি ওসব ভাবতে পারি ?দে—একটু তেল দে মাখবার—দেখি আবার গোপেশ্বর ভায়া মাছের চারের কতদূর কি করলে ! তোর রান্না হল ?

—বেশ বাবা, কি নিশ্চিন্দিই থাকতে পারো তুমি, তাই শুধু আমি ভাবি। ঘরে আগুন লাগলেও বোধ হয় তোমার সাড়া জাগে না—মানুষে যে কি করে তোমার মতো—আচ্ছা, আর একটা কথা জিজ্ঞেস করি—উত্তর দেবে ?

—প্রভাসের নামে তোমাকে কেউ কিছু বলেছিল তো ?সেই মুখপোড়া গিরীনই বলে থাকবে। তুমি পুলিশে খবর দিলে না কেন ?

—তারাই বললে পুলিশে খবর দেবে তোর নামে। তাতেই তো আমি পালিয়ে এলাম।

পুলিশের কাছে নালিশে কে আসামী কে ফরিয়াদী হয় এবিষয়ে সুস্পষ্ট ধারণা নেই শরতের—ওসব বড় গোলমেলে ব্যাপার। সে চুপ করে রইল।

কেদার বললেন, কষ্ট পেয়েছিস, না মা ?

—যাও, তোমাকে আর—

—না মা, ছিঃ, রাগ করতে নেই। কি রাঁধছিস ?বেগুন এনে দেব এখন ওবেলা। গেঁয়োহাটি যাব তাগাদা করতে, ব্যাটারা আজ দু-বছর খাজনার নামটি করেনি।

—করবে কি ?তুমি ছিলে এ চুলোয় ?মেয়েকে ভাসিয়ে দিয়ে নিজেও ভেসে পড়েছিলে। কি নির্বিকার পুরুষমানুষ তুমি তাই কি শুধু ভাবি বাবা।

শরতের এ মেজাজকে কেদারের চিনতে বাকি নেই। এ সময় ওর সামনে থাকতে যাওয়ামানে বিপদ টেনে আনা। কেদার তেল মেখে সরে পড়লেন। বাবাকে যতক্ষণ দেখা গেল শরৎ চেয়ে চেয়ে দেখলে, তারপর তিনি কালোপায়রা দীঘির পাড়ের বন-ধুঁধুলের লতাজালের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেলে শরৎ দুই হাতের মধ্যে মুখ গুঁজে নিঃশব্দে ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগল। তার বাবা, তাদের বনজঙ্গলে ঘেরা এত বড় গড়বাড়ি, কত পুরানো ভাঙা মন্দির, উত্তর দেউল, বারাহী দেবীর ভগ্ন পাষাণমূর্তি, ওই ছায়ানিবিড় ছাতিমবন—এসব ফেলে তাকে কোথায় চলে যেতে হয়েছিল ভাগ্যের বিপাকে। আর যদি সে না ফিরত, আর যদি বাবাকে না দেখত, গড়বাড়ির মাটির পুণ্যস্পর্শলাভের সৌভাগ্য যদি আর না ঘটত তার ?

কার পায়ের শব্দে সে মুখ তুলে দেখলে রাজলক্ষ্মী একটা বাটি হাতে রান্নাঘরের দাওয়ায় উঠছে। এই আর একটি মানুষ—যাকে দেখে শরৎ এত আনন্দ পায় ! দেড় বছরের মধ্যে কত জায়গা সে বেড়াল, কত নতুন নতুন মেয়ের সঙ্গে আলাপ হল—কিন্তু এমন কি একটা দিনও গিয়েছে যেদিন সে এই গরিব ঘরের মেয়েটার কথা ভাবেনি ?

—কি রে ওতে ?

—তোমাদের জন্যে একটু সুক্তুনি—মা বললেন জ্যাঠামশায়কে দিয়ে আয়—

—খাওয়া হয়েছে ?

—পাগল ! এখুনি খাওয়া হবে ?তোমাদের এখান থেকে গিয়ে নাইব—তার পর—

—আর বাড়ি যায় না, এখানেই খা—

—না, মা শরৎদি—

—খেতেই হবে। আচ্ছা, কেন অমন করিস্ বল্ তো ?কতকাল দুই বোনে বসে একসঙ্গে খাইনি তোর মনে পড়ে ?মোটে কাল আর আজ যদি হয়—সত্যি ভাই, বিশ্বাস এখনো যেন হচ্ছে না যে, আমি আবার গড়শিবপুরের ভিটেতে বসে আছি। এক যুগ পরে আবার এ মাটিতে—

রাজলক্ষ্মীকে শরৎ এখনো সব কথা খুলে বলেনি। রাজলক্ষ্মীও ওকে খুঁটিনাটি কিছুই জিজ্ঞেস করেনি প্রথম আনন্দের উত্তেজনায়। শরৎ মনে মনে ঠিক করে রেখেছে রাজলক্ষ্মীকে সে অবসর সময়ে সব খুলে বলবে। বন্ধুত্বের মধ্যে দেওয়াল তুলে রাখা তার পছন্দ হয় না।

শরৎ বললে, এই দেড় বছরের গাঁয়ের খবর বল্—কিছুই তো জানি নে।

—চিন্তে বুড়ি মরে গিয়েছে, জানো ?

—আহা, তাই নাকি ?কবে মোলো ?

—ফাল্গুন মাসে। গুরুপদ জেলের সেই হাবা ছেলেটা মরে গিয়েছে আষাঢ় মাসে। ম্যালেরিয়া জ্বরে।

—আহা !

—পাঁচী গয়লানীর বাড়ি চোর ঢুকে সব বাসন নিয়ে গিয়েছিল। থানার দারোগা এল, এর নাম লিখলে, ওর নাম লিখলে—কিছুই হল না শেষটা।

—ভালো কথা, ওপাড়ার সেজখুড়িমার ছেলেপিলে হবে দেখে গিয়েছিলাম—

—একটা ছেলে হয়েছে—বেশ ছেলেটি। দেখতে যাবে কাল ?

—বেশ তো, চল না। সাতকড়ি চৌধুরীর মেয়ের বিয়ে হয়েছে ?

—কেন হবে না ?হাতে পয়সা আছে—মেয়ের বিয়ে বাকি থাকে ?

শরং হেসে বললে, কেন রে, তোর কি বড় দুঃখু বিয়ে না হওয়ায় ?

কার না হয় শরৎদি, যদি সত্যি কথা বলা যায় ! যেমনি মা হিম হয়ে বসে আছে, তেমনি মেজখুড়িমা হিম হয়ে বসে আছে—আমার এদিকে আঠারো পেরুল, লোকের কাছে বলে বেড়ান পনেরোতে নাকি পা দিইছি—এমন রাগ ধরে !

শরৎ হেসে গড়িয়ে পড়ে আর কি।

—ওমা ! তুই হাসালি রাজলক্ষ্মী। আজকালকার মেয়ে সব হল কি ?সত্যি রে, তোর মনে কষ্ট হয় ?

—ওই যে বললাম দিদি, সত্যি কথা বললে হাসবে সবাই। তুমি বললে, তাই বললাম।

—আমি দেখব রে তোর সম্বন্ধ ?

—না, হাসি না শরৎদি। এতদিন তুমি ছিলে না—আমার মন-পাগল-পাগল হয়ে উঠত। এই গাঁয়ে একঘেয়ে থাকলে মানুষ পাগল হয়ে যায় না তুমিই বলো ?তার চেয়ে মনে হয়—যা হয় একটা দেখেশুনে দে, একঘেয়েমির হাত থেকে নিস্তার পাই। জন্মালাম গড়শিবপুর, তো রয়েই গেলাম সেই গড়শিবপুরে। এই যে তুমি কত দেশ বেড়িয়ে এলে শরৎদি, কেন বেড়িয়ে এলে ?নতুন জিনিস দেখবার জন্যে তো ?

শরৎ গম্ভীর সুরে বললে, আমার কপাল দেখে হিংসে করিস্ নে ভাই। তোকে সব খুলে বলব সময় পেলে।

রাজলক্ষ্মী বিস্ময়ের সুরে বললে, কেন শরৎদি ?

—সে কথা এখন না ভাই—বাবা আসছেন, সরে আয়—

কেদার গামছায় মাথা মুছতে মুছতে বললেন, কে ও ?রাজলক্ষ্মী ?বেশ মা বেশ। হ্যাঁ ভালো কথা শরৎ—মনে পড়ল নাইতে নাইতে—তোর মায়ের সেই কড়িগুলো কোথায় আছে মা ?

শরৎ হেসে বললে, কোনো ভয় নেই বাবা, লক্ষ্মীর হাঁড়িতেই আছে। প্রথম দিন এসেই আমি আগে দেখে নিয়েছি। ঠিক আছে।

—ও, তা বেশ। আর—ইয়ে—তোর সেই ভাঙা চিরুনিখানা ?

—ওই গোল তোরঙ্গের মধ্যে রেখে গিয়েছিলাম, সেইখানেই আছে। সে-ও দেখে নিয়েছি সেদিন।

—ইয়ে, ডাকি তবে গোপেশ্বর দাদাকে ?রান্না হয়েছে তো ?

কেদার আবার গেলেন পুকুরপাড়ে গোপেশ্বর চাটুজ্যেকে ডাকতে।

শরৎ মৃদু হেসে রাজলক্ষ্মীকে বললে, দুটি নিষ্কর্মা আর নিশ্চিন্দি লোক এক জায়গায় জুটেছে, জ্যাঠামশায় আর বাবা—দুই-ই সমান। দুটিতে জুড়ি মিলেছে ভালো।

কেদার বলতে বলতে আসছিলেন, বেহালা বাজাইনি আজ দেড় বছর দাদা। তারগুলো সব ছিঁড়ে নষ্ট হয়ে গিয়েছে। আজ ওবেলা ছিবাসের ওখানে আসর করা যাক্ গিয়ে। তোমার তবলাওঅনেক দিন শোনা হয়নি।

তেরো

দিন দশ-পনেরো কেটে গেল।

এ দিনগুলো কেদার ও গোপেশ্বরের কাটল খুব ভালোই। ছিবাস মুদির দোকানে প্রায়ই সন্ধ্যার পর ছেঁড়া মাদুর আর চট পেতে আসর জমে, কেদার এসেছেন শুনে তার পুরানো কৃষ্ণযাত্রা দলের দোহার, জুড়ি, এখানে গায়কেরা কেউ জাল রেখে, কেউ লাঙল ফেলে ছুটে আসে।

—রাজামশাই। ভালো ছেলেন তো ?একটু পায়ের ধুলো দ্যান—

—বাবাঠাকুর, অ্যাদ্দিন ছেলেন কনে ?মোদের দল যে একেবারে কানা পড়ে গেল আপনার জন্যি !

গেঁয়োহাটি কাপালী পাড়ার মধু কাপালী, নেত্য কাপালী এসে পীড়াপীড়ি—গেঁয়োহাটিতে একবার না গেলে চলবে না। সবাই রাজামশাইকে একবার দেখতে চায়। এদের ওপর কেদারের যথেষ্ট আধিপত্য, অন্য সময় যে কেদার নিতান্ত নিরীহ—এদের দলের দলপতি হিসাবে তিনি রীতিমতো কড়া ও উগ্র মেজাজের শাসক।

মধুকে ডেকে বললেন, তোর যে সেই ভাইপো দোয়ার দিত, সে কোথায় ?

—আজ্ঞে সে পাট কাটছে মাঠে—

কেদার মুখ খিঁচিয়ে বলেন, পাট তো কাটছে বুঝতে পারছি, চাষার ছেলে পাট কাটবে না তো কি বড় গাইয়ে হবে ?কাল একবার ছিবাসের ওখানে পাঠিয়ে দিয়ো তো, বুঝলে ?

—যে আজ্ঞে রাজামশাই—

—আর শশীকে খবর দিয়ো, দু-বছরের খাজনা বাকি। খাজনা দিতে হবে না ?নিষ্কর জমি ভোগ করতে লাগল যে একেবারে—

নেত্য কাপালী এগিয়ে এসে বললে, বাবাঠাকুর, আপনি যদি বাড়ি থাকতেন, তবে সবই হত। তারা খাজনা নিয়ে এসে ফিরে গিয়েল—

কেদার ধমক দিয়ে বললেন, তুই চুপ কর্—তোকে ফোপর-দালালি করতে বলেছে কে ?

কেদারের নামে বহু লোক জড়ো হয় ছিবাসের দোকানে—কেদারের বেহালার সঙ্গে মিশেছে ওস্তাদ গোপেশ্বরের তবলা। পাড়াগাঁয়ে নিঃসঙ্গ দিনেরাত্রে সময় কাটাবার এতটুকু সূত্রও যারা নিতান্ত আগ্রহে আঁকড়ে ধরে—তাদের কাছে এ ধরনের গুণী-সম্মেলনের মূল্য অনেক বেশি। দু-তিনখানা গ্রাম থেকে লোকে লণ্ঠন হাতে লাঠি হাতে জুতো বগলে করে এসে জোটে। সেই পুরোনো দিনের মতো অনেক রাত্রে দুজনেই অপরাধীর মতো বাড়ি ফেরেন।

শরৎ বলে, এলে ?ভাত জুড়িয়ে জল হয়ে গিয়েছে—

গোপেশ্বর আমতা আমতা করে বলেন—আমি গিয়ে বললাম মা রাজামশায়কে—যে শরৎ বসে থাকবে হাঁড়ি নিয়ে—তা হয়েছে কি, উনি সত্যিকার গুণী লোক, ছড়ে ঘা পড়লে আর স্থির থাকতে পারেন না। জ্ঞান থাকে না মা—

কেদার গোপেশ্বরের পেছনে দাঁড়িয়ে মনে মনে কৈফিয়ৎ তৈরি করেন।

শরৎ ঝাঁঝের সঙ্গে বলে, আপনি জানেন না জ্যাঠামশায়, বাবার চিরকাল একরকম গেল আর যাবেও। আজ বলে না, কোন্ কালে ওঁর ছিল জ্ঞান, ওঁকেই জিজ্ঞেস করুন না ?

গোপেশ্বর মিটমাটের সুরে বলেন, না না, কাল থেকে রাজামশাই আর দেরি করা হবে না। শরতের বড় কষ্ট হয়, কাল থেকে আমি সকাল সকাল নিয়ে আসব মা, রাত করতে দেব না—

এই দুই বৃদ্ধের ওপর শাসনদণ্ড পরিচালনা করে শরৎ মনে মনে খুব আমোদ পায় এবং এঁদের সঙ্কোচজড়িত কৈফিয়তের সুরে যথেষ্ট কৌতুক অনুভব করে—কিন্তু কোনো তর্জনগর্জনেই বিশেষ ফল হয় না, প্রতি রাত্রেই যা তাই—সেই রাত একটা। নির্জন গড়বাড়ির জঙ্গলে ঝিঁঝি পোকার গভীর আওয়াজের সঙ্গে মিশে শরতের শাসনবাক্য বৃথাই প্রতি রাত্রে নিশীথের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে।

শরৎ বলে—আজ কিছু নেই বাবা, কি দিয়ে ভাত দেব তোমাদের পাতে ?হাট না, বাজার না, একটা তরকারি নেই ঘরে, আমি মেয়েমানুষ যাব তরকারি জোগাড় করতে ?ওল তুলেছিলাম কালোপায়রা দীঘির পাড় থেকে একগলা জঙ্গলের মধ্যে—তাই ভাতে আর ভাত খাও—এত রাত্তিরে কি করব আমি ?

কেদার সঙ্কুচিত ভাবে বললেন, ওতেই হবে—ওতেই হবে—

—তুমি না হয় বললে ওতেই হবে, জ্যাঠামশায় বাড়িতে রয়েছেন, ওঁর পাতে শুধু ওল ভাতে দিয়ে কি করে—

গোপেশ্বর তাড়াতাড়ি বলেন, যথেষ্ট মা যথেষ্ট। তুমি দাও দিকি। ভেসে যাবে— কাঁচালঙ্কা দিয়ে ওল ভাতে মেখে এক পাথর ভাত খাওয়া যায় মা—

—তবে খান। আমার আপত্তি কি ?

—কাল গোঁয়োহাটির হাট থেকে আমি ঝিঙে পটল আনব দুটো—মনে করে দিয়ো তো ?

শরতের কি আমোদই লাগে। কতদিন পরে আবার পুরাতন জীবনের পুনরাবৃত্তি চলছে—আবার যে প্রতি নিশীথে গড়বাড়ির জঙ্গলের মধ্যে তাদের ভাঙা বাড়িতে সে একা শুয়ে থাকবে, বাবা এসে অপ্রতিভ কণ্ঠে বলবেন—ও মা শরৎ, দোর খুলে দাও মা,—এসব কখনো হবে বলে তার বিশ্বাস ছিল ?

সেই সব পুরানো দিন আবার ঠিক সেই ভাবেই ফিরে এসেছে...

—জ্যাঠামশায়ের জন্যে একটু দুধ রেখেছি—ভাত কটা ফেলবেন না জ্যাঠামশায়—

গোপেশ্বর ব্যস্তভাবে বললেন, কেন, আমি কেন—রাজামশায়ের দুধ কই ?

—বাবার হবে না। দু-হাতা দুধ মোটে-

না না, সে কি হয় মা ?রাজামশায়ের দুধ ও থেকেই—

কেদার ধীরভাবে বললেন, আমার দুধের দরকার নেই। আমরা রাজারাজড়া লোক, খাই তো আড়াইসের মেরে একসের করে খাব। ও দু-এক হাতা দুধে আমাদের—

কথা শেষ না করেই হা-হা করে প্রাণখোলা উচ্চ হাসির রবে কেদার রান্নাঘর ফাটিয়ে তুললেন।

এইরকম রাত্রে একদিন গোপেশ্বর ভয় পেলেন কালোপায়রা দীঘির পাড়ের জঙ্গলে। বেশি রাত্রে তিনি কি জন্যে দীঘির পাড়ের দিকে গিয়েছিলেন—সেদিন আকাশে একটু মেঘ ছিল, ঘুম ভেঙে তিনি রাত কত তা ঠিক আন্দাজ করতে পারলেন না। দীঘির জঙ্গলের দিকে একাই গেলেন। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে কোথায় যেন পদক্ষেপের শব্দ তাঁর কানে গেল—গুরুগম্ভীর পদক্ষেপের শব্দ। উৎকর্ণ হয়ে কিছুক্ষণ শুনে গোপেশ্বরের মনে হল তাঁরই কাছাকাছি গভীর বনঝোপের মধ্যে কে যেন সাবধানের সঙ্গে ধীরে ধীরে পা ফেলে চলেছে—তাঁর দিকেই ক্রমশ এগিয়ে আসছে নাকি ?চোর-টোর হবে কি তা হলে ?না কোনো ছাড়া গরু বা ষাঁড়—

কিন্তু পরক্ষণেই তার মনে হল এ পায়ের শব্দ মানুষের নয়—গরু বা ষাঁড়েরও নয়। পদশব্দের সঙ্গে কোনো কঠিন জিনিসের যোগ আছে—খুব ভারি ও কঠিন কোনো জিনিস।

এক-একবার শব্দটা থেমে যায়—হয়তো এক মিনিট...তার পরেই আবার...

হঠাৎ গোপেশ্বরের মনে হল শব্দটা যেন—তাঁকেই লক্ষ্য করে হোক বা নাই হোক—মোটের ওপর খুব কাছে এসে গিয়েছে। তিনি আর কালবিলম্ব না করে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে নিজের ঘরে ঢুকতেই পাশের বিছানা থেকে কেদার জেগে উঠে বললেন, কি, কি—অমন করছ কেন দাদা ?

—ইয়ে, একবার বাইরে গিয়েছিলাম— কিসের শব্দ—তাই ছুটে চলে এলাম—কেমন যেন গা ছম্‌-ছম্‌ —

—শব্দ ?ও শেয়াল-টেয়াল হবে—

—না দাদা, মানুষের পায়ের শব্দের মতো, ভারি পায়ের শব্দ—যেন ইট পড়ার মতো—

কেদার কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, হুঁ, আজ কি তিথি ?

—তা কি জানি, তিথি-টিথির কোনো খোঁজ রাখি নে তো—

—হুঁ। নাও শুয়ে পড় দাদা...একটা কথা বলি, অমন একা রাত্তিরবেলা যেখানে-সেখানে যেয়ো না—দরকার হয় ডাক দিয়ো।

রাজলক্ষ্মী দুপুরবেলা হাসিমুখে একখানা চিঠি হাতে করে এসে বললে, ও শরৎদি, তোমার নামে কে চিঠি দিয়েছে দ্যাখো—

শরৎ সবিস্ময়ে বললে, আমার নামে ! কে আনলে ?

—দাদার সঙ্গে পিওনের দেখা হয়েছিল বাজারে—তাই দিয়েছে—

—দেখি দে—

—কোথাকার ভাবের মানুষ চিঠি দিয়েছে দ্যাখো খুলে—

বলে রাজলক্ষ্মী দুষ্টুমির হাসি হাসলে !

শরৎভ্রূকুটি করে বললে, মারব খ্যাংরা মুখে যদি ওরকম বলবি—তোর ভাবের মানুষেরা তোকে চিঠি দিক্‌ গিয়ে—জন্মজন্ম দিক্‌ গিয়ে—

রাজলক্ষ্মী হেসে বললে, তোমার মুখে ফুলচন্দন পড়ুক শরৎদি, তাই বলো—তাই যেন হয়।

—ওমা, অবাক করলি যে রে রাজি ! সত্যি তাই তোর ইচ্ছে নাকি ?

—যদি বলি তাই ?

—ওমা, আমার কি হবে !

—অমন বোলো না শরৎদি। তুমি এক ধরনের মানুষ, তোমার কথা বাদ দিই—কিন্তু মেয়েমানুষ তো, ভেবে দ্যাখো। আমার বয়েস কত হয়েছে হিসেব রাখো ?

শরৎ সান্ত্বনা দেওয়ার সুরে বললে, কেউ আটকে রাখতে পারবে না যেদিন ফুল ফুটবে, বুঝলি রাজি ?কাকাবাবুর হাতে পয়সা থাকলে কি আর এতদিন—ফুল যেদিন ফুটবে—

—ফুল ফুটবে ছাতিমতলার শ্মশান-সই হলে—নাও, তুমিও যেমন ! খোলো চিঠিখানা দেখি—

শরৎ চিঠি খুলে পড়ে বললে, কাশী থেকে রেণুকা চিঠি দিয়েছে—বাঃ—

—সে কে শরৎদি ?

—সে একটা অন্ধ মেয়ে। বিয়ে হয়েছে অবিশ্যি। গরিব গেরস্ত, এ চিঠি তার বরের হাতে লেখা, সে তো আর লিখতে—

—কাশীতে থাকে ?কি করে ওর বর ?

—চাক্‌রি করে কোথায় যেন—

—দেখতে কেমন ?

—কে দেখতে কেমন ?মেয়েটা না তার বর ?

—দুই-ই।

—রেণুকা দেখতে মন্দ নয়, বর তার চেয়েও ভালো—ছোকরা বয়েস, লোক ভালোই ওরা। দ্যাখ না চিঠি পড়ে !

—অন্ধ মেয়েরও বিয়ে আটকে থাকে না, যদি কপাল ভালো হয়—

—হ্যাঁ রে হ্যাঁ। তোর আর বকামি করতে হবে না—পড় চিঠি—

রেণুকা অনেক দুঃখ করে চিঠি লিখেছে। শরৎ চলে গিয়ে পর্যন্ত সে একা পড়েচে, আর কে তার ওপর দয়া করবে, কে তার হাত ধরে বেড়াতে নিয়ে যাবে ?ওঁর মোটে সময় হয় না। তার মন আকুল হয়েছে শরৎকে দেখবার জন্য, রাজকন্যা কবে এসে কাশীতে 'কেদার ছত্র' খুলছে ?এলে যে রেণুকা বাঁচে—ইত্যাদি।

চিঠি পড়ে শরৎ অন্যমনস্ক হয়ে গেল। অসহায় অভাগী রেণুকা ! ছোট বোনটির মতো কত যত্নে শরৎ তাকে নিয়ে বেড়াত—কাশীর দশাশ্বমেধ ঘাট, জলে ভাসমান নৌকো ও বজরার ভিড়, বিশ্বেশ্বরের মন্দিরে সান্ধ্য-আরতির ঘণ্টা ও নানা বাদ্যধ্বনি।...রেণুকার করুণ মুখখানি। এখানে বসে সব স্বপ্নের মতো মনে হয়। খোকা—খোকনমণি ! রেণুকা খোকনের কথা কিছু লেখেনি কেন ?কিন্তু পরক্ষণেই তার মনে হল রেণুকাকে কে বক্সীদের বাড়ি নিয়ে যাবে হাত ধরে অত দূরে ?তাই লিখতে পারেনি।

রাজলক্ষ্মী কৌতূহলের সঙ্গে নানা প্রশ্ন করতে লাগল কাশী ও সেখানকার মানুষ-জন সম্বন্ধে, বহির্জগৎ সম্বন্ধে। শরৎ বিরাট অন্নসত্রগুলোর গল্প করল, রাজরাজেশ্বরী, আমবেড়ে, কুচবিহারের কালীবাড়ি।

হেসে বললে, জানিস্, এক বুড়ি তৈলঙ্গিদের ছত্তরকে বলতো তুণ্ডুমুণ্ডুদের ছত্তর !

—তৈলঙ্গি কারা ?

—সে আমিও জানি নে—তবে তাদের দেখেছি বটে।

রাজলক্ষ্মী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে। বাইরের জগৎ মস্ত একটা স্বপ্ন। জীবনের কিছুই দেখা হল না, একেবারে বৃথা গেল জীবনটা। শরৎদির ওপর হিংসে না হয়ে পারে ?

চোদ্দ

কেদার ও গোপেশ্বর দুজনে মিলে খেটে বাড়ির উঠানটা অনেকটা পরিষ্কার করে তুলেছেন। কেদার তত নন, বলতে গেলে গোপেশ্বরই খেটেছেন বেশি। শরৎকাল পড়েছে, পূজার দেরি নেই, গোপেশ্বর একদিন উঠানের এক ধার খুঁড়ে কতকগুলো কচুর চারা পুঁতছেন, কেদার মহাব্যস্ত হয়ে এসে বললেন, দাদা, এসো—ওসব ফেলে রাখো—

—কি রাজামশায় ?

—আরে একটা নতুন রাগিণীর সন্ধান পেয়েছি একজনের কাছে। মুখুজ্যে-বাড়িতে জামাই এসেছে—ভালো গায়ক। দেওগান্ধার ওর কাছে আদায় করতে হবে। থাকবে এখন কিছুদিন এখানে, চলো দুজনে যাই—

—দেবে কি রাজামশাই ?ওসব লোক বড় কষ্ট দেয়। আমি কাশীতে এক ওস্তাদের কাছে বড় আশা করে যাই। একখানা ভীমপলশ্রীর আস্তাই দিলে অতি কষ্টে তো মাসাবদি অন্তরা আর দেয় না। কত খোশামোদ, কেবল বলে, অন্তরা এক মিনিটে নাকি হয়ে যাবে ! হায়রান হয়ে গেলাম হাঁটাহাঁটি করে।

—পেলে ?

—কোথায় পেলাম ?আদায় করা গেল না শেষ পর্যন্ত। সেই থেকে নাকে-কানে খৎ—ওস্তাদের কাছে আর যাব না।

—যা হোক চলো দাদা। এ আমাদের গাঁয়ের জামাই—ওকে নিয়ে একদিন মজলিশ করা যাক্—অনেকদিন থেকে দেওগান্ধারের খোঁজ করছি। ধরা যাক্ চলো—ওখানে কি হচ্ছে ?

—মানকচুর চারা লাগিয়ে রাখলাম গোটাকতক। সামনের বছরে এক একটা কচু হবে দেখবেন কত বড় বড় ! আপনার ভিটের এ জমিতে একটা মানকচু—

—জানি দাদা। ও এখন রাখো, হবে পরে। ও শরৎ—

শরৎ রান্নাঘর থেকে বার হয়ে এসে বললে, কি বাবা ?

—আমাদের দুজনকে একটু তেল দ্যাও মা। রান্নার কতদূর ?

—ওলের ডালনা চড়েছে—নামিয়ে ভাত চড়াব। তা হলেই হয়ে গেল—

—হ্যাঁ মা, রাজলক্ষ্মী এসেছে ?

—না, আজ আসেনি এখনো। কেন ?

—না বলছিলাম, মুখুজ্যে-বাড়ি জামাই এসেছে, ভদ্রেশ্বরে বাড়ি, কেমন লোক তাই তাকে জিজ্ঞেস করতাম।

—সে খোঁজে তোমার কি দরকার ?যে ভালো হোক মন্দ হোক—

—তুই তা বুঝবি নে, বুঝবি নে। অন্য কাজ আছে তার কাছে। যদি এর মধ্যে রাজলক্ষ্মী আসে—

—মুখুজ্যে-বাড়ির কোন্ জামাই বাবা ?আশাদিদির বর ?আশাদিদির শ্বশুরবাড়ি তো ভদ্রেশ্বর—

—তাই হবে।

—সে তো বুড়ো মানুষ। আশাদিদিকে বিয়ে করেছে দোজপক্ষে—

—তোর সে-সব কথায় দরকার কি বাপু ?বুড়ো হয়, আরো ভালো !

—বলো না, কেন বাবা—

—নাঃ, সে শুনে কি করবি ?

—না আমি শুনব—

—শুনবি ?রাগিণী ভূপালী, বাদী গান্ধার, বিবাদী মধ্যম আর নিখাদ—সম্বাদী ধৈবত—আরো শুনবি ?রাগিণী আশাবরী—বাদী—

—থাক, আর শুনে দরকার নেই—নেয়ে এসে ভাত খেয়ে আমায় খোলসা করে দিয়ে যত ইচ্ছে রাগিণী শেখো—

বেলা পড়ে গেল। ঘরের তালকাঠের আড়াতে কলাবাদুড় ঝুলছে, যেমন শরৎ আবাল্য দেখে এসেছে। কেদার ও গোপেশ্বর আহারাদি সেরে অন্তর্হিত হয়েছেন, মধ্যরাত্রে যদি ফেরেন তবে শরতের সৌভাগ্য। রাজলক্ষ্মীর জন্যে পথ চেয়ে বসে থাকে সে। তবুও দুজনে গল্প করে সময় কাটে। রোজ রোজ বাবার এই কাণ্ড ! ভালো লাগে !

এমন সময় কে বাইরে থেকে ডাকল—ও শরৎ, শরৎ—

শরৎ বাড়ির দাওয়ায় উঁকি মেরে দেখে বললে—কে ?ও বটুক-দা, ভালো আছেন ?আসুন।

বটুককে শরৎ কোনোকালেই ভালো চোখে দেখত না। সেই বটুক, যে এক সময় শরতের প্রতি অনেক অসম্মানজনক ব্যবহার করেছিল, রাজলক্ষ্মীর সঙ্গে যে বটুকের সম্বন্ধে সেযুগে কলকাতায় যাবার পূর্বে শরৎ আলোচনা করেছিল একবার।

বটুক একটু ইতস্তত করে বললে, শুনলাম তোমরা এসেছ—কাকা এসেছেন, তাই একবার দেখা করতে—

শরৎ আগেকার মতো নেই—জীবনের অভিজ্ঞতা তাকে অনেক সাহসী ও সহিষ্ণু করে দিয়েছে। আগেকার দিন হলে শরৎ বটুকের সঙ্গে বেশিক্ষণ কথাও বলত না, এ নিশ্চয়ই। আজ শরৎ দাওয়ায় একখানা পিঁড়ি পেতে বটুককে বসতে বললে।

বটুক একটু আশ্চর্য হয়ে গেল, শরতের কাছ থেকে এ আদর সে আশা করেনি এখানে। কিছুক্ষণ ইতস্তত করে অবশেষে বসল। শরৎ তাকে চা করে খাওয়ালে। বললে, দুটি মুড়ি খাবে বটুকদা ?আর তো কিছু নেই ঘরে। তুমি এলে এতদিন পরে—

—থাক্, থাক্, সে জন্যে কিছু নয় ! আমি দেখতে এলাম, বলি দেখা হয়নি কত দিন। আচ্ছা শুনলাম নাকি কত দেশ-বিদেশে বেড়িয়ে এলে ?

—তা বেড়ালাম বৈকি। রাজগীর, কাশী।

—কাকা নিয়ে গিয়েছিলেন বুঝি ?

—জ্যাঠামশায়ের সঙ্গে গিয়েছিলাম—ওই যিনি আমাদের এখানে আছেন—

—তা বেশ বেশ।

এই সময় দূরে রাজলক্ষ্মীকে আসতে দেখে বটুক তাড়াতাড়ি উঠে বিদায় নিল। শরৎ বললে—আর একদিন এসো, বাবার সঙ্গে তো দেখা হল না ! বাবা থাকতে এসো একদিন—

রাজলক্ষ্মী চেয়ে বললে—ও এখানে কি জন্যে এসেছিল ?বটুকদা তো লোক ভালো না—

—কি মতলব নিয়ে এসেছিল কি করে বলব বল্ ?এল—বসতে দিলাম, চা করে দিলাম—

—না না শরৎদি, জানো তো—ওসব লোকের সঙ্গে কোনো মেলামেশা না করাই ভালো। তুমি তো জানো না ওর কাণ্ড ! তোমরা চলে যাওয়ার পর ও গাঁয়ে যে-সব কাণ্ড করেছে, সে শুনলে তুমি কানে আঙুল দেবে। অতি বদ লোক। কি মতলব নিয়ে এসেছিল কে জানে ?

—তা তো বুঝলাম, কিন্তু আমার বাড়ি এল, আমি কি বলে না বসাই ! তা তো হয় না, আমায় আমার কাজ করতেই হবে।

—সেই যে প্রভাস কামার তোমাদের মোটরে কলকাতায় নিয়ে গিয়েছিল, সে লোকটাও ভালো না, পরে শুনলাম। বটুকদা প্রভাসের খুব বন্ধু ছিল আগে—তবে এখন অনেকদিন আর তাকে এ গাঁয়ে দেখিনি। তোমরা চলে গেলে একবার এসেছিল যেন—

শরতের মুখ হঠাৎ বিবর্ণ হয়ে গেল, সে তাড়াতাড়ি অন্য কথা পাড়লে একথা চাপা দিতে। বললে—চল্। দীঘির পাড় থেকে গোটাকতক ধুঁধুল পেড়ে আনি—কিছু তরকারি নেই, বাবাকে বলা না বলা দুই সমান—

রাজলক্ষ্মী বললে, আর কোথাও যেয়ো না শরৎদি, দুটি বোনে এই গাঁয়ে কাটিয়ে দিই জীবনটা। আমারও যা হবে, সে বেশ দেখতেই পাচ্ছি। তুমি থাকলে বেশ লাগে।

—খারাপ কি বল্ না ! আমি কত জায়গায় গেলাম, কিন্তু তোকে ছেড়ে—কালোপায়রার দীঘি ছেড়ে—

—যা বলেছ শরৎদি। তুমি এসেছ আমি আর কোথাও যেতে চাই নে, স্বর্গেও না। দুজনে পা ছড়িয়ে বসে গল্প করি—

—আর চাল-ছোলা ভাজা খাই—না রে ?ভাজি দুটো চাল-ছোলা ?

—না না, শরৎদি ! ওই তোমার পাগলামি—

—পাগলামি নিয়েই জীবন। আয় আমার সঙ্গে রান্নাঘরে, তার পর আবার দুজনে এসে বসব।

রাজলক্ষ্মী আজকাল সর্বদা শরতের সঙ্গে থাকতে ভালোবাসে। সন্ধ্যার আগে একাই বাড়ি চলে যায়, শরৎ দিদির মুখে বাইরের জগতের কথা শুনতে ওর বড় আগ্রহ। যে একঘেয়ে জীবন আবাল্য সে কাটাচ্ছে গড়শিবপুরে, যার জন্যে তার মনে হয় এ একঘেয়েমির চেয়ে যে কোনো জীবন বাঞ্ছনীয়, যে কোনো ধরনের—শরৎ দিদি আজ কিছু দিন হল বিদেশ থেকে ফিরে সেই একঘেয়ে আবেষ্টনীর মধ্যে যেন আগ্রহ ও নতুনত্বের সঞ্চার করেছে। তা ছাড়া জীবনে শরৎ দিদিই তার একমাত্র ভালোবাসার লোক, ও দূরে চলে যাওয়াতে রাজলক্ষ্মীর জীবন শূন্য হয়ে পড়েছিল, এখন আবার গড়বাড়িতে এলে, ওর সঙ্গে বসে গল্প করে, ওর সামান্য কাজকর্মে সাহায্য করে রাজলক্ষ্মীর অবসর-ক্ষণ ভরে ওঠে।

শরৎ বললে, রেণুকার চিঠির জবাব দিলাম অনেকদিন, উত্তর তো এল না ?

—আসবে। অত ব্যস্ত কেন ?দিন দশেক হল মোটে জবাব গিয়েছে। ঠিকানা লেখা ঠিক হয়েছিল তো ?

—ঠিকানা লিখে দিয়েছিলেন জ্যাঠামশায়। উনি কি আর ভুল করবেন ?আমার বড় মন কেমন করে খোকনমণির জন্যে। সে যদি চিঠি লিখতে পারতো আমায় নিজের হাতে—

রাজলক্ষ্মী হেসে বললে, একেই বলে মায়া ! কোথাকার কে তার ঠিক নেই—

শরৎ ব্যথা-কাতর কণ্ঠে বললে, অমন বলিস্ নে রাজি। তুই জানিস নে, সে আমার কি ! কেন তাকে ভুলতে পারি নে তাই ভাবি। কখনো অমন হয়নি আমার, কাশীতে থাকবার শেষ একটা মাস যা হয়েছিল। খোকাকে না দেখলে পাগলের মতো হয়ে যেতাম, বুঝলি ?কষ্টও যা গিয়েছে ! আচ্ছা বল তো, সত্যিই সে আমার কে ?অথচ মনে হত কত জন্মের আপনার লোক সে, তার মুখ দিনান্তে একবার না দেখলে— ভালোই হয়েছে রাজি, সেখানে বেশিদিন থাকলে মায়ায় বড্ড জড়িয়েপড়তাম। আর তেমনি ছিল মিনুর মা !

—সে কে শরৎদি ?

—যাদের বাড়ি ছিলাম, সে বাড়ির গিন্নি। বলব তোকে সব কথা একদিন। এখন না—

—কাশীর কথা শুনতে বড্ড ভালো লাগে তোমার মুখে—কখনো কিছু দেখিনি—যেন মনে হয় এখানে বসে দেখছি সব। আজ একটু ঠাণ্ডা পড়েছে, না শরৎদি ?

—তা হেমন্তকাল এসে পড়েছে, একটু শীত পড়বার কথা। একটা নারকেল কুর্‌তে হবে—দা-খানা খুঁজে দ্যাও ততক্ষণ—আমি ছোলাগুলো ততক্ষণ ভেজে ফেলি—

—কেন অত হাঙ্গামা করছ শরৎদি ?দাঁড়াও আমি নারকোল কুরে দিই—

শরৎ বললে, দুজনে পা ছড়িয়ে বসে গল্প করব আর চালভাজা—কি বলিস্‌ ?

ছেলেমানুষের মতো উৎসাহ ও আগ্রহভরা কণ্ঠস্বর তার। এই জন্যই শরৎ দিদিকে রাজলক্ষ্মীর এত ভালো লাগে। এই পাড়াগাঁয়ে সব লোক যেন ঘুমুচ্ছে, তাদের না আছে কোনো বিষয়ে আগ্রহ, না শোনা যায় তাদের মুখে একটা ভালো কথা। অল্প বয়সে বুড়িয়ে যেতে হয় ওদের মধ্যে থাকলে। শরৎ দিদি এসে বাঁচিয়েছে।

রাজলক্ষ্মী হঠাৎ মনে পড়বার সুরে বললে, ভালো কথা, বলতে মনে নেই শরৎদি, টুঙিমাজদে থেকে তোমার নামে একখানা চিঠি এসেছিল একবার—

শরৎ চমকে উঠে বললে—টুঙি-মাজদে ! কই সে চিঠি ?

—আছে বোধ হয় বাড়িতে, খুঁজে দেখব। তোমরা তখন এখানে ছিলে না—আমি রেখে দিয়েছিলাম—

—কতদিন আগে ?

—তা ছ-সাত মাস কি তার বেশিও হবে। গত বোশেখ মাসে বোধ হয়। আচ্ছা, শরৎদি, ওখানে তোমার শ্বশুরবাড়ি—নয় ?

শরৎ অন্যমনস্কভাবে বললে, হাঁ।

একটুখানি চুপ করে কি ভেবে বললে, কে দিয়েছিল, জানিস্‌ ?

—খামের চিঠি। আমি খুলে দেখিনি—কে আছে তোমার সেখানে ?

শরৎ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে, নিয়ে আসিস্‌ চিঠিখানা, দেখব।

কিছুক্ষণ দুজনেই চুপচাপ। তারপর রাজলক্ষ্মী বললে, যাও শরৎদি, সন্দে হয়ে আসছে—

—হুঁ—

—নারকোল কেটে দেব আর একটু ?

—না, তুই খেয়ে নে। উত্তর দেউলে সন্দে দেখিয়ে আসতে হবে—

—এখনো রোদ রয়েছে গাছের ডগায়, অনেক দেরি এখনো, খেয়ে নাও না—

—আমি আর খাব না এখন।

—তুমি না খেলে আমার এই রইল—

—না, না, আচ্ছা যাচ্ছি আমি—নে তুই। কাঁচালঙ্কা একটা নিয়ে আসি—

উত্তর দেউল থেকে সন্ধ্যা-প্রদীপ দিয়ে কিছুক্ষণ পরে ওরা ফিরছিল, কালোপায়রা দীঘির ওপাড়ের ঘন জঙ্গলে যেখানে ছাতিম ফুল ফুটে হেমন্তসন্ধ্যার বাতাস সুবাসিত করে তুলেছে। শ্যামলতার লম্বা কালো ভাঁটায় কুচো কুচো সুগন্ধ ফুল প্রত্যেক বর্ষাপুষ্ট ঝোপের মাথায়। পায়ে চলার পথ গত বর্ষার ঘাসে ঢেকে আছে, ভাঙা ইটের স্তূপে শ্যাওলা জমেছে, গড়ের জঙ্গল ঘন কালো দেখাচ্ছে আসন্ন সন্ধ্যার অন্ধকারে। রাজলক্ষ্মীকে বাড়ি ফিরতে হবে বলে ওরা সন্ধ্যা-প্রদীপ দেখানোর কাজ বেলা থাকতে সেরে এল।

শরৎ বললে, অনেক মেটে আলু হয়ে আছে বনে, আজ দু-বছর এদিকে আসিনি—

বাড়ি গিয়ে শরৎ বললে, চল্‌ তোকে একটু এগিয়ে দিয়ে আসি—গড়ের খাল পর্যন্ত যাই। জল নেই তো খালে ?

রাজলক্ষ্মী হেসে বললে, কোথায় ! বর্ষার সামান্য জল হয়েছিল, শুকিয়ে গেছে।

—থাক না কেন আজ রাতটা ?একা থাকব ?

—বাড়িতে বলে আসিনি যে শরৎদি—নইলে আর কি। আচ্ছা কাল রাত্রে বরং থাকব। বাড়িতে বলে আসতে হবে কিনা !

রাজলক্ষ্মীকে এগিয়ে দিয়ে ফিরে আসবার পথে শরৎ একটা কাঠের গুঁড়ির ওপর বসল। হেমন্তের সান্ধ্য-বাতাস কত কি বন্য পুষ্প, বিশেষত বনমরচে ও শ্যামলতার পুষ্পের সুবাদে ভারাক্রান্ত। দেউড়ির ভাঙা ইটের ঢিবির সর্বত্র এ-সময় বনমরচে লতায় ছেয়ে গিয়েছে, পুরোনো রাজবাড়ি, লক্ষ্মীছাড়া দৈন্য তাদের শ্যামশোভায় আবৃত করে রেখেছে। রাজকন্যার সম্মান রেখেছে ওরা সেভাবে।

কি হবে এখুনি ঘরে ফিরে ?বেশ লাগে বাইরের বাতাস। ভয় নেই ওর মনে, যা ছিল তাও চলে গিয়েছে। তা ছাড়া ভয় কিসের ?সবাই বলে ভূত আছে, অপদেবতা আছে—তার পূর্বপুরুষের অভ্যুদয়ের দিনের শত পুণ্য অনুষ্ঠানে এ বাড়ির মাটি পবিত্র, এ বাড়ির সে মেয়ে, আবাল্য সে এ-সব এইখানেই দেখে এসেছে—তার ভয় কিসের ?

উত্তর দেউলের দেবী বারাহি তাদের মঙ্গল করবেন।

সে ঘরে ফিরে ডুমুরের চচ্চড়ি রান্না করবে বাবা আর জ্যাঠামশায়ের জন্যে। জ্যাঠামশায় অনেক ডুমুর পেড়ে এনেছেন আজ কোথা থেকে। জ্যাঠামশায় বেশ লোক। ওঁকে সে আর কোথাও যেতে হবে না। উনি না থাকলে কে তাকে আনত কাশী থেকে। বাবার সঙ্গে কে আবার দেখা করিয়ে দিত ?যতদিন উনি বাঁচেন, সে ওঁর সেবা-যত্ন করবে মেয়ের মতো।

শরতের হঠাৎ মনে পড়ল, রাজলক্ষ্মীকে তার শ্বশুরবাড়ির সে পুরানো চিঠিখানা আনবার জন্যে মনে করিয়ে দেওয়া হয়নি আর একবার। টুঙি-মাজদিয়া ! কত দিন সেখানে যাওয়া হয়নি ! কে-ই বা আছে আর সেখানে ?চিঠি লিখেছেন বোধ হয় খুড়শাশুড়ি। তাই হবে—তা ছাড়া আর কে ?সেখানকার সব কিছু যখন শেষ হয়ে গিয়েছে, তখন ভালো জ্ঞানই হয়নি শরতের। এক উৎসব-রজনীর চাঁপাফুলের সুগন্ধ আজও যেন নাকে লেগে আছে। কতকাল আগে বিস্মৃত মুহূর্তগুলির আবেদন—আজও তাদের ক্ষীণ বাণী অস্পষ্ট হয়ে যায়নি তো ! বিস্মৃতির উপলেপন দিয়ে রেখেছে চলমান কাল, সেই মুহূর্তগুলির ওপর। তবে সে ভালোবাসেনি, ভালোবাসলে কেউ ভোলে না। তখনো বোঝবার, জানবার বয়স হয়নি তার।

টুঙি-মাজদে তার শ্বশুরবাড়ি। ওখানকার ভাদুড়িরা তার শ্বশুরবংশ—একসময়ে নাকি ভাদুড়িদের অবস্থা খুব ভালো ছিল। এখন তাদেরই মতো।

টুঙি-মাজদে ! নামটা সে ভুলেই গিয়েছিল, রাজলক্ষ্মী আবার মনে করিয়ে দিলে।

বনের মধ্যে কোথায় গম্ভীর স্বরে হুতুমপ্যাঁচা ডাকছে, শুনলে ভয় করে—যেন রাত্রিচর কোনো অপদেবতার কুস্বর ! শরৎ অস্পষ্ট অন্ধকারের মধ্যে ঘরে গিয়ে রান্নাঘরে খিল দিয়ে রান্না চড়িয়ে দিলে।

অনেক রাত্রে কেদার এসে ডাকাডাকি করেন—ও মা শরৎ, দোর খোলো—ওঠো—

দিন দশেক পরে একদিন রাজলক্ষ্মী এসে বললে, চললাম শরৎদি—

শরৎ বিস্ময়ের সুরে বললে, কি রে ?কোথায় চললি ?

—সব ঠিক। আমার বিয়ে হচ্ছে সতেরোই অঘ্রাণ—জানো না ?

—তোর ?সত্যি ?

—সত্যি না তো মিথ্যে ?

—বল্ শুনি—সত্যি ?কোথায় ?

রাজলক্ষ্মী বেশি কিছু জানে না বোঝা গেল। এখান থেকে মাইল দশেক দূরে দশঘরা বলে অজ এক পাড়াগাঁয়ে যার সঙ্গে সম্বন্ধ হয়েছে, তার বয়েস নাকি তত বেশি নয়, বিশেষ কিছু করে না, বাড়িতেই থাকে।

শরৎ বললে, তোর পছন্দ হয়েছে ?

—পছন্দ হলেও হয়েছে, না হলেও হয়েছে—

—তার মানে ?

তার মানে বাবার যখন পয়সা নেই, আমি যদি বলি আমার বর হাকিম হোক, হুকুম হোক, দারোগা হোক, তা হলে তো হবে না ! যা জোটে তাই সই !

—এখন যা হয় হলে বাঁচি, না কি ?

—তোমার মুণ্ডু।

তার পর ওরা বনের মধ্যে মেটে আলু তুলতে গিয়ে অনেক বেলা পর্যন্ত রইল। বনের মধ্যে এক জায়গায় একটা পাথরের থামের ভাঙা মুণ্ডটা মাটিতে অর্ধেক পুঁতে আছে। রাজলক্ষ্মী সেটার ওপরে গিয়ে বসল। পাথরের গায়ে সামুদ্রিক কড়ির মত বিট কাটা, মাঝে মাঝে পদ্মফুল এবং একটা দাঁড়ি। আবার কড়ি, পদ্ম ও দাঁড়ি—মালার আকারে সারা থামটা ঘুরে এসেছে। নিচের দিকে একরাশ কেঁচোর মাটি বাকি অংশটুকু ঢেকে রেখেছে।

রাজলক্ষ্মী চেয়ে চেয়ে বললে, এই নকশাটা কেমন চমৎকার শরৎদি ! বুনলে ভালো হয়— দেখে নাও—

শরৎ বললে, এর চেয়েও ভালো নকশা আছে ওই অশ্বত্থ গাছটার তলায়—একটা খিলেন ভেঙে পড়ে আছে, তার ইটের গায়ে। কিন্তু বড্ড বন ওখানে আর কাঁটা গাছ—

—তোমাদেরই সব তো—একদিন শুনেছি গড়বাড়ির চেহারা অন্যরকম ছিল, না ?

—কি জানি ভাই, ও-সবের খবর আমি রাখি নে। আজকাল যা দেখছি, তাই দেখছি। তেল জোটে তো নুন জোটে না, নুন জোটে তো চাল জোটে না।

তার পর শরৎ কি ভেবে আনন্দপূর্ণ কণ্ঠে বললে, সত্যি রাজি, খুব খুশি হয়েছি তোর বিয়ের কথা শুনে। কত যে ভেবেছি, কাশীতে থাকতে কতবার ভাবতাম, ভালো সম্বন্ধ পাই তো রাজির জন্যে দেখি। একবার দশাশ্বমেধ ঘাটে একটা চমৎকার ছেলে দেখে ভাবলাম, এর সঙ্গে যদি রাজির বিয়ে দিতে পারতাম, তবে—

রাজলক্ষ্মী চুপ করে রইল। সে যেন কি ভাবছে।

শরৎ বললে, প্রভাসদার দেওয়া সেই মখমলের বাক্সটা আছে রে ?

—হুঁ। স্নোটা সব খরচ হয়ে গেছে—আর সব আছে। দ্যাখো শরৎদি, সত্যি সত্যি একটা কথা বলি, আমার কোথাও যেতে ইচ্ছে করে না তোমায় ছেড়ে—আমি একবার বলেছি, আবার বলছি, মনের কথা আমার—

তার পর রাজলক্ষ্মী উঠে ধীরে ধীরে শরতের গলা জড়িয়ে ধরে বললে, শরৎদি, তুমি আমায় ভালোবাসো ?

শরৎ তাকে ঠেলে দিয়ে হেসে বললে, যাঃ—

রাজলক্ষ্মীর চোখ দিয়ে হঠাৎ ঝরঝর করে জল পড়ল। সে অশ্রুসিক্ত স্বরে বললে, তুমি ভালোবাসো বলেই বেঁচে আছি শরৎদি। তুমি গরিব হতে পারো, আমার কাছে তুমি গড়বাড়ির রাজার মেয়ে, এই দেউল, মন্দির, দীঘি, গড়, ঠাকুর-দেবতার মূর্তি সব তোমাদের, আমি তোমাদের প্রজার মেয়ে, একপাশে পড়ে থাকি—তুমি সুনজরে দ্যাখো বলে বার বার আসি—

শরৎ কৌতুকের সুরে বললে, খেপলি নাকি, রাজি ?কী হয়েছে আজ তোর ?

রাজলক্ষ্মী চলে যাবার কিছু পরে বটুক এসে ডাকলে, ও শরৎ—বাড়ি আছ ?

শরৎ তখন স্নান করতে যাবার জন্যে তৈরি হয়েছে, বটুককে দেখে একটু বিব্রত হয়ে পড়ল।

মুখে বললে, এসো বটুকদা—

—হ্যাঁ, এলাম। তুমি বুঝি—

—নাইতে বেরিয়েছি বটুকদা। রাজির সঙ্গে বন থেকে মেটে আলু তুলতে গিয়েছিলাম কিনা ! ডুব দিয়ে ঘরে-দোরে ঢুকব না—

—ও, তা আমি না হয় অন্য সময়—

—কোনো কথা ছিল ?

—হ্যাঁ, না—কথা—তা একটু ছিল—তা—

বটুকের অবস্থা দেখে শরতের হাসি পেল। মনে মনে বললে, কি বলবি বল্ না—বলে চলে যা—কাণ্ড দ্যাখো একবার !

মুখে বললে, কি বটুকদা ?কি কথা ?

বটুক খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে ইতস্তত করে তার পর মরিয়ার সুরে বললো, প্রভাস এসেছিল কাল কলকাতা থেকে—

বলে সে শরতের মুখের দিকে চেয়ে চুপ করে রইল।

শরতের মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল এক মুহূর্তে। তার সমস্ত শরীর কেমন ঝিমঝিম করে উঠল। কিন্তু তখনি সামলে নিয়ে বললে, তা আমায় এ কথা কেন ?আমি কি করব ?

বটুক মাথা চুলকে বললে, না—তা—এমন কিছু নয়, এমন কিছু নয়। প্রভাসের সঙ্গে গিরীনবাবু বলে এক ভদ্রলোক ছিল। এই গিয়ে তারা বলছিল—

এই পর্যন্ত বলে বটুক একবার চারিদিকে চেয়ে দেখলে।

শরৎ দাওয়ার খুঁটি ধরে দাঁড়িয়ে নিজেকে যেন টলে পড়ে যাওয়া থেকে বাঁচিয়ে বললে, কি বলছিল ?

—বলছিল যে—

—বলো না কি বলছিল ?

—মানে, ওরা—তোমার সঙ্গে একবার লুকিয়ে দেখা করতে চায়। নইলে গাঁয়ে সব কথা নাকি প্রকাশ করে দেবে !

—হুঁ—তোমাকে তারা চর করে পাঠিয়েছে বুঝি ?

শরতের অস্বাভাবিক কণ্ঠস্বরে বটুক ভয় খেয়ে গেল। সুর নরম করে বললে—আমার ওপরে অনর্থক রাগ করছ তুমি। আমায় তারা বললে, তোমাকে কথাটা বলতে—কেউ টের পাবে না, গড়ের জঙ্গলের ওদিকে হোক্‌কি রানীদীঘির পাড়ে হোক্—কি তারা বলবে তোমায়। আমায় বললে, বলে এসো। তারা কলকাতায় চলে গিয়েছে, আবার আসবে। নয়তো কলকাতায় কি হয়েছিল না হয়েছিল, সব গাঁয়ে প্রকাশ করে দিয়ে যাবে—

শরৎ চুপ করে রইল কিছুক্ষণ। কোনো কথা নেই তার মুখে। তার মূর্তি দেখে বটুকের ভয় হল। সে কি একটা বলতে যাচ্ছিল, এমন সময় শরৎ স্থিরগলায় বললে, বটুকদা, তোমার বন্ধুদের বোলো আমি লুকিয়ে তাদের সঙ্গে দেখা কোনোদিন করব না। তাদের সাহস থাকে বাবা আর জ্যাঠামশায়ের সামনে এসে যেন দেখা করে। আমরা গরিব আছি, তাই কি—আমাদেরও মান আছে। না হয় তারা বড়লোকই আছে—

বটুক বললে, না—এর মধ্যে গরিব বড়লোকের কথা কি ?

—আর একটা কথা বটুকদা ! তুমি না গাঁয়ের ছেলে ?তোমার উচিত কলকাতার সেই সব বখাটে বদমাইশদের তরফ থেকে আমায় এ-সব কথা বলা ?আমি না তোমার ছোট বোনের মতো ?তোমায় না দাদা বলে ডাকি ?তুমি এসেছ চর সেজে ?

বটুক আমতা আমতা করে বললে, আমি কি করব, আমি কি করব—তোমার ভালোর জন্যেই—

শরৎ পূর্ববৎ স্থিরকণ্ঠেই বললে, আমার বাড়ি তুমি এসেছ—আমার বলতে বাধে, তবুও আমি বলছি—আমার এখানে তুমি আর এসো না—আমার ভালো তোমায় করতে হবে না।

বটুক ততক্ষণে ভগ্ন দেউড়ির পথে অদৃশ্য হয়েছে।

পনেরো

শরৎ কাঠের পুতুলের মতো স্তব্ধ হয়ে বসে রইল কতক্ষণ। এখন সে কি করবে ?গড়শিবপুরের রাজবংশে সে কি অভিশাপ বহন করে এনেছে, তার বংশের নাম বাবার নাম ডুবতে বসেছে আজতার জন্যে।

মানুষ এত খারাপও হয়।

এই পল্লীগ্রামের বনে বনে হেমন্তকালের কত বনকুসুম, লম্বা লতার মাথায় থোবা থোবা মুকুল ধরেছে বন্য মাখম-সিম ফুলের, শিউলির তলায় খই-ছড়ানো শুভ্র পুষ্পের সমারোহ, সুমুখ জ্যোৎস্না-রাতের প্রথম প্রহরে ছাতিমবনের নিবিড়তায় চাঁদের আলোর জাল-বুনুনি, ছাতিম ফুলের সুবাস—এ সবের আড়ালে লুকিয়ে আছে প্রভাসের মতো, বটুকের মতো ভয়ানক প্রকৃতির লোক, যাদের অসাধ্য কাজ নেই, যাদের ধর্মাধর্ম জ্ঞান নেই ! এত কষ্ট দিয়েও ওদের মনোবাঞ্ছা মিটল না ?এতদিন পরে আবার এখানেও এসে জুটল তার জীবনে আগুন জ্বালাতে ?

আচ্ছা সে কি করেছে যার জন্যে তার এত শাস্তি ?

সে কি জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে কিছু করেছে ?সে কি স্বেচ্ছায় কমলাদের পাপপুরীর মধ্যে ঢুকেছিল ?হতে পারে সে নির্বোধ, কিছু বুঝতে পারেনি, অত খারাপ কাউকে ভাবতে পারেনি বলেই তার মনে কোনো সন্দেহ জাগেনি। যখন সন্দেহ সত্যই জাগল, তখন ওরা তো তাকে বেরুতে দিল না। অথচ সে যদি সব কথা খুলে বলে গ্রামে, কেউ তাকে বিশ্বাস করবে না।

প্রভাসের ও গিরীনের বদমাইশির কথা শুনে ওদের কেউ শাস্তি দেবে না ?ভগবান সত্যের দিকে দাঁড়াবেন না ?

না হয় সে কালোপায়রা দীঘির জলে ডুবে মরে বাবার ও বংশের মুখ রক্ষা করবে। তা সে এখুনি করতে পারে—এই দণ্ডে !

শুধু পারে না বাবার মুখের দিকে চেয়ে।

আচ্ছা সে শ্বশুরবাড়ি চলে যাবে দুদিনের জন্যে ?টুঙি-মাজদে গ্রামে খুড়শাশুড়ির আশ্রয়ে এখন থাকবে গিয়ে কিছুদিন ?কার সঙ্গে পরামর্শ করা যায় ?জ্যাঠামশায় বা বাবাকে এসব কথা বলতে বাধে।

তার চেয়ে জলে ডুবে মরা সহজ।

সকলে মিলে অমনভাবে তাকে যদি জ্বালাতন করে, বনের মেটে আলু, বুনো সিম-ভাতে-এক এক বেলা খেয়েও যদি শান্তিতে থাকতে না দেয়, তবে মায়ের মুখে শোনা তারই বংশের কোন্ পুরোনো আমলের রানীর মতো—তারই কোন্ অতি-বৃদ্ধ প্রপিতামহীর মতো নিজের মান বাঁচাবার জন্যে কালোপায়রা দীঘির শীতল জলের তলায় আশ্রয় নিয়ে সব জ্বালা জুড়ুতে হবে, যদি তাতে হতভাগারা শান্তিতে থাকতে দেয়।.... চোখের জলে শরতের গালের দু-পাশ ভেসে গেল।

কতক্ষণ পরে তার যেন হুঁশ হল—কত বেলা হয়েছে ! রান্না চড়ানো হয়নি—বাবা জ্যাঠামশায় এসে ভাত চাইবেন এখুনি।

উঠে সে স্নান করে এল—তেল আগেই মেখে বসে ছিল, বটুক আসবার আগেই।

রান্না চড়িয়ে দিয়ে আবার সে ভাবতে বসল। সব সময়েই ভাবছে, বটুক চলে যাবার পর থেকে। কতবার চোখের জল গড়িয়ে পড়েছে, কতবার আঁচল দিয়ে মুছেছে—কি সে করে এখন ?

তার কি কেউ নেই সংসারে ?

কেউ তার দিকে দাঁড়িয়ে, তার হয়ে দুটো কথা বলবে না ?প্রভাস ও গিরীন যদি তার নামে কুৎসা রটিয়ে দেয় গ্রামে, তবে তাদের কথাই সবাই সত্য বলে মেনে নেবে ?তার কথা কেউ শুনবে না ?

এমন সময় কেদার ও গোপেশ্বর এসে পৌঁছে গেলেন।

তাঁরা মুখুজ্যে-বাড়ির জামাই সোমশ্বরের কাছে নতুন রাগিণীর সন্ধানে গিয়েছিলেন, বোধ হয় খানিকটা কৃতকার্য হয়েছেন, তাঁদের মুখ দেখলে সেটা বোঝা যায়।

গোপেশ্বর খেতে খেতে বললেন—গলাটা ভালো লোকটার।

—বেশ। ভৈরবীখানা গাইলে বড় চমৎকার—অবরোহীতে একবার যেন ধৈবৎ ছুঁয়ে নামল—

—না না, আমার কানে তো শুনলাম না। কোমল ধৈবৎ তো লাগবেই অবরোহীতে—

—সেটা আমার খুব ভালো জানা আছে—শুনবে ?এই শোন না—আচ্ছা খেয়ে উঠি। অবরোহীতে কোমল নিখাদ, তার পরেই কোমল ধৈবৎ আসছে। যেমন—

শরৎ বললে, বাবা খেয়ে নাও দিকি ! এর পর ওর অনেক সময় পাবে—

—এটা কিসের চচ্চড়ি মা ?

—মেটে আলু। রাজলক্ষ্মী আর আমি তুলে এনেছিলাম আজ ওই বনের দিক থেকে—

—রাজলক্ষ্মী এসেছিল নাকি ?

—কতক্ষণ ছিল। এই তো খানিকটা আগে গেল—

—ওর বিয়ের কথা শুনে এলাম কিনা—তাই বলছি—

—আমার সঙ্গে অত ভাব, ও চলে গেলে গাঁয়ের আর কেউ এদিকে মাড়াবে না। ওকে একটা কিছু দিতে হবে বাবা—

—কি দিবি ?

—তুমি বলো বাবা—

—আমি ওসব বুঝি নে। যা বলবি, কিনে এনে দেব—ওসব মেয়েলি কাণ্ডকারখানায় আমি কোনো খবর রাখি নে—

আহারান্তে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে দুজনে হাটে চলে গেলেন, আজ পাশের গ্রামে হাট। পূর্বে হাট ছিল না, দুই জমিদারে বাদাবাদির ফলে আজ বছরখানেক নতুন হাট বসেছে। হাটের খাজনা লাগে না বলে কাপালীরা তরিতরকারি নিয়ে জমা হয়—সস্তায় বিক্রি করে।

অগ্রহায়ণ মাসের প্রথম সপ্তাহ শেষ হয়ে দ্বিতীয় সপ্তাহ পড়েছে, অথচ এবার শীত এখনো তেমন পড়েনি। বাবা ও জ্যাঠামশায় চলে গেলে শরৎ রোদে পিঠ দিয়ে বসে আবার সেই একই কথা ভাবতে লাগল।

গড়ের খাল পার হয়ে দেখা গেল রাজলক্ষ্মী আসছে। ওর জীবনে যদি কেউ সত্যিকার বন্ধু থাকে তবে সে রাজলক্ষ্মী, ও এলে যেন বাঁচা যায়, দিন কাটে ভালো।

রাজলক্ষ্মী আসতে আসতে বললে, আজ একটু শীত পড়েছে শরৎদি—না ?

—আয় আয়, তোর কথাই ভাবছি—

—কেন—

—তুই চলে গেলে যেন ফাঁকা হয়ে যায়, আয় বোস্—

শরৎ ভাবছিল বটুকের কথাটা বলা উচিত হবে কিনা। কিন্তু তা হলে অনেক কথাই ওকে এখন বলতে হয়—রাজলক্ষ্মী তাতে কিছু যদি মনে করে সব শুনে ?শরৎ তাহলে মরে যাবে—জীবনের মধ্যে দুটিমাত্র বন্ধু সে পেয়েছে—অন্ধ রেণুকা আর এই রাজলক্ষ্মী। এদের কাউকে সে হারাতে প্রস্তুত নয়।

আর একটি মেয়ের কথা মনে হয়—হতভাগিনী কমলার কথা—কে জানে সেই পাপপুরীর মধ্যে কি ভাবে সে দিন কাটাচ্ছে ?

সরলা শরৎ জানত না—পাপে যারা পাকা হয়ে গিয়েছে, তারা পাপপুণ্য বলে জ্ঞান অল্প দিনেই হারিয়ে ফেলে, পাপে ও বিলাসে মত্ত হয়ে বিবেক বিসর্জন দেয়। কোনো অসুবিধাতে আছে বলে নিজেকে মনে করে না। পুণ্যের পথই কণ্টকসঙ্কুল, মহাদুঃখময়—পাপের পথে গ্যাসের আলো জ্বলে, বেলফুলের গড়েমালা বিক্রি হয়, গোলাপজলের ও এসেন্সের সুগন্ধ মন মাতিয়ে তোলে। এতটুকু ধুলোকাদা থাকে না পথে। ফুলের পাপড়ির মতো কোঁচা পকেটে গুঁজে দিব্যি চলে যাও।

রাজলক্ষ্মী বললে, দিন ঘনিয়ে এল, তাই তো তোমায় ছাড়তে পারি নে—

—হুঁ—

—কি ভাবছ শরৎদি ?

শরৎ চমক ভেঙে উঠে বললে—কই না—কিছু না। হ্যাঁরে, তুই আশাদিদির বরের গান শুনেছিস্ ?খুব নাকি ভালো গায় ?বাবা আর জ্যাঠামশায় সেখানে ধন্না দিয়ে পড়ে আছেন আজ কদিন থেকে। দিন দশেক থেকে দেখছি—

—ও, তাই শরৎদি—মুখুজ্যে-বাড়ির দিকে যেতে দেখেছি বটে ওঁদের আজ সকালে—

—রোজ সেখানে পড়ে আছেন দুজনে—কি সকাল, কি বিকেল—কেমন গান গায় রে লোকটা ?

হিন্দি-মিন্দি গায়—কি হা-হা করে, হাত-পা নাড়ে, আমার ও ভালো লাগে না।

দুজনে সন্ধ্যার পূর্ব পর্যন্ত গল্প করল, সন্ধ্যার আগে প্রতিদিনের মতো রাজলক্ষ্মী চলে গেল, শরৎ এগিয়ে দিতে গেল। অল্প অল্প অন্ধকার হয়েছে, ভারি নির্জন গড়বাড়ির জঙ্গল। শরৎ ভয় পায় না একটুও, বরং এতকাল পরে তার বড় ভালো লাগে। এসব জিনিস তার হারিয়ে গিয়েছিল, আবার সে ফিরে পেয়েছে। চিরদিনের গড়বাড়ির জঙ্গল তার পল্লব-প্রচ্ছায় বীথিপথে কত কি বনপুষ্পের সুবাস ও বনবিহঙ্গের কলকাকলী নিয়ে বসে আছে, পিতৃপিতামহের পায়ের দাগ আজও যেন আঁকা আছে সে পথের ধুলোয়, মায়ের স্নিগ্ধ স্নেহদৃষ্টি কোন্ কোণে সেখানে যেন লুকিয়ে আছে আজও—তাই তো মনে হয় তার যদি কোনো পাপ হয়ে থাকে নিজের অজ্ঞাতে—সব কেটে গিয়েছে এখানে এসে, ধুয়ে মুছে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে।

রাজলক্ষ্মীর বিবাহে বেশি ধুমধাম হবে না, গ্রামের সকলকে ওরা বিবাহ-রাত্রে নিমন্ত্রণ করতে পারবে না বলে বেছে বেছে নিমন্ত্রণ করছে। কেদার ও গোপেশ্বর দুজনেই অবিশ্যি নিমন্ত্রিত—এসব খবর কেদারই আনলেন।

শরৎ বললে, বাবা, ওর বিয়েতে কি একটা দেওয়া যায় বলো না—

—তুই যা বলবি, এনে দেব।

—তুমি যা ভালো ভাবো, এনো।

—আমি তো তোকে বললাম, ওসব মেয়েলি ব্যাপারে আমি নেই—

—টাকা আছে ?

—আড়তে চাকরি করার দরুন টাকা তো খরচ হয়নি। সেগুলো আছে একজনের কাছে জমা। কত চাই বলে দে—

—আইবুড়ো ভাতের একখানা ভালো শাড়ি দাও আর একজোড়া দুল—ও আমায় বড় ভালোবাসে, আমার ছোট বোনের মতো। আমার বড় সাধ—

—তা দেব মা। কখনো তোর কাউকে কিছু হাতে করে দেওয়া হয় না—তুই হাতে করে দিয়ে আসিস্—হরি স্যাকরাকে আজই দুলের কথা বলে দিই—

বিবাহের দু-তিন দিন আগে কেদার শাড়ি ও দুল এনে দিলেন। শরৎ কাপড়ের পাড় পছন্দ করাতে দুবার তাঁকে ও গোপেশ্বরকে ভাজনঘাটের বাজারে ছুটোছুটি করতে হল। শরৎ নিজে ওদের বাড়ি গিয়ে রাজলক্ষ্মীকে আইবুড়ো ভাতের নিমন্ত্রণ করে এল। সকাল থেকে শাক, সুক্তুনি, ডালনা ঘণ্ট অনেক কিছু রান্না করলে। গোপেশ্বর চাটুজ্যে এসব ব্যাপারে শরৎকে কুটনো কোটা, ফাইফরমাশ—নানা রকম সাহায্য করলেন।

শরৎ বললে, জ্যাঠামশায়কে বড় খাটিয়ে নিচ্ছি—

—তা নেও মা। আমি ইচ্ছে করে খাটি। আমার বড় ভালো লাগে—এ বাড়ি হয়ে গিয়েছে নিজের বাড়ির মতো। নিজে যা খুশি করি—

ইতিমধ্যে দুবার গোপেশ্বর চাটুজ্যে চলে যাবার ঝোঁক ধরেছিলেন, দুবার শরৎ মহা আপত্তি তুলে সে প্রস্তাব না-মঞ্জুর করে।

শরৎ বললে, সেই জন্যেই তো বলি জ্যাঠামশায়, যতদিন বাঁচবেন, থাকুন এখানে। এখান থেকে যেতে দেব না।

—সেই মায়াতেই তো যেতে পারি নে—সত্যি কথা বলতে গেলে যেতে ভালোও লাগে না। সেখানে বউমারা আছেন বটে, কিন্তু আমার দিকে তাকাবার লোক নেই মা—তার চেয়ে আমার পর ভালো—তুমি আমার কে মা, কিন্তু তুমি আমার যে সেবা যে যত্ন করো তা কখনো নিজের লোকের কাছ থেকে পাইনি—বা রাজামশায় আমায় যে চোখে দেখেন—

শরৎ ধমকের সুরে বললে, ওসব কথা কেন জ্যাঠামশায় ?ওতে পর করে দেওয়া হয়—সত্যিই তো আপনি পর নন ?

রাজলক্ষ্মী খেতে এল।

শরৎ বললে, দাঁড়া, কাপড় ছাড়তে হবে—

রাজলক্ষ্মী বিস্ময়ের সুরে বললে, কেন শরৎদি ?

—কারণ আছে। ঘরের মধ্যে চল্—

পরে কাগজের ভাঁজ খুলে শাড়ি দেখিয়ে বললে—পর্ এখানা—পছন্দ হয়েছে ?তোর কান মলে দেব—কান নিয়ে আয় এদিকে—দেখি—

—দুল ?এসব কি করেছ শরৎদি ?

—কি করলাম ! ছোট বোনকে দেব না ?সাধ হয় না ?

রাজলক্ষ্মী গরিবের মেয়ে, তাকে এমন জিনিস কেউ কোনো দিন দেয়নি। সে অবাক হয়ে বললে, এই সব জিনিস আমায় দিলে শরৎদি। সোনার দুল—

শরৎ ধমক দিয়ে বললে, চুপ। বলিনি আমাদের রাজরাজড়ার কাণ্ড, হাত ঝাড়লে পর্বত—

রাজলক্ষ্মীর চোখের জল গড়িয়ে পড়ল। নীরবে সে শরতের পায়ের ধুলো নিয়ে মাথায় দিলে। বললে, তা আজ দিলে কেন ?বুঝেছি শরৎদি—তুমি যাবে না বিয়ের রাতে।

—যাব না কেন—তা যাব—তবে পাড়াগাঁ জায়গা, বুঝিস তো—

—তোমার মতো মানুষ আমার বিয়েতে গিয়ে দাঁড়ালে আমার অকল্যাণ হবে না শরৎদি। এ তোমায় ভালো করেই জানিয়ে দিচ্ছি, তুমি না গেলে আমার মনে বড্ড কষ্ট হবে। আর তুমি গেলে যদি অকল্যাণ হয়, তবে অকল্যাণই সই—

—ছিঃ ছিঃ—ওসব কতা বলতে নেই মুখে—আয়, চল্‌রান্নাঘরে—কেমন গোটা দিয়ে সুক্তুনি বেঁধেছি খেয়ে বলবি চল্‌—

বিকেলের দিকে শরৎ পুকুর থেকে গা ধুয়ে বাড়ি গিয়ে দেখলে রান্নাঘরের দাওয়ায় ইটচাপা একখানা কাগজের কোণ বেরিয়ে রয়েছে। একটু অবাক হয়ে কাগজটা টেনে নিয়ে দেখলে, তাতে লেখা আছে—

"আজ সন্ধ্যার পরে রানীদীঘির পাড়ে ডুমুরতলায় আমাদের সঙ্গে দেখা করিবা। নতুবা কলিকাতায় কি হইয়াছিল প্রকাশ করিয়া দিব। হেনা বিবি আমাদের সঙ্গে আছে ভাজনঘাটের কুঠির বাংলায়। সে-ও তোমার সঙ্গে দেখা করিতে চায়। দেখা করিলে তোমার ভালো হইবে। এ চিঠির কথা কাহাকেও বলিও না। বলিলে যাহা হইবে দেখিতেই পাইবে। সাবধান।"

শরৎ টলে পড়ে যেতে যেতে কোনো রকমে নিজেকে সামলে নিলে। মাথাটা যেন ঘুরে উঠল। আবার সেই হেনা বিবি, সেই পাপপুরীর কথা—যা মনে করলে শরতের গা ঘিন্‌ঘিন্‌ করে। এ চিঠিখানা ছুঁয়েছে, তাতেই তাকে নাইতে হবে এই অবেলায়।

এরা তাকে রেহাই দেবে না ?তাদের গড়বাড়িতে কলকাতার লোকের জোর কিসের ?

সব সমস্যার সে সমাধান করে দিতে পারে এখুনি, এই মুহূর্তেই কালোপায়রা দীঘির অতল জলতলে—

কিন্তু বাবার মুখের অসহায় ভাব মনে এসে তাকে দুর্বল করে দেয়। নইলে সে প্রভাসেরও ধার ধারত না, গিরীনেরও না। নিজের পথ করে নিত নিজেই। তাদেরই বংশের কোন রানী ওই দীঘির জলে আত্মবিসর্জন দিয়েছিলেন মান বাঁচাতে। সে-ও ওই বংশেরই মেয়ে। তার ঠাকুরমারা যা করেছিলেন সে তা পারে।

বাবাকে এ চিঠি দেখাবে না। বাবার ওপর মায়া হয়, দিব্যি গানবাজনা নিয়ে আছেন, ব্যস্ত হয়ে উঠবেন এখুনি। গোপেশ্বর জ্যাঠামশায়কে দেখাতে লজ্জা করে। থাক্‌ গে, আজ সে এখুনি রাজলক্ষ্মীদের বাড়ি গিয়ে কাটিয়ে আসবে অনেক রাত পর্যন্ত। উত্তর দেউলে পিদিম আজ সকাল সকাল দেখাবে।

রাজলক্ষ্মীর মা ওকে দেখে বললেন, এসো এসো মা শরৎ, আচ্ছা পাগলী মেয়ে, অত পয়সাকড়ি খরচ করে রাজিকে দুল আর শাড়ি না দিলে চলত না ?

রাজলক্ষ্মীর কাকিমা বললেন, গরিবের ওপর ওদের চিরকাল দয়া অমনি—কত বড় বংশ দেখতে হবে তো ?বংশের নজর যাবে কোথায় দিদি ?

শরৎ সলজ্জ সুরে বললে, ওসব কথা কেন খুড়িমা ?কি এমন জিনিস দিয়েছি—কিছু না—ভারি তো জিনিস—রাজি কোথায় ?

রাজলক্ষ্মীর মা বললেন, এই এতক্ষণ তোমার কথাই বলছিল, তোমার দেওয়া কাপড় আর দুল দেখতে চেয়েছেন গাঙ্গুলীদের বড় বউ, তাই নিয়ে গিয়েছে দেখাতে। শরৎদি বলতে মেয়ে অজ্ঞান, তোমার প্রশংসায় পঞ্চমুখ। বলে, মা—শরৎদিকে ছেড়ে কোথাও গিয়ে সুখ পাব না। বসো, এল বলে—

একটু পরে গাঙ্গুলী-বউকে সঙ্গে নিয়ে রাজলক্ষ্মী ফিরল, সঙ্গে জগন্নাথ চাটুজ্যের পুত্রবধূ নীরদা। নীরদা শরতের চেয়ে ছোট, শ্যামবর্ণ, একহারা গড়নের মেয়ে, খুব শান্ত প্রকৃতির বউ বলে গাঁয়ে তার সুখ্যাতি আছে।

গাঙ্গুলী বউ বললেন, এই যে মা শরৎ, তোমার কথাই হচ্ছিল। তুমি যে শাড়ি দিয়েছ, দেখতে নিয়েছিলাম—ক'টাকা নিলে ?ভাজনঘাটের বাজার থেকে আনানো ?বট্‌ঠাকুর কিনেছেন বুঝি ?

শরৎ বললে, দাম জানি নে খুড়িমা, বাবা ভাজনঘাট থেকেই এনেছেন। দুবার ফিরিয়ে দিয়ে তবে ওই পাড় পছন্দ—

নীরদা বললে, দিদির পছন্দ আছে। চলুন দিদি, ও ঘরে একটু তাস খেলি আপনি আমি রাজলক্ষ্মী আর ছোট খুড়িমা—

রাজলক্ষ্মীর মা শরৎকে পাশের ঘরে নিয়ে বললেন, মা, কাল তুমি আসতে পারো আর না পারো, আজ সন্দের পর এখানে থেকে দুখানা লুচি খেয়ে যেয়ো—রাজলক্ষ্মী আমায় বারবার করে বলেছে—

সবাই মিলে আমোদ-স্ফূর্তিতে অনেকক্ষণ কাটাল—বেলা পড়ে সন্ধ্যা হয়ে গেল। বিয়েবাড়ির ভিড়, গ্রামের অনেক ঝি-বউ সেজেগুজে বিকেলের দিকে বেড়িয়ে দেখতে এল। মুখুজ্যে-বাড়ির মেজ বউ পেতলের রেকাবে ছিরি গড়িয়ে নিয়ে এলেন। রাজলক্ষ্মীর মা বললেন, বরণ-পিঁড়ির আল্‌পনাখানা তুমি দিয়ে দ্যাও দিদি—তুমি ভিন্ন এসব কাজ হবে না—এক হৈমদিদি আর তুমি—তারকের মা তো স্বর্গে গেছেন—আল্‌পনা দেবার মানুষ আর নেই পাড়ায়—তারকের মা কি আল্‌পনাই দিতেন !

শরৎ বললে, বাবাকে একটু খবর দিন খুড়িমা, কালীকান্ত কাকার চণ্ডীমণ্ডপে গানের আড্ডায় আছেন। যাবার সময় আমাকে যেন সঙ্গে নিয়ে যান এখান থেকে। অন্ধকার রাত, ভয় করে একা থাকতে।

পরদিন সকাল আটটার সময় শরৎকে আবার রাজলক্ষ্মীদের বাড়ি থেকে ডাকতে এল। নিরামিষ দিকের রান্না তাকে রাঁধতে হবে, গাঙ্গুলীদের বড় বউয়ের জ্বর কাল রাত্রি থেকে। তিনিই রান্না করে থাকেন পাড়ার ক্রিয়াকর্মে।

রাজলক্ষ্মী প্রায়ই রান্নাঘরে এসে শরতের কাছে বসে রইল।

শরৎ ধমক দিয়ে বলে—যা রাজি, দধিমঙ্গলের পরে হটর্ হটর্ করে বেড়ায় না। এখানে ধোঁয়া লাগবে চোখেমুখে—অন্য ঘরে বসগে যা—

নীরদা এসে বললে, শরৎদি, একটা অর্থ বলে দাও তো ?

আকাশ গম গম পাথর ঘাটা।
সাতশো ডালে দুটি পাতা—

শরৎ তাকে খুন্তি উঁচিয়ে মারতে গিয়ে বললে, ননদের কাছে চালাকি—না ?দশ বছরের খুকিদের ওসব জিজ্ঞেস করগে যা ছুঁড়ি—

গরিবের বিয়েবাড়ি, ধুমধাম নেই, হাঙ্গামা আছে। সব পাড়ার বউ-ঝি ভেঙে পড়ল সেজেগুজে। প্রথম প্রহরের প্রথম লগ্নে বিবাহ। শরৎ সারাদিন খাটুনির পরে বিকেলের দিকে নীরদাকে বললে, গা হাত পা ধুয়ে আসব এখন। বাড়ি যাই—কাউকে বলিস নে—

বাড়ি ফিরে সে সন্ধ্যাপ্রদীপ দেখাতে গেল। শীতের বেলা অনেকক্ষণ পড়ে গিয়েছে, রাঙা রোদ উঠে গিয়েছে ছাতিমবনের মাথায়, ঈষৎ নীলাভ সাদা রঙের পুঞ্জ পুঞ্জ ছোট এড়াঞ্চির ফুল শীতের দিনে এই সব বনঝোপকে এক নির্জন, ছন্নছাড়া মূর্তি দান করেছে। শুকনো বাদুড়নখী ফল তাদের বাঁকানো নখ দিয়ে কাপড় টেনে ধরে। থমথমে কৃষ্ণা চতুর্দশীর অন্ধকার রাত্রি।

এক জায়গায় গিয়ে হঠাৎ সে ভয়ে ও বিস্ময়ে থমকে দাঁড়িয়ে গেল। একটি লোক উপুড় হয়ে পড়ে আছে উত্তর দেউলের পথ থেকে সামান্য দূরে বাদুড়নখী জঙ্গলের মধ্যে। শরৎ কাছে দেখতে গিয়ে চমকে উঠল—কলকাতার সেই গিরীনবাবু !

মরে কাঠ হয়ে গিয়েছে অনেকক্ষণ। ওর ঘাড়টা যেন শক্ত হাতে কে মুচড়ে দিয়েছে পিঠের দিকে, সেই মুণ্ডুটা ধড়ের সঙ্গে এক অস্বাভাবিক কোণের সৃষ্টি করেছে। গিরীনের দেহটা যেখানে পড়ে, তার পাশেই মাটিতে ভারী ভারী গোল গোল কিসের দাগ, হাতির পায়ের দাগের মতো।...শরতের মাথা ঘুরে উঠল, সে চিৎকার করে মূর্ছিত হয়ে পড়ে গেল ! হাত থেকে সন্ধ্যাপ্রদীপ ছিটকে পড়ল বাদুড়নখীর জঙ্গলে।

***

এই অবস্থায় অনেক রাত্রে কেদার ও গোপেশ্বর তাকে বিয়েবাড়ি থেকে ডাকতে এসে দেখতে পেলেন। ধরাধরি করে তাকে নিয়ে বাড়ি যাওয়া হল।

লোকজনের হই-হই হল পরদিন। পুলিশ এল, রানীদীঘির জঙ্গলে এক চালকবিহীন মোটরগাড়ি পাওয়া গেল। কি ব্যাপার কেউ বুঝতে পারলে না। সবাই বললে গড়বাড়ির সবাই সারারাত বিয়েবাড়িতে ছিল। মৃতদেহের ঘাড়ে শক্ত, কঠিন পাঁচটা আঙুলের দাগ যেন লোহার আঙুলের দাগের মতো, ঘাড়ের মাংস কেটে বসে গিয়েছে। গোল গোল হাতির পায়ের মতো দাগগুলোই বা কিসের কেউ বুঝতে পারলে না।

***

গড়ের জঙ্গলে ঝিঁঝি পোকা ডাকছে। সন্ধ্যাবেলা। কেদার ঘোর নাস্তিক, কি মনে করে তিনি হস্তপদভগ্ন বারাহী দেবীর পাষাণ মূর্তির কাছে মাথা নিচু করে দণ্ডবৎ করে বললেন, গড়ের রাজবাড়ি যখন সত্যিকার রাজবাড়ি ছিল, তখন শুনেছি তুমি আমাদের বংশের অধিষ্ঠাত্রী দেবী ছিলে। আমাদের অবস্থা পড়ে গিয়েছে, অনেক অপরাধ করেছি তোমার কাছে, কিন্তু তুমি আমাদের ভোলোনি। এমনি পায়ে রেখো চিরকাল মা—অনেক পুজো আগে খেয়েছ সে কথা ভুলে যেয়ো না যেন।